বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

স্ব-নির্বাচিত গল্প

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

বইয়ের নামকরণে "স্ব-নির্বাচিত" কথাটা জুড়ে দিয়ে এমনই গোলমাল বেধেছে, আগেভাগে দুটো কথা বলতে হয়, নয়তো সব ওই-ই কমবেশি হবে স্ব-নির্বাচিত; এমন কি সব লেখাও তো স্ব-নির্বাচিত—ভিড়ের মধ্যে থেকেই একটিকে বেছে নিয়ে, কাট-ছাঁট এবং দাঁড় করাতে হয় লেখককে। এর বেলায় লেখা আর লিখে ওই-তো কথা এই দ্বিবিধ নির্বাচনের ব্যাপারেই লেখকের একটা সহজ প্রশ্নাতীত অধিকার আছে; এখানে সে স্বরাট, এখানে অন্যের মুখাপেক্ষী হলে হবে তাকে কলম ছেড়ে দিতে হয়।

অবশ্য এর মানে কোনোক্রমেই এ নয় যে লেখক পাঠকের নিন্দা-প্রশংসা সম্বন্ধে সচেতন বা সশঙ্ক নয় — লেখাতেই হোক বা বেছে দেওয়াতেই হোক। নিজের জায়গায় পাঠকও যে পূর্ণভাবেই স্বরাট, সে কথা মেনে নিয়েই সে কলম-নাড়ে। আসল কথাটা, নিজের বিচারের সঙ্গে অন্যের বিচারের এই লেনদেন, সাহিত্য সার্থকতাই এখানে। আর লেখক যখন প্রকাশ-নির্বাচিত নির্বাচন নিয়ে নিজ সম্বন্ধে দেয় (যেমন এ-ক্ষেত্রে করা হয়েছে), তখন এই ভাবের-লেনদেনে আরও একটু বেশি হয় বিশেষ সুবিধাই হয়, যেমন পাঠক

লেখকের ব্যক্তি-মানসেরও পরিচয়টা মনে পড়ে —
অর্থাৎ নিজের-লেখা নিয়ে কোনো-রকম দুর্বলতা,
যেটাকেই বোধ হয় অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাসেরই লেখা।
ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Predilection

এই সবিনয় নিবেদনের সঙ্গে বইখানি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া গেল, যে-পাঠক তার সমালোচকও হয়তো। এটুকু জানালাম এই কারণে যে আমার ধারণা আমার-আপত্তি আছে লেখার নিজের লেখা সম্বন্ধে সাফাই। হয়তো মনে হবে— যে আত্মপ্রশংসার পরাঙ্মুখ হলে উচিত থাকে, কিন্তু আত্ম-নিন্দারও নির্লজ্জতা হতে পারে যখন কোনও সমর্থন নেই, তখন নিজের পক্ষের সাক্ষী আসতে পারে — সেই জন্য।

— কিন্তু বলা তো গেল, নিজের পক্ষের সাক্ষীই যে সে লেখার সেরা সমালোচক দুইই। সে-সাক্ষী সংযোগ বা সংগ্রামটা হতে পারে, কিন্তু তার কাছে সবার কোন প্রশ্নই যে থাকবে উঠিতো।

আর শুধু, শেষ কথা— বন্ধুদের, যাদের উদ্যোগে সাহায্যে বইটি দেখতে পেল নিজেকে।

দুই-চারটি বিষয়-সম্পর্ক ছাড়া বিষয়-ভিত্তিক লেখা নিয়ে নির্বাচনটা সম্পূর্ণ নয়; এই সমস্ত পরিসরের মধ্যে সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হোক। আর তাই বলি এই লেখাগুলি এক-একজনের-পক্ষে অল্প-কিছুও পরিচিতি তুলে দেবে

পাঠকেরাই কি বলবেন. তার নির্বাচনের পরিধিও অন্য দিক দিয়েও সীমাবদ্ধ।

ব. ভ. ম.

আরও একটা 'পুনশ্চ' দরকার হলো পড়ে দেখছি। 'শ্রেষ্ঠ', 'সংকলন', 'স্ব-নির্বাচিত' — এই তিনটের সিরিজ প্রকাশন এখন থেকে বছর দুই আগে সমাপ্ত। কিন্তু এ-বইখানিতে প্রায় আধাআধি কবিতা নূতন। তাছাড়া, দেখাই যায় না নূতন-পুরাতনের মিতালি কেমন হয়; আবার এমনও দিতে পুরানোগুলো নূতন বয়সের আর নূতনগুলো পুরানো বয়সেও দেখা।

ব. ভ.

রণরঙ্গিণী

পিতা আপনভোলা মহেশ্বর, তার নিজেরই ঠিক নেই, সন্তানকে দেখবে কি? আশুতোষ খেতাবটা কবে কি করে পেয়ে গেছে; ডেকে ডেকে সারা জন্মটায় সাড়াই পাওয়া গেল না, তা সে তুষ্ট হবে কবে? বাকি থাকে অসন্তোষের কথা; হ্যাঁ বুড়োর সে গুণে ঘাট নেই। শিব নাম নিয়ে এমন অশিব তো দেখা যায় না; ভাঙোড় ভাঙ খেয়ে নিজের খেয়ালে থাকবে বুঁদ হয়ে। যদি ভাঙতে গেলে তার সেই খেয়ালের নেশা তো ঐ আত্মভোলা ভোলানাথই বিরূপাক্ষ মহাকাল হয়ে উঠবে জেগে—ললাট-বহ্নিতে তিনটে ভুবন জ্বালিয়ে দিয়ে তখন কে তার আপন, কেই বা পর।

না গো, শিবরূপে তোমার ভরসা রাখি না আর, কিন্তু তেমনি আবার তোমার অশিব রূপে আর ভয়ও নেই। আমি মা পেয়েছি।

না। এবার আর রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা নয় যিনি শিক্ষা দেবার জন্যে ত্রিভুবন ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আবার অসীম করুণায় তোমায় ঘরে নেবেন তুলে, সোনার হাতায় করবেন অমৃত পরিবেশন। ......ও মায়ের কর্ম নয়।

এবার আমি মা পেয়েছি রণরঙ্গিণী শ্যামা। সে শৃঙ্খলহীনা, কোনও বাঁধনেরই ধার ধারে না; সংসার তাকে বাঁধবে কি, সে স্বামীর বুকেই তুলে দিয়েছে দুখানা পা, সে ভৈরবকেই রেখেছে পায়ের তলায় টিপে, ভয় তার ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে কি করে? তাই এবার মা করেছি রণচণ্ডী শ্যামা। দরকার নেই আর তোমার বরে, ভয় নেই আর তোমার ভ্রূকুটিতে, শিব তুমি শব হয়ে থাকো পায়ের তলাটিতে পড়ে মায়ের আমার।

বলবে শিব তো তবু শান্তও থাকে, কিন্তু মৃত্যু যার কণ্ঠহার, প্রলয় যাঁর অঙ্গের ভূষণ সেই সর্বনাশীকে ডেকে ফলটা কি?

আছে ফল, সে যে সন্তান চেনে। তাই দিগ্‌বসনা প্রলয়ঙ্করী তার চারিদিকে—তার সারা অঙ্গেও বিভীষিকা জাগিয়ে, সবার উর্ধ্বে তার দক্ষিণ হস্তের বরাভয় রেখেছে তুলে।......সে আর কার জন্যে?

আমি আমার মা চিনেছি, মা পেয়েছি ; ও শিব, আর কারুই বা খোসামোদ ?—কাকেই বা ভয় ?

রামজয় গান গেয়ে যায়, ইনিয়ে-বিনিয়ে, আখরের পর আখর লাগিয়ে, ভাবের আবেগে চোখের জল শুক্‌নো গাল দুটো দেয় ভাসিয়ে, শুধু নিজেরই নয়, যারা শুনছে তাদেরও।

বেশি নয়, দরদের সাথী তো হয়ও না বেশি , রাসুমাস্টার, নিবারণ খুড়ো, সাণ্ডেলমশাই আর দীনু পুরুত—এই গ্রামেই যারা নানা সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠে এখন একটি জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কাজের বয়স সবার একরকম গেছে উৎরে। কাজ এখন দাবা, না হয় পাশা, স্তব্ধ যোগাসন, না হয় প্রলয় হুঙ্কারই।

এক-একদিন কেউ বলে বসল—'না রামজয়, একটু মায়ের নামই শোনাও আজ, কিছুতে যেন তার পাচ্ছি না।' শ্যামা-সঙ্গীতের অমন মিষ্ট ভরাট গলা এ তল্লাটে আর কারুর নেই।

মেয়ে ভানু এসে দোরগোড়াটিতে দাঁড়াল। এই দ্বিতীয়বার। একটু আগে জানিয়ে গেছে মা ডাকছে, এটা তারই তাগাদা। বছর আটেকের মেয়ে, চোখদুটি হরিণের মতো বিহ্বল, তাতে সর্বদাই যেন একটু ভয় থাকে ছুঁয়ে, যে রকম জমাট আসর দেখছে তাতে আব ঢোকা ঠিক হবে কি না বুঝতে না পেরে নীরব উপস্থিতির দ্বারাই উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দেওয়া ঠিক করেছে।

ওর একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসে আছে রামজয়ই ; একবার একটা তালের মাথায় ডান হাতের মুঠোটা নিজের ঠোঁটে একটু চেপে হাতটা ওপর দিকে তুলে নিলে।

ইশারাটা লক্ষ্য করে রাসুমাস্টার দোরের দিকে চাইলে, বললে—'ও, আবার এসেছিস্ ? তোকে না তখন তামাকটা সেজে আনতে বললে তোর বাপ ?'

ভানু নাকী সুরে বললে—'আনছিলাম তো, মা যে……'

'তা আনছিলি তো আন্, যা……'

……'মা বললে—দুপুর গড়িয়ে গেছে, খেতে হবে না ?'

'দুপুর গড়িয়ে গেছে, তা তামাকটা খেয়ে একটা ডুব দিয়ে আসবে তবে তো খেতে যাবে ?……যা শীগ্‌গির নিয়ে আয়……অ-হ-হ-হ-হ !—মায়ের পায়ে

রাঙা জবা, ও শিব, তোর কপালে আকার ছাই···∴অ-হ্-হ্-হ্-হ্! কি শোনালে রামজয়।······কৈ, গেলি আনতে?'

ভানু চলে গেল। গানটা আরও জমে উঠেছে, কাঁচুমাচু হয়ে আবার এসে দাঁড়াল। রামজয় একটা তালের মাথায় তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্নের আকারে হাতটা ঘুরিয়ে দিলে।

রাস্থমাস্টার আবার ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করে ঘুরে চাইলে, প্রশ্ন করলে—'কৈ, তামাক কোথায়?'

ভানু বললে—'মা হুঁকো তিনটে চাইলে, জল বদলে দেবে।'

'এই তো কাজের মেয়ে, তা নিয়ে যা।'

নিবারণ খুড়োও ঘুরে চেয়েছিল, বললে—'তোমরা মিছেই আমাদের মেয়ের দোষ দাও, ক্ষেমী কি সত্যিই তেমন?···নিয়ে যাও ঐ।······আগে বরের হাতে দিবি হুঁকোটা—কেমন?'

নাতনী-ঠাকুরদাদার সম্বন্ধ, ভানু উত্তরে জিভটা একটু বের করে ভেঙচি কাটলে, তারপর ছুটো কড়ি-বাঁধা আর একটা খালি হুঁকো নিয়ে থরথর করে চলে গেল।

তারপর জল-ফেরানো হুঁকার প্রত্যাশায় গানের আসর যখন একেবারে চরম জমে উঠেছে, ফটাস, ফটাস, ফটাস করে তিনটি বম ফাটার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গেই হেমাঙ্গিনীর গলা—'ভানী! দিয়ে আয় তামাক! পালালি কোথায় ডেকৃরি!'

গান, সঙ্গৎ, বাহবা—সব এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। রামজয় একটু মুখটা খিঁচিয়েই নিবারণ খুড়োর দিকে চেয়ে বললে—'ক্ষেমী কি আমার সত্যিই তেমন!—ঐ নাও, হুঁকো তিনটে কপাটের গায়ে আছড়ে ভাঙলে!'

হেমাঙ্গিনীর গলা উঠছে ক্রমে—'এলি? আমি বেরুলে আর কিছু বাকি থাকবে না তোর—ভাঙা হুঁকোর ঐ তিনটে নলচে তোর পিঠে এমন করে ভাঙব, এমন করে ভাঙব যে তোর জন্মদাতা তোকে চিনতে পারবে না!······ ছুপুর গড়িয়ে গেল—একটা মনিষ্যি হেঁসেল আগলে হা-পিত্যেশ করে রয়েছে বসে—ডাকের ওপর ডাক—ডাকের ওপর ডাক, তা গেরাহ্যিই নেই! গান! ······আমি আবার এমন গান শোনাতে পারি যা সারা জন্মে আর ভুলতে হবে না······'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল, দীনু পুরুত বললে—'যাও ভেতরে, আমরাও উঠি, আর কি হবে? ভেবেছিলাম আজ ওদিকে কাজ নেই, এক পাট দাবা খেলে ওঠা যাবে—তা যেমন দেখছি......'

সাণ্ডেলমশাই বললে—'হ্যা, যাও, ঠাণ্ডা করো, নৈলে মেয়েটাকে হাতের কাছে পেলে......'

'ও নিজেকেই বা হাতের কাছে এগিয়ে দেয় কি করে?'—

রাসুমাস্টার একেবারেই সমবয়সী বন্ধু, ঠাট্টাটা করে একটু হেসেই উঠল। তারপর বললে—'না, যা, আজ যেন আরও রণমূর্তি......'

গলা আরও বেড়ে যাচ্ছে, রামজয়কে ঘেঁষেই বেশি, দু'একটা বিশেষণও প্রয়োগ হয়ে গেল যা মোটে গৌরব করার মতো নয়। রামজয় সাক্ষী মানলে—'শুনলে তো মড়ুই-পোড়ার মতন চেহারা হচ্ছে,...স্ত্রী বলছে স্বামীকে!'

রাসুমাস্টার বললে—'দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, দোজবরে স্বামী; অমন একটু বলেই, তুই চটছিস কেন? বরং যা ভেতরে; গেলেই নরম হয়ে যাবে'খন।'

'হ্যা যাও।......তোমরাও ওঠ',—বলে দীনু পুরুত উঠতে যাচ্ছিল, রামজয় খপ করে হাতটা ধরে ফেললে, রেগেছে কি ভয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছে ঠিক বলা যায় না, তবে গলাটা একটু চড়িয়েই বললে—'না, আমার দিব্যি রইল তুমি যেতে পারবে না ভট্‌চায, আমি পাড়ছি দাবা। একি উৎপাত!......শুনে যেও কথাগুলো, এর ওপর আমি যদি মুখ ধরি তখন তোমরা বলবে......'

যে একলা পড়ে যাবার ভয়ে দলটাকে ছাড়তে চাইছে না, সে যে কত মুখ ধরবার লোক সবাই জানে, বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে উঠে যেতেও তাই সবাই কুণ্ঠিতও হচ্ছে, কিন্তু ভেতরের অবস্থা উত্তরোত্তর যেমন হয়ে উঠছে তাতে ওদের সবাইয়েরও অস্বস্তিটা যাচ্ছে বেড়ে। সদর আর অন্দরের মাঝখানে একটা বড় উঠান থাকার জন্যে খানিকটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, তার ওপর হেমাঙ্গিনী বোধ হয় ভাসুর তল্লাসে খিড়কির পুকুরের দিকে থাকায় সপ্তমে চড়ে থাকলেও গলাটা এতক্ষণ ওদিকেই ছিল, হঠাৎ মনে হ'ল এগিয়ে আসছে।

আর আসছে যেন একটা ঝড়-তুফান সঙ্গে করে। গোয়ালে গোরু-ছাগলগুলো হঠাৎ আর্তনাদ করে দিক্‌বিদিক্ ছিটকে পড়ল; এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না, তবু সবার কাছে দৃশ্যটা স্পষ্ট—গাঁয়েরই মেয়ে তো ক্ষেমঙ্করী—দুর্গার মতো করে গাছকোমর বাঁধা, সেইভাবেই বোধ হয় পোয়াল

কাটা বঁটির এক এক টানে দড়িগুলো কেটে, বাঁটেরই এক এক ঘা বসিয়ে—সবগুলোকে গোয়াল-ছাড়া করেছে—থাকবে না আর এ বাড়ির কিছুতে—এ বাড়িতেই আর থাকবে না—গোরু, ছাগল, হাঁস—একটা মানুষ সব নিয়ে প্রাণান্ত হোক—বাকি সবাই বড় বড় গ্রাস তুলে বসে বসে শুধু খাক—তাই না হয় খেয়েই উপকার করুক, গতরে ভগবান আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন তো পোড়া কপালে একচোখো ভগবান—তাও নয়—তুই-ই খেটে মর্, তারপর তুই-ই শুকিয়ে মর……এই মরছে।

খিড়কির দোরের দুটো পাল্লা ঝপাং ঝপাং করে চৌকাঠের ওপর আছড়ে পড়ল—দোর দিচ্ছে হেমাঙ্গিনী, কি উদ্দেশ্যে সেই জানে—বোধ হয় একটা মুহূর্তও ফাঁক রাখতে চায় না ; তারপরেই দোরের ওপর এক লাথি—সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে একটা শব্দ……

রামজয় সাক্ষী মানলে, এবার নিবারণ খুড়োর মুখের পানে চেয়ে—'দেখে রাখো—মেয়েমানুষের লাথি !'

'তোমার খিড়কিটা নড়বড়েও হয়েছিল……'

নিবারণের দূরসম্পর্কের ভাইঝি, সম্বন্ধটাও সেই ঠিক করেছিল, একটু কিন্তু হয়েই থাকে, তবে কাটান্ দেবারও চেষ্টা করে। রামজয় একটু খিঁচিয়েই বললে—'তা ব'লে একটা মেয়েমানুষের লাথির ঘায়ে পড়ে যাবে !……উঃ, কী ভাইঝিই গছিয়ে দিয়েছিলে বাবা !'

'তা…আর অমন মিল হোল, রাজযোটক…'

মিল করিয়েছিল দীনু পুরুত। তার হাতটা তখনও রামজয়ের মুঠোর মধ্যেই—দাবা খেলে যেতে হবে—একটা টান দিয়ে বললে—'ছাড়ো, উঠি…'

ঝঞ্ঝা এগিয়ে আসছে, ভুলো কুকুরটা কাঁউ কাঁউ শব্দ ক'রে ভাঙা খিড়কির দোর ডিঙিয়ে গোয়াল পেরিয়ে পালাল ; আওয়াজ থেকে টের পাওয়া যায় খোঁড়াচ্ছে। রামজয় বললে—'না বোস, একবার রাজযোটকটা দেখে যেতে হবে…'

দীনু পুরুত নাকটা সিঁটকে বললে—'গেরো দেখো ! পাঁজিতে বলছে রাজযোটক…তা তুমিও ঐরকম হও, মিনমিনে হয়ে থাকবে তো…'

বোধ হয় রকের ওপরকার জালাটা ভাঙার শব্দ হ'ল—ইট দিয়ে, তারপরেই

একরাশ বাসন ছড়িয়ে পড়বার ঝন্‌ঝনানি—বাটি-গেলাসগুলো ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে ফিরছে……

গলাও একেবারে কানের কাছে এসে পড়েছে; উঠানটার পরেই ভেতর-বাড়ির দেয়াল, তার ওদিকেই রক আর উঠান, আওয়াজের যাতে একটুও অপচয় না হয় সেই জন্যে উঁচু রকের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে হেমাঙ্গিনী—'একবার পোড়াকপালীরা—যারা দরদ দেখাতে আসে এসে দেখুক—দেখুক এসে একবার—একটা মানুষ মিষ্টিকথায় ডেকে ডেকে মুখের ফেকো উঠে মোল, অথচ ওঠবার নাম নেই…ভানী, শতেকখোয়ারী আয়, নয়তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন…সরিয়ে রেখেছে তাকে…কিন্তু এও বলে দিচ্ছি—আমি হেমা বামনী…সরিয়ে দিয়ে পার পাবে না—মরেছি কি মরতে আছি—আমার কিছুতেই আটকাবে না—যার এমন সোয়ামী তার আবার লজ্জা—তার আবার ঘেন্না—তার আবার সদর অন্দর—নিজেই আসছি—গলায় গামছা দিয়ে যখন টেনে নিয়ে আসব—তখন কেউ রুখতে পারবে না—দল বেঁধে আগলে থাকলেও…আমায় কে দেখছে—আমার কে মান রাখছে যে, আমি সবার মান বাঁচিয়ে চলব…ভানী, আবাগী এলি—এই শেষবার বলছি…'

নিবারণখুড়ো আর সাণ্ডেলমশাই দুজনেই উঠে পড়ে জুতোয় পা ঢোকাতে লাগল। দীনু পুরুতও হাতটা একটু মোচড় দিয়েই ছাড়িয়ে নিলে, বললে—'অবুঝ হোচ্ছ কেন তুমি রামজয়—হোক গাঁয়ের মেয়ে, তবু স্বামী-স্ত্রীর—যেখানে—তোমার গিয়ে—নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে—আরে একরকমেরই আলাপ হতে হবে তা তো নয়—তা তাব মধ্যে—তোমার গিয়ে—বাইরের লোকের থাকা…মেয়েছেলে তো নই—আড়ি পাতবার অব্যেস তো করিনি কখনও…'

ঘসটাতে ঘসটাতে পেছনে সরে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়াল, বললে—'তুমি যেন ভয় পেয়েছ ব'লে মনে হচ্ছে—আরে ভয়টা কিসের? —পুরুষ মানুষ, এমনিতে না শানায়—এই—হ্যাঁ!…'

চটির মধ্যে পা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, মায়ের ইঙ্গিতে হাতটা তুলে চলে গেল। রামজয় রাসুমাস্টারের দিকে চেয়ে হতাশভাবে বললে—'দেখলি তো?…যতই বলুক, সবাই থাকলে আর আসতে পারত না ঘরের ভেতর…'

রাসুমাস্টার বললে—'হ্যাঁ, ফল এই হোল যে, ভেবেছিলাম উঠব না, কিন্তু

এখন একা পড়ে গেলাম—আর আমায় এমনই তেমন সমীহ করে না, কোন কালে, তায় আজ...'

উঠতে যাচ্ছিল, রামজয় হাতটা ধরে ফেললে, কাতর দৃষ্টিতে যতটা সম্ভব সাহস ফুটিয়ে বললে—'আমি আছি ভয় কি? যদি দেখি...'

একেবারে দোরের কাছে শব্দ উঠল—'ভানী, এই শেষবার বলছি!...এলি নি তো হারামজাদী? তবে দেখ্...'

আছড়ে দোর খোলার শব্দ হ'লো। রামুমাস্টার আর জুতা পরবার সময় পেলে না, সামনে দিয়ে বেরুবারও নয়, পাশের দোর দিয়ে পেছনদিককার রকে গিয়ে দাঁড়াল।

উঠান্ পেরিয়ে হেমাঙ্গিনী গটগট করে রকে উঠে ঘরের চৌকাঠের মাঝখানে দাঁড়াল। গাছকোমর বাঁধা এলো চুল চুড়ো করে মাথার মাঝখানে তোলা, মুখটা রাঙা টকটকে, ঘামে সিঁদুরের খানিকটা গ'লে কপালের মাঝখানে গড়িয়ে এসেছে।

ডান হাতে তিনটে হুঁকোর নলচে, তার মধ্যে একটি মাত্র আস্ত আছে।

এতদিন ঘর করা সত্ত্বেও ঠিক এতটা কখনও দেখেনি রামজয়, খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল, তারপর বললে—'মারবে নাকি? —ঐটিই বাকী আছে, আজ না হয় হয়ে যাক, বাকী থাকে কেন?'

আঁচলটা খুলে কপালটা মুছে নিলে হেমাঙ্গিনী, শান্তকণ্ঠে বললে—'না, মারব না, ওঠ, খাবে চলো।'

'ঢের খেয়েছি।...তুমি আর আমার মান ইজ্জৎ রাখলে না...বাকী এখন বিষ খেতে।'

চীৎকার ক'রে উঠল—'ওঠ' বলছি ভালোয় ভালোয়...মায়ের কথা যখন তুললে—না মারি মরতে তো পারি—এই দেখো...'

তিনটে নলচে ঠকাস ঠকাস করে নিজের মাথায় কষে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রামজয় উঠে হাতটা ধরে ফেললে। চুড়ো বাঁধা রয়েছে, তবুও তিনটে দাগ জেগে উঠল কপালে, একটা তার মধ্যে লাল—অল্প কেটে গেছে। রামজয় তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে দেখতে যাচ্ছিল।

একটু সরে দাঁড়িয়ে নলচে দিয়েই দোরের দিকে দেখিয়ে বললে—'চলো, আর আস্তিস্তে কাজ নেই।'

সামনে রামজয়, পেছনে হেমাঙ্গিনী, শুধু নলচে ক'টা রামজয়ের সামনে পর্যন্ত এসে পড়েছে—অর্থাৎ কোন্ দিকে যেতে হবে।...উঠান হয়ে রকের ওপর, তারপর বারান্দা হয়ে ঘরের ভেতর। একটা আসন বিছানো আছে, ডান দিকে বাটি দিয়ে ঢাকা এক গেলাস জল। বললে—'বোস।'

রান্নাঘর থেকে একথাল ভাত তরকারি এনে রেখে গেল—সব বেশি বেশি আজ। দ্বিতীয়বার এসে একটা ডালের আর একটা দুধের বাটি।

তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে শেকলটা বন্ধ করে দিতে বললে—'জানলায় ঘটিতে আঁচাবার জল আছে, বিছানায় পানের ডিবে।'

'চললে কোথায় তুমি ?'

'অনেক কাজ, গোরু ছাগলগুলো খুঁজিয়ে আনাতে হবে লোক যোগাড় করে, বাসনগুলো সারিয়ে আনাতে হবে, একটা জালা; বাপের বাড়ি গিয়ে দেখি কাকে ধরতে পারি।...ফিরতে আমার রাত হয়ে যাবে।'

তালায় চাবি ঘুরিয়ে দেবার খুট করে একটি শব্দে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল কথাগুলিতে।

নূতন ব্যাপার কিছু নয়, শুধু কোনদিন একটু কম, কোনদিন একটু বাড়াবাড়ি, আবার কোনদিন হয়তো একটু বেশি বাড়াবাড়ি। আবার সবাই জোটে, দাবা পড়ে, পাশা পড়ে, কোনদিন কেউ একটা ফরমাস করে বসে—'একটু মায়ের নামই শোনাও রামজয়, আজ কেমন যেন কিছুতে তার পাচ্ছি না।'

বৈঠকখানার পেছনদিকে যে রকটা তার নিচেই ভানুর খেলাঘর। জায়গাটা নিরিবিলি, প্রায় দুপুর পর্যন্ত ছায়াও থাকে, তার ওপর বাবা বা মা যেই ডাকুক, একরকম হাতের কাছেই থাকে ভানু।

চৌধুরীদের বাড়িতে একটি নূতন ছেলে এসেছে, বিয়ে বাড়িতে যে ক'দিন থেকে আসছেই, আসছেই, তাদের মধ্যে একজন, নাম টুকু। ভানু গিয়েছিল, বেশ ফুটফুটে ছেলেটি, খেলার জুটি হবার মতো, ভাব করে ডেকে নিয়ে এসেছে।

পাশেই ঘরের মধ্যে রামজয়। মেঘলা দিন, কেউ জোটেনি এখনও, একাই গুন্‌গুন্ করে গান করছে। মনটা ভালো নেই, দু'দিন থেকে ঐ গানটাই গলায়

আসছে বেশি করে—ও শিব, কাজ কি তোমার বরে, ভয় কি তোমার ভ্রূকুটিতে, আমি যে মনের মতন মা পেয়েছি, রণরঙ্গিণী শ্যামা…

ডাকলে—'কৈরে ভানী, নিয়ে এলি না এক কলকে সেজে?'

এই নিয়ে বার চারেক তাগাদা হ'ল। ভানু আর তিনবারের মতোই জবাব দিল—'এই যে আসছি বাবা।'

নূতন সাথী, আর বেশ বাধ্য, খেলা বেশ জমেছে; খেলেই চলল।

'বলি ভানী, কানে তুলছিস্ কথাটা?'

ভানু ঠিক সেই সুরেই জবাব দিলে—'যাচ্ছি গো, যাচ্ছি! যাচ্ছি! বাবাঃ'

টুকু বললে—'যাচ্ছিস না, যদি এসে পড়ে?'

ভানু একটা কাদার তাল মাখছিল, বললে—'আসুন না।'

'মারবেন না?'

ভানু কাদার তালের ওপর একটা ছোট্ট চাপড় বসিয়ে ঘুরে চাইলে, বললে—'ইস্ মারবে! প'ড়ে রয়েছে মার। মা নেই?'

কথাটা বুঝতে একটু দেরি হ'ল টুকুর, তারপর জিগ্যেস করলে—'মা বুঝি মারে না?'

আরম্ভ করেছে মাখতে আবার, তার মধ্যেই ভানু গলাটা দুলিয়ে একটু টেনে টেনে বললে—'মারেও আবার আদরও করে, মারেও আবার আদরও করে…'

হাতটা আবার থামিয়ে বললে—'তা ব'লে বাবা হাত তুলবে? ইস্, সাধ্যি! মা নেই যেন!…'

আর ডাক পড়েনি অনেকক্ষণ। নিরাশ হয়েই যে ছেড়ে দিয়েছে রামজয় নিশ্চয় তা নয়; আসলে গুন্‌গুন্ ক'রে যে গানটা গাইছিল সেটা ক্রমে মনটাকে মাতিয়ে আনছে, সেই গানটাই—'মায়ের পায়ে রাঙা জবা, ও শিব, তোর কপালে আকার ছাই…'

চুপ ক'রে গেল ভানু। কি মনে হয়েছে, কান পেতে শুনছে, সেই হরিণের মতো ভাসা-ভাসা চোখ দুটি আরও নরম হয়ে উঠেছে, হঠাৎ কাদার তালে আর একটা চাপড় বসিয়ে উঠে পড়ল, অনুকম্পায় মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—'আহা দিয়ে আসি তামাকটা সেজে, কি বল্ ভাই?—তুই ততক্ষণ ব'স্—আহা, শিবতুল্যি বাবা আমার…'

দু'পা এগিয়ে হঠাৎ ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে, একটু কাৎ হয়ে হাত দুটো তুলে বললে—'আর মা আমার রণরঙ্গিণী !...'

পাঁচমুখে শোনা কথা দুটো আউড়ে দিয়ে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে চলে গেল।

নারায়ণী সেনা

সমস্ত দিন সমস্ত রাত গাছের উপর কেটে গেল।

সমস্ত দিন বলাটা একটু ভুল, কেননা দুপুর পর্যন্ত আমরা ছিলাম হাতীর হাওদার উপর। আমি আর নলিনীবাবু। পূজার ছুটিতে আমরা দু'জনে দু'দিক থেকে এসেছিলাম আমাদের উভয়ের বন্ধু আনন্দের বাড়ি, নলিনীবাবু কলকাতা থেকে আর আমি এদিক থেকে।

আনন্দের পুরো নামটা হচ্ছে আনন্দকিশোর থাপা। ওরা তরাইয়ের নেপালী জমিদার। ওর পাঠ্য জীবনের কতকটা কাটে পাটনায়, এবং কতকটা কলকাতায়। বরাবরই বাঙালী-ঘেঁষা, তাইতে আমার সঙ্গে পরিচয় হয় পাটনায়, আমরা উভয়েই তখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র। বি-এ পাস করে আর আমার কাছে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ শেষ করে আনন্দ কলকাতায় চলে গেল। সেখানে এম-এ পড়ে চাব বছর, ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, তাই বোধ হয় সরস্বতীর উপর ভক্তিটা মরে এসেছিল। কিন্তু এম-এ না পাস করে ও বাড়ি ফিরে গিয়ে আমায় যে চিঠিটা লিখেছিল, সেটি একেবারে ঘরোয়া বাংলায়। তাইতেই প্রথম কাঁদুনী গাইলে—'একলা পড়ে গেছি, বনবাস, নিশ্চয় আসবি একবার, যত শীগ্‌গির পারিস'—শিকারের লোভ দেখান ছিল, আবার ঐ একই চিঠিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে 'বনবাসে'র শান্ত নিরুদ্বেগ জীবনের উচ্ছ্বসিত গুণগানও ছিল।…বি-এ ক্লাসেই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে লেখক হবার পাঁয়তারা ভাঁজছি, আনন্দকিশোর সেটা জানত।

তারপর এক বছর ধরে এই রকম চিঠি মাঝে মাঝে বরাবর এসেছে; কিন্তু চারদিক দিয়ে প্রলুব্ধ হলেও এতদিন গিয়ে উঠতে পারি নি।

আর কখনও যাওয়ার দুর্মতিও না হয় যেন। প্রথমতঃ দূরত্ব এবং পথের দুর্গমতা। রূপনগর নিকটতম রেলস্টেশন থেকে আঠার মাইল। রাস্তা নেই বললেই চলে। ভারতের সীমানার মধ্যে মাইল তিনেক একটা কাঁচা সড়ক, তারপর সীমানার একটা খাল পেরিয়ে তার আদলটা কিছুদূর পর্যন্ত গেছে বটে, কিন্তু সেই কোন্ যুগে প্রথম তোয়ের হবার পর তাতে আর কখনও মাটি পড়েছে

বলে মনে হয় না।· মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, অল্পপরিসর, কিন্তু অত্যন্ত গভীর আর খরস্রোতা। জঙ্গল পড়ে গোটাপাঁচেক, তার মধ্যে দুটো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। রাস্তা ঠিক মাঝখান দিয়ে যায় নি বটে, তবুও খানিকটা ভেতরে যাবাব পরই গভীর অন্ধকার ; কতকটা এই থমথমে অন্ধকারে, কতকটা একটা অজানা আশঙ্কায়, বেবিয়ে আসবার পর মনে হয় যেন পুনর্জন্ম হ'ল। গ্রাম খুব দূরে দূরে, পাহাড়ের দিকে যতই এগুনো যায় আরও এসেছে কমে আর এই যে নিজের-মনে-গড়ে-ওঠা রাস্তা এটা হয়ে উঠেছে উঁচু-নীচু, জায়গায় জায়গায় পাথুরে, আর সেটাকে খণ্ডিত করে যে সব নদী বয়ে গেছে তাদের সংখ্যা গেছে বেড়ে।

যানবাহন হাতী, ভারতসীমানা পেরিয়ে খানিকটা পর্যন্ত একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা ছিল, বৈচিত্র্য হিসাবে। হাতীর চরম বৈচিত্র্য মনে করে আমরা যাবার সময়ে স্টেশন থেকে নেমে তাইতেই সওয়ারী হই। ভুলটা যখন বোঝা গেল তখন আর গরুর গাড়ির পথ নেই।

কতকটা সুবিধা আছে শেষেব দিকে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রায় মাইল-চার পর্যন্ত থাপা-পরিবারের জমিদারির তরফ থেকে একটা আবার রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে, বিজুরিয়া বলে একটা নদীর ধার পর্যন্ত ; বাড়ির দিকে রাস্তাটা মাইলখানেক পাকাও। এইটুকুতে আনন্দকিশোরদের মোটরটা যাতায়াত করে।···মোটরটা আদৌ এখানে পৌঁছেছিল কি করে সে একটা আলাদা কাহিনী।

এই হাড়ভাঙা অভিযানেব পর কিন্তু আমবা যে দশটা দিন ওখানে ছিলাম, বড় আনন্দেই ছিলাম। রূপনগর জায়গাটা খুব মনোরম। গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়ে গেছে, তারপর স্তরে স্তরে উঠে একেবারে শেষ দিকে তুষারমুকুট। সকালে, আব বিকেলে একটু নরম হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর যে রক্তাভা পড়ে তার উপমা হিমালয়ের এদিকে কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আনন্দকিশোরের পিতা জগৎকিশোর সৌখীন লোক, নিজের গ্রামটুকুও বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখেছেন। শরতের স্বচ্ছ আকাশের নীচে রূপনগরকে একটু দূর থেকে দেখলে মনে হয় নীলাম্বরীপরা কোন মায়ের কোলে সাজগোজ করা একটি শিশু যেন শুয়ে রয়েছে। এখানে থাকাই আনন্দ, তার উপর নিত্য হুজুগ্। আজ শিকার, কাল বিজুরী-অভিযান,

পরন্তু পাহাড়ের উপর গিয়ে পিকনিক ; ছোট ছোট শিকার ছাড়া একদিন হাতী নিয়ে, লোকলস্কর সঙ্গে করে একটা বড় শিকারও হয়ে গেল—দুটো চিতাবাঘ, গোটা পাঁচ হরিণ, দুটো বুনো শূকর। এর উল্লাস সামলাতেই দু'দিন গেল কেটে। আহার তো শেষ পর্যন্ত একটা দুশ্চিন্তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল—জল অত ভাল হওয়া সত্ত্বেও।

তবুও যে কেন বলছি আর যাবার দুর্মতিটা যেন না হয় তার দ্বিতীয় কারণটা এবার বলি।

সাতটা দিনের প্রোগ্রাম ছিল আমাদের। ওঁদের অনুরোধ-উপরোধে সেটাকে আর একটু বাড়িয়ে আমরা দশম দিন সকালে যাত্রা করলাম। বিজুরী নদী পর্যন্ত পরিবারের এক রকম সকলেই মিলে আমাদের মোটরে পৌঁছে দিলেন—পর্দা নেই, আনন্দকিশোরেব স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি কয়েকজন মেয়েছেলে পর্যন্ত। নদীর মাঝখানটুকু নৌকায় পেরিয়ে আমরা এপারে এসে হাতীর ওপর চড়লাম।···শেষ দৃশ্যটুকু যেমন অপূর্ব তেমনি বিষাদময়। হিমালয়ের তুষারমুকুট, তার নীচেই ঘনারণ্যের নীল রেখা, তাব পর খানিকটা সমতলভূমি, বিজুরীর উত্তরতটে আনন্দকিশোবেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, গৌরকান্তি মেয়েদের রংচঙে পোশাক, আনন্দকিশোর আর কয়েকজন রুমাল নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে, নীচেই বিজুরীর উপলাহত উচ্ছল জলস্রোত আর সমস্তটুকুর উপর শরৎপ্রভাতের ঝলমলে রোদ।

হাতীটা খানিকটা এগিয়ে এলে নলিনীবাবু বললেন, 'এবার ঘুরে বসুন শৈলেনবাবু, যা ছেড়েই আসতে হবে তার দিকে এরকম করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা বীর-ধর্ম নয়।'

নলিনীবাবুর কথা বলা হয় নি। একটি জটিল চরিত্র, কিন্তু সাক্ষী হিসাবে চমৎকার ; আমুদে, গল্পপ্রবণ, যে অবস্থাতেই পড়ুন তার মধ্যে থেকে রস বের করে সেটাকে উপভোগ্য করে নেবার ক্ষমতা আছে ; মোটের উপর নাম-ধামে-স্বভাবে একজন আদর্শ কলকাতার মানুষ, আসবার সময় উনি না থাকলে যে কি অবস্থা হ'ত, আর যাবার সময়ও যদি উনি না থাকতেন তো···

কিন্তু সেকথা পরে হচ্ছে ; এখানে মাত্র এইটুকু বলে রাখি যে ওঁর থেকে থেকে ঐ 'বীর-ধর্ম' কথাটা ব্যবহার করবার বাতিক আছে। একবার রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করতে বললেন, 'শৈলেনবাবু, ভেতো বাঙালী, এসেছি এমন

দেশে যেখানে সবার কোমরেই একটা খুরপি ঝুলছে, এখানে জিভের ডগায় অন্তত: একটা ধারালো কথাও না নিয়ে থাকলে মানাবে কেন?'

বললাম, 'কিন্তু আনন্দ তো আমাদের স্বরূপ চেনে।'

উত্তর করলেন, 'জিগ্যেসও করেছিল এ নতুন মুদ্রাদোষের কথা, বললাম, খেটে অভ্যেস করেছি, নইলে তোর মান থাকবে কেন?'

আরও কীর্তি আছে নলিনীবাবুর, কিন্তু সে কথাও যথাস্থানে। সকালের দিকটা আমাদের বেশ কাটল। স্নানাদি সেরে বেশ ভালভাবে জলযোগ করে বেরুনো গিয়েছিল, হাওদার উপর দুলতে দুলতে, গল্প করতে করতে, সিগরেট পোড়াতে পোড়াতে আর নস্যি নিতে নিতে আমরা দুপুর পর্যন্ত গ্রাম থেকে প্রায় মাইল বারো দূরে রামফেরী জঙ্গলের ধাবে এসে পড়লাম।

খিদে পেয়েছে, খাবার সময়ও হয়েছে, তা ভিন্ন জায়গাটা এমন অপরূপ যে এইখানে বসে হিমালয় তবাইয়ের শেষ নিদর্শন হিসাবে এটাকে মনে গেঁথে নেবার ইচ্ছাটাও প্রবল হয়ে উঠল। আমাদের ডান দিকে উঁচু-নীচু জমির উপর নিবিড় শালবন, সেটা যেখানে পাতলা আর সরু হয়ে এসেছে সেইখান দিয়ে আমাদের রাস্তাটা। আমাদের বাঁ দিকে একটা ছোট পাহাড়, সমস্ত জায়গাটা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে এসে যেন এই শেষ ঢেউয়ে থেমে গেছে, এর পরেই তরাইয়ের সমতল, উঁচু জমিতে রয়েছি বলে কতদূর পর্যন্ত যে দেখা যায় তার হিসাব নেই। সমস্ত জায়গাটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে একটি ছোট নদী। জায়গাটা উঁচু-নীচু বলে মাঝে মাঝে তাব স্রোত গেছে আটকে, জল হয়েছে জমা, তার পর সেই সঞ্চিত জলের চাপেই সেটা তোড়ে বেবিয়ে এসেছে; চার দিকে ঝরঝর, ঝরঝর শব্দ; একটি নদীই ঝবনার মালা গেঁথে চলেছে, একটি নৃত্যচপল মেয়েরই পায়ের নূপুব, হাতে তালি, কণ্ঠে সঙ্গীত।

মাহুত করণ বাহাদুরকে বললাম, 'হাতীটাকে পাহাড়ের গোড়ায় নিয়ে চল, ঐ গাছতলাটায় নেমে আমবা আহারটা সেরে নেব।'

ঠিক যে বললাম তা নয়, খানিকটা ইঙ্গিত, খানিকটা হিন্দী আর এইখানে দশ দিনের চেষ্টায় ওদের ভাষার গোটাকতক শব্দ যে আয়ত্ত করেছিলাম তার মধ্যে থেকে কিছু কিছু দিয়ে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে দিলাম। বেশ বুঝল, কিন্তু না এগিয়ে খানিকটা ভাষায় আর খানিকটা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে যে সমতলে নেমে খানিকটা এগিয়ে ওর একটা ভাল জায়গা জানা আছে, সেইখানেই

যাঁচ্ছে। সাধারণতঃ নেপালীদের মুখটাই হয় অত্যন্ত গম্ভীর আর ভাবলেশহীন; সেইজন্যেই, আর তার বক্তব্যটা পুরোপুরি বুঝতে না পারার জন্যেও নিশ্চয়, আমাদের মনে হ'ল লোকটা অযথাই জিদ করছে। তাই আমরাও গম্ভীর হয়ে গিয়ে ওকে আমাদের নির্দেশ পালন করতেই হুকুম দিলাম। এদের আর একটা দোষ, চট্ করে চটে যায়। আর কিছু বললে না, হাতীর মুখ ঘুরিয়ে গাছটার দিকে চালিয়ে দিলে, তার পর বেশ যখন কাছাকাছি এসেছি, এই হাত পঞ্চাশেকের মধ্যে, হঠাৎ দাঁড় করিয়ে জানালে যে জায়গাটায় বাঘের ভয় আছে, বনের শেষে এই ঝরনা, প্রায়ই ওরা জল খেতে আসে এখানে।

আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক এইভাবে সঙ্কটের সামনে এনে ফেলে কথাটা প্রকাশ করার জন্যে লোকটার উপর একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু ঠিক এই ধরনের লোককে আর চটানো বিবেচনার কাজ হবে না বুঝে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

নলিনীবাবু বললেন, 'শাস্ত্রে এর ভাল ব্যবস্থা আছে শৈলেনবাবু—যঃ পলায়তি স জীবতি। কিন্তু এ হতভাগা আমাদের পরীক্ষা করছে, তায় সেদিন একটা বাঘ মারবার যশটা আমিই নিয়েছিলাম, মারি আর নাই মারি—তাই ভাবছি কি করে অর্ডারলি রিট্রিট করা যায় যাতে বীর-ধর্ম রক্ষা হয়।'

সাহসী বলে আমারই যে খুব নাম আছে এমন নয়, তবে ভরা মধ্যাহ্ন, জঙ্গল প্রায় নেই বললেই চলে, এমনই কেমন ভয় আসে না, তার উপর একটা ভাল বন্দুক রয়েছে শৈলেনবাবুর হাতে। আমি একটু ভেবে নিয়ে উত্তর করলাম, 'এক কাজ করা যাক না মাঝামাঝি, গাছতলাটাতেই যাই, তার পর হাতীর পিঠ থেকে না নেমে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলেই হবে।'

মনের কথাটাও বললাম, 'শেষে জলখাওয়াটা শুধু ঐ ঝরনার জলে সারবার ইচ্ছে আছে নলিনীবাবু, নইলে আপশোষ থেকে যাবে।'

নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন, বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ থেকে আরম্ভ করে ক্যান্টের ক্রিটিক্ অব পিওর রিজন্—এতগুলি বইয়ের মধ্যে আসল বই কথামালাটাই আপনার বাদ পড়ে গেছে, শৈলেনবাবু। আমরা নীচে জল খাচ্ছি, আর উপর থেকে বাঘ যদি বলে—ওরে অর্বাচীন, তুই আমার পান করিবার জল ঘোলা করিতেছিস কোন্ সাহসে?—তখন?'

হো হো করে হেসে উঠলাম। হ'লও ভাল, বিপদের মুখেই হাসি, বীর্য্য-ধর্ম ভাল করেই বজায় রইল, সঙ্গে সঙ্গেই করণ বাহাদুরকে ইশারা করলাম হাতীটাকে এগিয়ে দিতে।

করণ বাহাদুর হাতীর কানের গোড়ায় হাঁটু দুটো চেপে 'অঘঃ' না ঐরকম কি একটা শব্দ করলে—সামনে যাবার। হাতী কিন্তু এগল না। তিন-চার বার ঐরকম করবার পরও যখন অগ্রসর হ'ল না তখন কান থেকে অঙ্কুশটা খুলে নিয়ে মারলে উল্টো দিক দিয়ে একটা বাড়ি, তার পর তাতেও নড়ে চড়ে না দেখে দিলে খোঁচার দিকটা খানিকটা বসিয়ে। হাতীটা আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু নড়ল না। তার পরই তার ভঙ্গি গেল বদলে, শুঁড়টা চালাতে লাগল, শরীরটাতে আস্তে আস্তে দোল দিতে লাগল, একটা যেন কি রকম নূতন ধরনের ভাব। করণ বাহাদুর সামনে গলাটা বাড়িয়ে কি যেন পরীক্ষা করছিল, হঠাৎ হাতীটা সামনে হনহন করে এগুতে আরম্ভ করলে।

করণ বাহাদুর মাথাটা একবার ঘুরিয়ে বললে—'হুজুর, কষে হাওদা ধরে থাকুন...'

'কেন রে?'

'হাতী পাগল হবে...হয়েছে...'

বলতে বলতেই হাতীটা গাছের নীচে এসে পড়েছে, ধারেই একটা নীচু ডাল ছিল, হাওদায় লেগে মটাস্ ক'রে গেল ভেঙে, আমরা হাওদার পাদানের কাছে ঝুঁকে পড়েছিলাম বলে বেঁচে গেলাম, সরু ডাল বলে হাওদাটাও নষ্ট হ'ল না, কিন্তু বেশ খানিকটা একপেশে হয়ে গেল। করণ বাহাদুর মার ছেড়ে আদর খোসামোদ ধরেছে, আমরা গাছের মাঝখানে একটা মোটা ডালের নীচে এসে পড়তেই বললে—'এই ডালটা ধরে উঠে পড়ুন হুজুর, আর কোন উপায় নেই, ক্ষেপেই উঠেছে।'

আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে বাঁ হাতটা পেছন করে ক্রমাগতই তাগাদা করতে লাগল—'উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাল ধরে উপরের মোটা ডালটায় চলে যান—নইলে...'

আমরা আর বিলম্ব না করে ডালটা জড়িয়ে উঠে পড়লাম। সেই ডালটা থেকে একটা ফ্যাকড়া বেরিয়ে উপরে একটা বেশ মোটা ডাল ঘেঁষে উঠে গেছে, সেইটে বেয়ে আমরা তার উপরে গিয়ে বসলাম। হাতীটা তখন একেবারে

ক্ষেপে গেছে, প্রথমে শরীরটাতে ঝাঁকানি দিয়ে হাওদা আর মাহুত দুটোকেই ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে, হাওদাটা একেবারে পেটের কাছাকাছি নেমে এল, করণ বাহাদুর কিন্তু ঝুঁকে পড়ে ওর কানের গোড়া দুটো ধরে চেপে পড়ে রইল। হাতীটা শুঁড়টা আছড়াচ্ছে ওকে ধরবার জন্যে, কিন্তু অল্প জায়গার মধ্যে এমন তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে যে ওকে স্পর্শই করতেই পারছে না ভাল করে।

আমরা প্রায় উঠে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা এ ডালটার তলা থেকে সরে গিয়েছিল, ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আবার ফিরে এল, তারপর আমরাও চেঁচিয়ে উঠেছি 'তুমিও উঠে এসো করণ বাহাদুর' বলে, সেও ঘাড়টা কি ভেবে একটু তুলেছে, এমন সময় হাতী ডালটা শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরলে, বার তিন টার দুলিয়ে দুলিয়ে যেন দেখে নিলে কতটা শক্ত, তারপর একটা প্রচণ্ড নিনাদের সঙ্গে মড় মড় করে ডালটা ভেঙে ফেললে। নলিনীবাবু আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন—'শাস্ত্রবাক্যের মূল্য আছে শৈলেনবাবু।'

বললাম—'ভাবছি, করণ বাহাদুরও উঠে এল না কেন—'

'বোধ হয় শাস্ত্র-অনভিজ্ঞ বলে আমাদেরই প্রথম চান্স নিতে দিলে, মুর্খের নানা দোষ তো…'

ডালের গোড়াটা তখনও গুঁড়ির সঙ্গে লেগে রয়েছে, হাতীটা সেইটে চেপে চেপে ধরতে লাগল নিজের গায়ে, অর্থাৎ করণ বাহাদুরকে পিষে মারতে চায়, হাওদাটা দিতে লাগল বাধা, পেট থেকে ঝুলে পড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে আর সেইজন্যেই শরীরের সঙ্গে ডালটার একটা ব্যবধান থেকে যাচ্ছেই। শেষ পর্যন্ত কি হ'ত বলা যায় না, কিন্তু কতকটা এই রকম টানাটানিতে এবং কতকটা নিজের ভারে ডালটা এক সময় আলাদা হয়ে গিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। হাতীটা আবার দুলিয়ে দুলিয়ে তুলে নিয়ে দেখলে সদ্ব্যবহার করা যায় কি না, তারপর আবার একটা চীৎকার করে হন্ হন্ করে গাছের তলা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। করণ বাহাদুর একবার ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে কি বললে—'আহু-ইহু' দিয়ে হলেও বেশ বুঝলাম, বলছে—ভয় ক'রো না আছি।

নলিনীবাবুরও পরিহাস-প্রিয়তা বন্ধ হয়ে গেছে, বললেন—'এত ভয়ের মধ্যে লোকটা এখনও শুধু আমাদের ভয়ের কথাই ভাবছে মশাই। কি কাণ্ড। কি ধাতু দিয়ে এরা তৈরি।'

হাতীটা বাড়ীর দিকেও না, স্টেশনের দিকেও নয়, রাস্তা একেবারেই ছেড়ে

পাহাড়ের গা বেয়ে নীচের সমতলের দিকে এগিয়ে চলল। শেষ যা দেখলাম —একখানি প্রায় মণখানেকের পাথরের চাঁই তুলে নিয়ে পেছন ঘেঁষে ছুঁড়ে মারলে। পাথরটা করণ বাহাদুরের হাতকয়েক দূর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে হাওদাখানিকে চুরমার করে দিলে। এর পর গোটা দুই আওয়াজ ছাড়া হাতীর আর কিছু পাওয়া গেল না, শেষটা মনে হ'ল মাইল দুয়েক দূরে কোনখান থেকে এল যেন।

এবাব চিন্তা হ'ল কি করা যায়। হাতীর আওয়াজ অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যা দেখা গেল তারপর নামতে আর কারুর সাহস হচ্ছে না। করণ বাহাদুর ভরসা দিয়ে গেল, কিন্তু সেও নিতান্ত অনিশ্চিত একটা ব্যাপার, হাতী যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাকে শেষ করে না ফেলে, তবু ও-হাতীতে চড়াব আর কথাই উঠতে পারে না। এক, যদি ওটাকে কোনরকমে রূপনগরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেখান থেকে তাঁরা তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করবেনই।

গাছেই বসে আছি, শরতের ছোট বেলা, দুপুব গড়িয়ে বিকেল এসে পড়ল, রোদ হয়ে উঠল হলদে। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিন্তু উপায় কিছু নেই। যতই সময় যেতে লাগল, আলোর সঙ্গে আশাও হয়ে আসতে লাগল স্তিমিত; এই ভয়টাই মনে অধিকার বিস্তার করতে লাগল—নিরম্বু উপবাস দিয়ে সমস্ত রাত্রিটা গাছের উপর কাটাতে হবে নাকি! একটা কোন ব্যবস্থা করে নিতেই হবে যে।

গাছটা চেনা গাছ নয়, কোনও ফলও নেই যে চেনা না হলেও পরীক্ষা করে দেখা যেত। গাছেব নীচেও মাত্র লম্বা লম্বা ঘাস, মত্ত হাতীর দাপটে বিমর্দিত হয়ে রয়েছে। সম্বলের মধ্যে সিগারেটের টিন, আর আমার নস্যির ডিবে। এক সময় একটা সিগারেট টানতে টানতে নলিনীবাবু বললেন—'এ অবস্থায় নিশ্চিন্দি হয়ে সিগারেট টানার মধ্যে একটা বীরভাব আছে বটে, কিন্তু তাতে চলবে না। সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এল, একবার নেমে একটু সন্ধান নিতেই হবে। পাহাড়ে আতা থাকা খুব সম্ভব, তার কয়েকটা গাছও আছে আমি দেখেছি আসতে আসতে…দাঁড়ান হয়েছে, একটা জায়গাও আমার মনে পড়েছে, পথের ধারেই, বেশী দূরও নয়…'

এ ডালটা বেশ মোটা, মাঝখান থেকে অনেক ছোট বড় ডাল বেরিয়ে যাওয়ায় পড়বারও ভয় নেই। নলিনীবাবু একটা ডাল ধরে উঠে পড়তে

যাচ্ছিলেন, হঠাৎ নীচের দিকে দৃষ্টি পড়তে এক রকম চেঁচিয়ে উঠলেন—'শৈলেনবাবু জোর বরাত—উদ্যোগিনপুরুষসিংহম্—কি যে বলে…ঐ দেখুন!'

ওঁর তর্জনী অনুসরণ করে দেখি অস্তপ্রায় সূর্যের রাঙা আলো পড়ে ঘাসের ভেতর কি একটা চিকচিক্ করছে।। একটু লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম—আমাদের টিফিন কেরিয়ারটা। তার একটু দূরেই আর একটা কি চিকচিক করে উঠল, ঠাহর করতে বোঝা গেল আমাদের বন্দুকটা—হাওদা কাৎ হতেই দুটো নিশ্চয় নীচে পড়ে গিয়েছিল।

আমি নলিনীবাবুকে ধরে ফেললাম, বললাম, 'আপনি কলকাতার মানুষ, মনুমেণ্ট হলে আপত্তি করতাম না, কিন্তু গাছে উঠা-নামা করাটা আমারই এলাকার মধ্যে পড়ে, বসুন আপনি।'

একটু অনুযোগের দৃষ্টিতে চাইলেন নলিনীবাবু, বললেন, 'আমি দেখলাম, আর আপনি আত্মসাৎ করবেন, তারপর 'আমার কলকাতা আর আপনার বেহারের পেট' এই ছুতোয় বড় ভাগটা দখল করবেন—এ বীর-ধর্ম হয় না শৈলেনবাবু…'

ডালপালার মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি পর্যন্ত বেশ গেলেন নলিনীবাবু, তারপরে নামতে যাবেন, কি যেন একটা দেখে থমকে গেলেন, তারপর যেভাবে অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এসে আবার বসলেন, আমি বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারখানা কি নলিনীবাবু, ফিরে এলেন যে।'

বেশ বোঝা গেল গলা শুকিয়ে গেছে, টিনটা আমার কাছে ছিল, বললেন, 'সিগারেট একটা।'

দু-একটা টান দিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে শৈলেনবাবু, আর ফিরে যেতে হবেনা—'

'সে কি!'

একটা চরম ভয় আর নিরাশার জন্যেই বোধ হয় নলিনীবাবুর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তা আবার ফিরে এসেছে, সিগারেটেও বোধ হয় একটু কাজ হয়েছে, বললেন, 'পুরুষ-সিংহ চিতার পাল্লায় পড়েছেন, সুন্দরী আবার সদ্যপ্রসূতি…'

'কোথায়?'

নলিনীবাবু নীচু হয়ে একদিকে চাইলেন। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি প্রায় শ'খানেক হাত দূরে একটা ছোট, হাততিনেক উঁচু টিলার উপর হামাগুড়ি

দিয়ে একটা চিতা বসে মাঝে মাঝে লেজ আছড়াচ্ছে আর দুটি বাচ্চা সেই লেজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করছে।

অস্তমিত সূর্যের আভায় একটা দুর্লভ-দৃশ্য, কিন্তু সে দেখবার আর সময় নেই। আমরা যে ডালটা ধরে উঠেছিলাম এই বড় ডালে, তাড়াতাড়ি সেটি ধরে নীচের ডালে নেমেই কোমরের র‍্যাপারটা খুলে ডালে বাঁধতে আরম্ভ করলাম। নলিনীবাবু প্রশ্ন করলেন—'ব্যাপারখানা কি? অভ্যর্থনায় যাচ্ছেন?—'

বললাম, "আপনিও নেমে আসুন তাড়াতাড়ি এই ডালে, গেরোটা চেপে ধরুন, নেমে বন্দুকটা নিয়ে আসি, অত ঘুরে যাবার সময় নেই।' উনি আসতে আসতেই আমি র‍্যাপার ধরে পা-টা নামিয়ে দিয়েছি, কিন্তু আর এগুনো গেল না।

এখান থেকে দৃষ্টির আর কোন প্রতিবন্ধক নেই; মনে হয় হাতীর ব্যাপার থেকেই চিতাটার বোধ হয় এই জায়গাটির উপর লক্ষ্য ছিল, র‍্যাপারটা ঝুলে পড়তেই বোধ হয় একটু সতর্ক হয়ে পড়েছিল, আমার পা নামতে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। তার পরেই হনুমানের মত আগে পিছে দুলে দুলে অগ্রসর হ'ল। আমি যে উপরের ডালটা পর্যন্ত পোঁছুতে পারলাম, তার কারণ নিশ্চয় বাচ্চারা পিছু ডেকে দিয়ে থাকবে। একটু পরেই শাবক দুটিকে সঙ্গে করে আধ-ছোটা হয়েই এসে ঘাড় তুলে একটা আওয়াজ করলে।

নলিনীবাবুর চরিত্র দেখে বিস্মিতই হয়ে গেলাম, সম্মুখ বিপদের মধ্যে ওঁর কৌতুকপ্রিয়তাটুকু যেন আরও ফুটে বেরিয়েছে। বোধ হয় এইটে বজায় রেখে উনি চিন্তার পথটা রাখছেন পরিষ্কার। বললেন, 'শৈলেনবাবু, মশাই, সামান্য একটা চিতা-বাঘিনীর ভয়ে হাত-পা আলগা হয়ে পড়ে যাওয়া বীর-ধর্ম হবে না, তার চেয়ে এক একটা ডালের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখি আসুন, র‍্যাপার দিয়ে।'

বললাম, 'চিতা তো কিন্তু গাছে ওঠে।'

'জানি, বাঁধা থাকলে আমাদের লড়বারও সুবিধে হবে, 'উই শ্যাল্ ফাইট উইথ আওয়ার ব্যাক টু দি' ডাল।...নিন্ এইবার এই ক'টা হাত দিয়ে বেশ ভাল করে গুঁড়ো করুন দিকি। আপনার তো বেহারের খৈনি দলা হাত।'

টিনে গোটা চল্লিশ সিগরেট ছিল, অর্দ্ধেকগুলো আমায় দিলেন, প্রশ্ন করলাম, 'একি হবে?'

'বাঁরুদ, আপনার নস্যির ডিবেটাও উজোড় করতে. হতে। কিছু নাও হতে পারে, তবু কোন জিনিসই অবহেলার নয়, একেবারে সাম্নাসামনি এলে, দু'মুঠো ঝেড়ে-দেব, চোখে নাকে যদি যায় তো দিতেও পারে কাজ। বেটি তো পণ্ডিতবংশের মেয়ে নয়—নস্যি নাও বরদাস্ত হতে পারে।"

নীচে থেকে একটা আওয়াজ হ'ল, 'হুম্!' একটু গা ঢাকা হলে বোধ হয় বেশী খোলে।

নলিনীবাবু চাপা গলায়ই উত্তর করলেন, 'বেশ-তো তা'হলে বসে বসে শাস্ত্র আলোচনা করা যাবে।'

আমরা বেরিয়েছিলাম ত্রয়োদশীর দিন। দিনটাও শুভ, আর অন্তত পূর্ণিমাটা বাড়ীতে কাটাব এই রকম ইচ্ছা ছিল। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ হয়ে উঠল স্পষ্ট।

সৌন্দর্যে ভীষণতায় অত অপরূপ পৃথিবীকে আব কখনও দেখি নি। আমার মনে হয় সৌন্দর্যকে পূর্ণতর করে বিকশিত করবার জন্যে তার পেছনে চাই একটা ট্রাজেডি। তাই হয়েছিল সে রাতে, আর তো তোমায় ছেড়েই যাচ্ছি হে মুগ্ধে ধরণী—হে চির-নবীনা পুরাতনী···

না, এ কথাটা বোধ হয় একটু বেশী রকম ভাবালু হয়ে পড়ল। আমরা যে এত নিবিড়ভাবে সেদিন সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরেছিলাম তার আরও একটা কারণ ছিল—যতই রাত এগুতে লাগল ততই বুঝতে লাগলাম বাঘিনীর গাছে উঠবার কোন অভিসন্ধি নেই। আশ্চর্যই বোধ হতে লাগল—প্যান্থারই হোক, লেপার্ডই হোক, গাছে উঠা চিতাবাঘের রপ্ত, কিন্তু সেদিকে আমাদের নৈশ অতিথির কোন রকম তাগিদ নেই। একবার সুধু গোড়ার দিকে গুঁড়ির কাছে একে ঘাড় উঁচুনীচু করে যেন তদারক করে গেল, তারপর আর কিছু নয়। ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না; হতে পারে, উপরে যখন শত্রুই রয়েছে, বাচ্চা-গুলোকে একা ফেলে রেখে যেতে চায় না, এও হতে পারে যে মানুষ-শত্রুরই অভিজ্ঞতা আছে। কিংবা এও হতে পারে ভেবেছে—শিকার ত মুঠোর মধ্যে কিসের তাড়া এত, অবরোধের দ্বারা শত্রুকে করতলগত করা যাক্ না।

জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে, আমাদের সামনে গভীর অরণ্য, ওদিকে বিস্তীর্ণ সমতল, মাঝখানে আমাদের এই কতকটা পাতলা পাহাড়-বন। আমাদের গাছটা খুব পুরনো কিন্তু খুব ঘন ডালপালার নয়, দিকচক্রবাল পর্যন্ত সমস্তটুকুই

আমাদের দৃষ্টির সামনে ঝলমল করছে। রাত্রির প্রথম অংশটা ছিল স্তব্ধ, তারপর যতই গভীর হতে লাগল ততই এদিকে ওঁদিকে এক একটা যে আওয়াজ উঠতে লাগল তা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়ঙ্কর।

আমাদের পায়ের নীচে আমাদের মৃত্যু। সুনিশ্চিত, বেশ জানি, একটু যে অনিশ্চয়তার কথা ভাবছি সেটা একটা সান্ত্বনা মাত্র, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশও তো।

নলিনীবাবু বললেন, 'শৈলেনবাবু, বাঘিনীই তো, নোলা আছে, আমাদের জ্যোৎস্নায় জারিয়ে নিয়ে তারপর খাবে।'

এক সময় ডি. এল. রায়ের সেই গানটাও ধরলেন—আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো…বেশ উন্মুক্ত গলাতেই।

নীচে থেকে মাঝে মাঝে বাঘিনী—হুম্ হুম্ করে সায় দিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সঙ্গত।

এক সময় ভাবের ঘোরে বলে উঠলেন—'শৈলেনবাবু, মরবার আগে ভগবানের কাছে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে যাই আর যেন মানুষ হয়ে জন্মাতে না হয়। বড় কুৎসিত আমরা! চেয়ে দেখুন নীচে, কি অদ্ভুত সুন্দর! ভাবছি, মানুষ আমরা কাপড়-জামার ফাঁকিবাজির সৌন্দর্য নিয়ে লোপাটই হয়ে গিয়ে ওদের জায়গা ছেড়ে দিই না কেন এবার, বুদ্ধির যুগের বোকামিটা দেখাও তো হ'ল অনেক, এবার একটা সৌন্দর্যের যুগই আসুক না।'

ভোর হ'ল। আমরা মানুষের জগতে ফিরে এলাম। আবার একটা অদ্ভুত ধরণের আশা বাঁচতে হবে, উপায় বের কর।…আদি যুগ থেকে যে বিবস্মান্ মানুষকে এসেছেন বাঁচিয়ে, বেদ-সঙ্গীতে নিয়ে এসেছেন পূজা, তাঁকে যুক্তকরে অভিনন্দন করলাম।…হে দেব, যাচ্ছি, তবু মানুষের হয়ে তোমায় যে শেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার অবসর পেলাম, এও তো পরম সান্ত্বনা।

আজও বাঁচালেন, দিবালোকে রহস্যটা প্রকাশ পেল।

সকাল হতে বাঘিনীর চেহারা গেল বদলে।…এ কি রকম কথা।—সমস্ত রাত ছাঁ-পো নিয়ে উপোসী বসে আছি, কিনা স্রেফ গান গেয়ে রাত কাটিয়ে দিলে!

লেজ আছড়াতে লাগল আর উপরে চেয়ে চেয়ে হুঙ্কার, তার পরেই ছুটে

গিয়ে তর তর করে গুঁড়ি বেয়ে খানিকটা উঠে গেল। তার পর কিন্তু সেখান থেকে এক লাফে নেমে পড়ে মাটিতে মুখ রগড়ে থাবা দিয়ে মুখ আঁচড়ে আবার বাচ্চাদের মধ্যে এসে বসে হাঁপাতে লাগল। আমাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়, দু'জনেই কাঠ হয়ে বসে আছি।

বারচারেক এ রকম হয়ে গেলে, নলিনীবাবু উঠলেন, আমি বাধা দেবার চেষ্টা করলাম কিন্তু শুনলেন না, বললেন, "এ বীর-ধর্ম নয় শৈলেনবাবু, সুন্দরী আসতে পারছেন না, দেখতে হয় তো সিংহদ্বারে কি বাধা পাচ্ছেন।'

পরে টের পেলাম আন্দাজটা করে নিয়েছিলেন বলেই এত সাহস। নিষ্কম্প পদে প্রায় ডালের গোড়ার কাছাকাছি পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন, তার পর খানিকক্ষণ ধরে দেখে দেখে চীৎকার করেই উঠলেন একরকম—'শৈলেনবাবু, নারায়ণী সেনা! শীগ্‌গির দেখে যান—ভয় নেই…' বাঘিনীও খানিকটা এগিয়ে এল, কিন্তু তারপর আর কেন এল না বলতে পারি না, সেইখান থেকেই একটা হুঙ্কার ছাড়লে। নলিনীবাবু তাচ্ছিল্যভরে বললেন—'থাম্ মাগী, বোঝা গেছে মুরোদ!'

এমন কিছুই নয়, কাঠপিঁপড়ে, কিন্তু এত যে সমস্ত গুঁড়িটি যেন হলদে করে রেখেছে। একটা চাপ, আস্তে আস্তে উপরেও যাচ্ছে নীচেও আসছে, কিন্তু প্রয়োজন হলে যে কত ক্ষিপ্র—তাও দেখে নিলেন নলিনীবাবু, পকেট থেকে রুমালটা দিলে সেই চাপের গায়ে ছুঁড়ে। কে যেন লুফে নিলে রুমালটা, মিনিটখানেকের মধ্যে সেটা একটা হলুদের স্তূপ হয়ে গেল।

নলিনীবাবু বললেন, 'আর ভয় নেই। এইবার শুধু যুদ্ধটা আরম্ভ করে দেওয়া।'

বিস্মিতই হয়ে গেছি, প্রশ্ন করলাম, 'সেনারা তো আমাদের দিকেও আসতে পারে, আসেই নি বা কেন?'

নলিনীবাবু বললেন, "ঠিক বলতে পারছি না, মনে হয় মাঝের গুঁড়িটার উপরই কোন বড়গোছের ভোজ পেয়েছে…আমাদের সন্ধান পায় নি এখনও এটাও ঠিক। যাক্, তাড়াতাড়ি লড়াইটা আরম্ভ করে দেওয়া যাক।…খুব কিন্তু তরন্ত হতে হবে আর খুব সাবধান…'

একটা লম্বা ডাল ভেঙে নিয়ে তার মাথাটা পিঁপড়ের চাপের উপর ধরলেন। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সামনের পাতার অংশটা হলদে হয়ে গেল; নলিনীবাবু

গোড়াটা আমায় ধরিয়ে দিয়ে বললেন—'আলগোছে ধরে নিয়ে গিয়ে শীগ্‌গির বেটির সামনে ফেলে চলে আসুন!'

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা ডাল ভেঙে নিলেন।

বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ডালটার উপর, কে জানে, বোধ হয় আমাদেরই একজন পড়ল ভাবলে।

অবস্থাটা বুঝতে না বুঝতে একেবারে গোটা চার ডাল তার ঘাড়ে পিঠে গিয়ে পড়ল ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে।

তার পরই সে কি আছড়ানি আর চীৎকার! গাছের গোড়াটা যেন চষে ফেললে, তার পর উঠে আর বাচ্চাদের দিকে নজর না দিয়ে সোজা দৌড়, ঝর্ণা ডিঙিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে সমতলের দিকে, তার পর ভুলটা বুঝতে পেরে ঘুরেই সোজা শালবন।

আর দেরি করা নয়, বন্দুকটি আগে হাত করা দরকার। ডালে আলোয়ান বেঁধে আমবা নেমে এলাম, খুলে আনবাব উপায় পরে ভাবা যাবে।

বাচ্চা দুটো কিরকম হকচকিয়ে গেছে, মায়ের অবস্থা দেখে ওদিকে এগোয়ও নি, একটাকে তুলে নিয়ে নলিনীবাবু বললেন, 'গেরো দেখুন না, এখন ওঁর ছেলেমেয়ে মানুষ কর তোমরা ব'সে ব'সে!…'

ঘটকিনী

প্রতীপ এসে বেশ একটু বিস্মিত হয়ে গেছে।

বাড়িটা যেন খালি মনে হচ্ছে, অন্তত ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না। বাইরে শুধু কর্তা অমরনাথ বারান্দার একেবারে ও-প্রান্তে একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে বসে আছেন।

প্রতীপ ওঁকে সাধ্যমতো এড়িয়েই চলে; কতকটা সন্তর্পণেই বারান্দা পেরিয়ে সামনের ঘরটায় প্রবেশ করলে, তারপর সব নিঝুম দেখে বেশ বিমূঢ়ভাবেই ফিরে আসবে, এমন সময় সামনের দরজার পরদা ঠেলে সুলতা বেরিয়ে এল, বললে 'ফিরে যাচ্ছিলে নাকি ? বেশ তো !...এসো।'

ভেতরের বারান্দা পেরিয়ে দুজনে একেবারে বাড়ির শেষদিকে পড়বার ঘরে উপস্থিত হয়ে সামনাসামনি দুটো চেয়ারে বসল। সুলতার মুখে একটু কৌতুকের ভাব, আবার বললে, 'ভাগ্যিস গিয়ে পড়লাম, নইলে তো ফিরেই যেতে দেখছি; আচ্ছা মানুষ যা' হোক !'—একটু হেসেই উঠল। প্রতীপ বললে, 'তোমার চিঠিতে লেখা ছিল, চায়ের নেমন্তন্ন, নিশ্চয় আসবে।'

'আবার চৌকাঠে পা দিয়েই চলে যাবে—এটাও ছিল নাকি লেখা ?'

'তা দেখছি বাড়িতে কেউ নেই...এক তুমি ছাড়া।'

'ও ! সেই ভয়ে ?...তা যাদের নেমন্তন্ন তারা যাবে না ?'

প্রতীপ ওর মুখের পানে চেয়ে থেকে কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে, তারপর তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল, বললে, 'ও ! তোমার সেই রসিকতা ?...না, অতটা বোঝবার আমার সাধ্যি নেই।'

'মোটা বুদ্ধি বলেই তো বেঁচে আছি ; বুঝতে পারলে কি আসতে ?'

আবার হাসলে প্রতীপ, প্রশ্ন করলে, 'ব্যাপারখানা কি ?'

'কিছুই নয়। ওঁরা সবাই চলে গেলেন, খালি বাড়ীতে একলা বসে থাকব —তাই...'

'তুমিও গেলে না কেন ?'

সুলতা মুখটা অল্প ঘুরিয়ে নিলে, বললে, 'বেহায়া বলে একটু বদনাম আছে বটে, কিন্তু অত বেহায়া হইনি এখনও।'

'একটু ভেঙে বলো ; মোটা-বুদ্ধি জেনেও আবার হেঁয়ালি !'

'একটু ভাবো ব'সে ব'সে, বুদ্ধিতে একটু শান পড়া দরকার। আমি চায়ের জল চড়িয়েছি, তোয়ের করে আনি।'

'কখন চড়ালে তুমি এর মধ্যে ?'

সুলতা যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল, বললে, 'এই তো তুমি, গেটের ভেতর ঢুকছ...'

একটু দুষ্টামির হাসি ঠোঁটে ক'রে চলে গেল।

প্রতীপ ওর বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। কি করা যায় ? দিনদিনই অনুভব করছে সুলতা এইরকম কৌতুক-চপল-গতিতে ওর জীবনে গভীর হতে গভীবতরভাবে করছে প্রবেশ, অথচ এমন অবস্থা প্রতীপের, এক সুলতা ভিন্ন কাউকে এ-পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও জানিয়ে দিতে পারলে না, তার আশা কি, কিজন্যে এ বাড়িটার ওপব তার টান, কিজন্যে এত যাওয়া-আসা। সুলতাব দাদা মহিমের সে সহপাঠী ইঞ্জিনীয়ারিং-কলেজে ; ও এইটুকুর আড়ালেই সমস্ত ব্যাপারটুকু লুকিয়ে যেন কোনরকমে লজ্জা বাঁচিয়ে আছে। তাও যদি মহিমকেও একটু আঁচ দিয়ে রাখে তো হয় ; কিন্তু এমনই লাজুক, আঁচ দেবে কি, নিজে হতেই তার যেটুকু আন্দাজ করা সম্ভব, সাধ্যমতো নিজের কথাবার্তায় সেটাও কাটিয়ে এসেছে এ-পর্যন্ত, অন্ততঃ চেষ্টা তাই করে। বাড়িতে তার শান্ত, সলজ্জ ব্যবহারেই সবার মনে একটা প্রীতির আসন বিছিয়ে নিয়েছে, তারই জোরে যাওয়া-আসা, মহিমের বন্ধুত্বের অজুহাতে, আর তারই মধ্যে এই একটি মন শুধু কোন্ অলক্ষ্য নিয়মে সব বুঝে নিয়ে ওর দিকে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। কিন্তু খানিকটা প্রকাশ না করে দিলে এ যে সর্বনাশই হ'তে বসেছে।...কী করা যায় ?...সর্বনাশ বৈকি,—সুলতা বলে বটে,—হঠাৎ বেরিয়ে ওকে দেখতে পায়, কিন্তু আসলে সে অনেকক্ষণ থেকেই ওর প্রতীক্ষা করছিল—নইলে গেটে ঢুকতেই ওকে দেখলে কি ক'রে ?

ইতিমধ্যে স্বাভাবিক নিয়মে যা হওয়ার তাও হয়ে চলেছে। খানিকটা পুরাতন-পন্থী মধ্যবিত্তের বাড়ি। মেয়ে বড় হয়েছে, বি-এ পড়ছে, এই যথেষ্ট।

কথাবার্তা চলছে বিবাহের, একটা লেগে গেলে পাসের অনেক আগেই পূর্ণচ্ছেদ পড়বে। তা হলেই সব শেষ।......অবস্থাটা কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে প্রতীপের, কিন্তু করছেই বা কী ?

সুলতা এল, একটা ট্রেতে চা আর আনুষঙ্গিক সব নিয়ে। প্রতীপ বললে—'কোথায় গেছেন সবাই বললে না তো ? তুমিই বা গেলেনা কেন ? আরও একটা কথা, সেটা না হয় না-ই জিগ্যেস করলাম।'

চা ঢালছিল, ঘুরে চাইলে সুলতা, হাতটা থামিয়ে একটু জিদের সঙ্গেই বললে—'সেইটেই আগে জিগ্যেস করতে হবে।'

'ঠিক উত্তরটা পাব ?'

'প্রশ্নের আগে উত্তরেব প্রতিজ্ঞা চলে না।'

'জিগ্যেস করছিলাম—বাড়িতে কেউ নেই, এ অবস্থায় তেমন একটা কারণ না থাকলে তো তুমিও ডেকে পাঠাতে পার না ?'

একটু চুপ করে চা ঢালতে লাগল সুলতা, তারপর কাপটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'মা-রা চায়ের নেমন্তন্নে গেছেন বিনোদবাবুদের বাড়ি। তুমি চেনো তো ? না চেনো, তাঁর ছেলে সুবিমলবাবুকে তো চেনো ?'—প্রতীপের শেষ প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে নিজের জন্যে চা ঢালতে লাগল মাথা নীচু ক'রে।

'ও !'—বলে প্রতীপ চিন্তিতভাবে আস্তে আস্তে চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

একটু পরে প্রশ্ন করলে, 'কথাবার্তা খুব এগিয়েছে নাকি ?'

'না এগুলে আমি বাইরের লোককে ডেকে চা ক'রে খাওয়াই ? বাকিটুকু বোধহয় আজই শেষ করে আসবেন মা।...এই কেকটা আগে খাও, নিজে তোয়ের করেছি আজ ; আনন্দের দিনই তো ?'

প্রতীপ চায়ের কাপটাও নামিয়ে রাখলে, একটু বিষণ্ণ কণ্ঠেই বললে, 'সু, তোমার ঠাট্টা এ-জন্মে বন্ধ হবে না ? তোমার—বোধ হয়—সুখবরই, কিন্তু যাকে নেমন্তন্নটা করলে, তার মনের দিকটাও তো দেখা উচিত ছিল।...আমায় মাফ করো, সু, আমি উঠি।'

সুলতা চামচেটা দিয়ে ওর হাতটা টেবিলে চেপে ধরলে, বললে—'বোসো একটু, দিব্যি রইল আমার। একটা কথা—তোমার অভিমান আছে, সেটা মেয়েদের জিনিস, তোমাদের অত বেশি থাকা উচিত নয় ; যা থাকা উচিত পুরুষ হিসেবে, সেটা কিন্তু একেবারেই নেই।'

'কি ?'

ওর ব্যাকুলভাব দেখে সুলতা আবার হেসে ফেললে, বললে, 'তুমি বেহায়া মেয়েই পছন্দ কর ?'

প্রতীপ আরও বিমূঢ় হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে, 'বাঃ, তা কেন !…মানে, তুমি বেহায়া কী এমন…বাঃ !'

বেশ খিল্‌খিল্ করেই হেসে উঠল সুলতা, বললে, 'ছিলাম না, ক'রে তুলেছ তুমি—আরও তুলবে ক'রে।…আচ্ছা, একটা কথা বলো তো—"মনের দিকটা দেখা উচিত ছিল" যে বলছ, আমার যতটা দেখার, তা তো দেখছি, কিন্তু আমি দেখলেই কাজ হবে কি ?'

'তবে ?…আর কার দেখা দরকার ?'

'নাও, কেক্‌টুকু খাও।…আমি জানলেই হবে ?—মেমসায়েব তো নই ? মানে, বেহায়াপনাতে তো অতটা এগুতে পারিনি এখনও।'

কেকের টুকরাটা মুখে দিয়েছে, কিন্তু চিবুতে ভুলে গেছে প্রতীপ ; একটু মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলে, 'তবে, বাড়িতে বলব, বাবা, মা, দাদাদের ?… না, সে আমার দ্বারা হবে না।…কী ভাববেন বলো দিকিন তাঁরা ?'

'তোমার দ্বারা যে হবে না, তা আমি অনেকদিন থেকেই জানি…'

'তা হলে ? আর কে জানাবে বলো…'

'আমি জানিয়ে দিই ?'—এমন খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল সুলতা যে, খানিকটা চা হাতে পড়ল ছল্‌কে।

প্রতীপ তাড়াতাড়ি রুমালটা বের করে মুছিয়ে দিলে হাতটা।

অনেকখানিই এগিয়ে এনেছে সুলতা, এর পর বেদনা আর সমবেদনার মধ্যে যে কথাটুকু হ'ল, তাতে প্রতীপকে ডেকে আনবার উদ্দেশ্যটা আরও স্পষ্ট ক'রে দেবার সুযোগ পেলে, বললে—তার দাদা যে তার বৌদিদিকে লাভ করে, তাতে নিজেই মনের কথাটা শ্বশুরকে জানিয়ে দিয়েছিল, এইরকম নাকি শোনা যায়।

এইখানেই আপাতত তার বেহায়াপনার সীমা টেনে দিলে।

বিদায়টা হ'ল অনেকটা নাটকীয় পদ্ধতিতে—যেন এই তাদের শেষ বিদায়, যেন আর দেখা না হলেই মঙ্গল, যেন স্মৃতিও যেটুকু আছে, সেটুকুও মন থেকে

মুছে যায়। সুলতাই ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লাগল, প্রতীপ বেশির ভাগই রইল চিন্তিত, বিষণ্ণ। এক সময় উঠতে হ'ল—ওঁরা আবার কখন এসে পড়েন। সুলতাও উঠল শেষ বিদায়ে এগিয়ে দিতে।

বাইরের বাবান্দায় এসে প্রতীপ একটু দাঁড়াল। অমরনাথ বারান্দাটিতে তেমনিভাবে ব'সে আছেন ওদিকে মুখ করে, তার ওপর কানে খাটো, চোখেও মোটা চশমা, কয়েক হাত দূরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, খোঁজ রাখবার কথা নয়।

সুলতা প্রশ্ন করলে, 'দাঁড়ালে যে? ঘরে কিছু, ভুলে এসেছ নাকি?'

'না, এই যে যাই—' কিন্তু গেল না।

সুলতার একটা সুবিধা, কাঁদলেও যেমন চোখে জল আসে, হাসলেও তেমনি, বিশেষ ক'রে হাসি চাপতে গেলে। মুখ ফিরিয়ে চোখদুটো একটু মুছে নিলে, তাবপর প্রতীপেব মুখের দিকেই চেয়ে বললে, 'ও, বুঝেছি, বাবার কাছেও বিদেয় নেবে? তা যাও, এসব কথা কিন্তু যেন…'

আঁচলটা চোখে মুখে চেপে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

অমরনাথ বারান্দার যেখানটায় বসেছিলেন, তার পাশেই আর-একটা ঘর; প্রতীপ দ্বিধাগ্রস্ত পদে পৌঁছুবার আগেই সুলতা গিয়ে তার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চুপটি ক'রে পিছনে দাঁড়াল।

প্রতীপ গিয়ে চেয়ারের পেছনটিতে দাঁড়িয়েই রইল প্রথমে, তার পর যেন হঠাৎ সাহসে ভর করে সামনে গিয়েই পায়ের ধুলো নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল।

একটু ঠাহর করে তবে দেখতে পান অমরনাথ, প্রশ্ন করলেন, 'কে?'

'আজ্ঞে, আমি প্রতীপ।'

'ও, প্রতীপ, এসো এসো। অনেকদিন আসনি, খবর সব ভালো তো? বোসো চেয়ারটায়।'

একটা চেয়ার পাশে থাকে, প্রতীপ বসল; বললে—"হ্যাঁ, আসতে পারিনি অনেক দিন…'

মিথ্যার বহর দেখে দোরের ওদিকে সুলতার চোখদুটো বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল, পরশুই এসেছিল প্রতীপ। যতই দিন যাচ্ছে, ততই আসাটা হচ্ছে ঘন ঘন, আর সেই লজ্জাটা যাচ্ছে বেড়ে, এই তো লক্ষ্য করে আসছে সে। উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অমরনাথ বললেন—'হ্যাঁ, কাকে যেন জিগ্যেস করছিলাম, সুলতাকেই বোধ হয়…"

প্রতীপ উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—সুলতা আবার ওদিকে কি ব'লে ব'সে আছে।

অমরনাথ শেষ করলেন, 'হ্যাঁ সুলতাকেই তো ; বললে—খোঁজ রাখে না কখন আস যাও।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।'—বলে প্রতীপ আস্তে আস্তে নিশ্বাস মোচন করলে। বোধহয় উত্তরটা কিরকম খাপছাড়া হয়ে গেল বলেই একটু থেমে বললে, 'পড়াশোনা নিয়েই বেশি থাকে শুনেছি—মহিম তাই বলে…মানে, একদিন নিজের থেকেই বলছিল মহিম…মানে, বলে যাচ্ছিল, আমি একটা গ্রাফ্ নিয়ে অন্যমনস্ক ছিলাম, শুনছি না দেখে যখন থেমে গেল তখন—তখন…'

নিজেও থেমে গেল। একে জোরে বলতে হচ্ছে, তায় জট পাকিয়ে ফেলছে, রুমালটা বের করে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।… অমরনাথ বললেন, 'বোনকে নিয়ে ওর একটু গুমর আছে—বি-এ পড়ে। বি-এ প'ড়ে হবে কি বলতে পার ?

'আজ্ঞে, কিছুই নয়।'—একটু সহজ হয়ে এসেছে কথাবার্তা, তা ভিন্ন মুরুব্বিয়ানার কথাটা বলাও সহজ ; ব'লে একটু তাচ্ছিল্যের হাসিও হাসলে প্রতীপ।

দোরের আড়ালে সুলতা ঠোঁট দুটো চেপে মাথাটা দোলালে।

অমরনাথ বললেন, 'যাক, তোমাদের মধ্যেও যে আমাদের মনের কথাটা বোঝবার লোক আছে, এতে আশ্বস্ত হলাম একটু ; তোমার বন্ধু একটু—কি বলব—'

'অবুঝ।'

দোরের ওদিকে সুলতা মনে মনে বললে, 'আসতে দাও দাদাকে !'

অমরনাথ বললেন, 'হয়তো ওদের খানিকটা যুক্তি আছে। আমরা তো ঠিক এ যুগের লোকও নই। তবে আমাদের কথাটাও একেবারে ঠেলে ফেলবার মতো নয়, তাই আমার মনে হয়, মাঝামাঝি একটা পথ ধরে এগুনোই ভালো। তাই আমি বলেছি—পড়ুক বি-এ, কিন্তু কোথাও কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলে আমি পরীক্ষার জন্যে ব'সে থাকতে পারব না। ঠিক বলিনি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই-তো ঠিক।...কথাবার্তা কোথাও হয়েছে নাকি পাকা?... আমি এইজন্যে জিগ্যেস করছি যে, মহিমের এটা পরীক্ষার বছর ...'

'না বাবা, হোক পরীক্ষার বছর। আমার যদি আজ ঠিক হয়ে যায় তো কালকের জন্যে অপেক্ষা করি না। না-হয় দুটো দিন যাবেই মহিমের; আমি এর বিয়েটা না দিয়ে যেতে পারলে তো চোখ বুজলেও নিশ্চিন্দি হ'তে পারব না।...কথাবার্তার বিষয় জিগ্যেস করছ—বিনোদবাবুর ছেলেটির সঙ্গে দেখছি চেষ্টা, তবে...'

সুলতা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছে—তীব্র ঔৎসুক্যে প্রতীপ চেয়ে আছে বাবার আনত মুখের দিকে। বুঝছে এই সুযোগ, এইখান থেকে কথাবার্তা আবার ঘুরে গেলে আর আশা নেই, তবু প্রয়োজন-মতো সাহস এনে ফেলতে পারছে না।... দয়া হয়, আবার রাগও তো হয়,—একি পুরুষ মানুষ? সমস্তটুকু তো সে-ই করে দিলে, বাড়ির সবার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, আর বেটাছেলে হয়ে ও এই শেষরক্ষাটুকু করতে পারবে না!

'তবে ব'লে কি বলতে যাচ্ছিলেন? ছেলেটি মন্দ নয় তো?'

যাক, সাহস হয়েছে, মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে বলেই ফেললে প্রতীপ, তারপর পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপালটা মুছে আবার সেইরকম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে অমরনাথের মুখের পানে চেয়ে রইল। একটা সুবিধা, মোটা চশমার ওদিকে দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ নয়।

অমরনাথ উত্তর করলেন, 'মন্দ নয় কেন, ভালোই। তবে বাপের খাঁই বড্ড বেশি, একে তো মেটাতে পারব বলে ভরসা হয় না, তার ওপর আমার প্রিন্সিপালে বাধে—আমি নিজে যখন আমার ছেলের বিয়েতে নিইনি...'

সুলতা দেখছে একটা অমানুষিক চেষ্টার জন্য প্রতীপ যেন একটু একটু কাঁপছে। এবার কপালটা আগেই মুছে নিলে, বললে, 'ছেলের বিয়েতে টাকা নেওয়া! বাবা শুনলে...বাবা এ কথা শুনলে...'

'তোমার বাবারও এই মত?'—প্রশ্নটা করে অমরনাথ যেন বাঁচালেন।

'আজ্ঞে, বাবা শুনলে তো ভেঙেই দিতেন কথা—তক্ষুনি...বলেন—আপনার মতনই তিনিও বলেন—মানে আপনার মতনই তাঁরও প্রিন্সিপালে বাধে...'

একজন নিজের মতের মানুষের সন্ধান পেয়েও যেন পুলকিত হয়ে উঠছেন অমরনাথবাবু, উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আমিও তো এক্ষুণি ভেঙে দিই বাবা—শুধু খরচের জন্যেই নয়, নিজের মেয়ে যখন, সাধ্যমতো করবই, কিন্তু ঐ ডিম্যাণ্ড ! ·· ইচ্ছে তো হয় ভেঙে দিই—এক্ষুণি, কিন্তু পাই কোথায় পাত্র তেমন—যার বাপ···'

সুলতা নিজের তর্জনীটা কামড়ে ধরেছে। তীব্র উদ্বেগে ওর কৌতুক-প্রিয়তাও গেছে উবে—বাবাই না-হয় এতটুকু বুঝে নিন এবার। সব সমান !

গেটে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াল—ওঁবা সবাই এসে গেছেন। অমবনাথ প্রশ্ন করলে, 'এসে গেল সবাই ?'

এই প্রশ্নটাব আড়ালে কথাটা বলবার বোধহয় একটু সুবিধা হল প্রতীপের, বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। উঠি তাহলে।··· ঠিক কথা, পাত্রের কথা জিগ্যেস করেছিলেন—মহিম বোধহয় একটা সন্ধান দিতে পারে আপনাকে—জিগ্যেস করবেন তো ?'

সুলতা আঙুলটা মুখ থেকে বের করে নিয়ে দেখলে—দুটো দাঁতের দাগ লাল হয়ে বসে গেছে। ·· যাক, যে ভাবী শ্বশুরের কাছে এতটা এগুতে পেবেছে, সে এবার ভাবী সম্বন্ধীব কাছেও বাকিটুকু খোলসা করে দিতে পারবে বলে আশা করা যায়। ওঁবা ট্যাক্সি থেকে নেমেছেন। প্রতীপ সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ওদিকে ঘবের মধ্যে থেকে সুলতা এল বেরিয়ে। বৌদিদি সুলতাকে বললে, 'না গিয়ে ভালো করেছ, ঠাকুরঝি, একেবারে যাচ্ছে-তাই, পয়সা ক'টাই মাটি। তোমার মাথাব্যথাটা আছে কেমন ?'

কিসেব পয়সা মাটি !—প্রতীপ বিস্মিতভাবে চেয়ে ছিল, সুলতার মা প্রশ্ন করলেন, 'প্রতীপ যে ! তুমি কখন এলে, বাবা ?'

'আজ্ঞে আমি···আমি এই আসছি···এসেই জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলাম—আপনারা'··· ?'

'আর বোলো না, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম—যাচ্ছে-তাই—বোকা-দণ্ড দিয়ে এলাম।···প্রতীপকে চা দিয়েছিস, লতা ?'

সিনেমা !—অবোধ্যভাবেই প্রতীপের দৃষ্টি সুলতার মুখের ওপর গিয়ে পড়ল,

সে কিন্তু ঘুরিয়ে নিয়েছে মুখটা। সেইভাবেই বললে, 'শুনছ, এইমাত্র এসেছেন।…চা তো কেউ হাতে ক'রে ব'সে নেই, বলো বৌদি?'

'তা বৈকি।'

বৌদিদির মুখেই শুধু একটা রহস্য-হাসি রইল ফুটে, হয়তো পেরেছে কিছু আন্দাজ করতে, তাদেরও তো ছিল এমনি পূর্বরাগের পালা।

শূন্য পুরাণ

পূজার ছুটি এসে গেল। মেয়েদের হোস্টেলে একটা নাটক ছিল, রাত দশটায় সময় গেল ভেঙে।

মণিমালার ছিল নায়কের ভূমিকা। বাংলার অগ্নিযুগের একটি ছেলে, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, দেশের জন্য আত্মাহুতি দিলে—প্লটটা মোটামুটি এই। তারই সঙ্গে একদিক থেকে ব্যর্থ প্রেমের একটু হা-হুতাশ আছে, যা হ'লে বিপ্লব চলে না, কিন্তু যা না হ'লে নাটক হয় অচল। বইটি কলেজেরই একজন প্রফেসারের লেখা।

চমৎকার অভিনয় করলে মণিমালা, হাততালি যেন একচেটে করে নিয়েছে। শেষ হলে এল প্রফেসারদের, মেয়েদের অভিনন্দন। সেটার বেগ কমে এলে মণিমালা স্টেজের বাইরে খানিকটা তফাতে একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে দাঁড়াল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি!—এতদিন পার্ট তোয়ের করার মধ্যে নিজ ভূমিকার সঙ্গে মিশে গিয়ে যে-ভাবটা লেগে থাকত মনে, আজ অভিনয়ের সাফল্যে, সবার অভিনন্দনে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভেতর থেকে একটা বীররস যেন ফেনিয়ে উপচে পড়ছে, সেইসঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের একটা কারুণ্যও।··· পুরুষের মন তাহলে এই! নভেল পড়েছে, নাটক পড়েছে, অভিনয়ও দেখেছে অনেক, কিন্তু প্রত্যক্ষের এত কাছাকাছি হয়ে এভাবে কখনও এ জিনিসটাকে উপলব্ধি করেনি মণিমালা।

একবার আগাগোড়া ভালো করে নিজের নূতন সাজটা দেখলে মণিমালা। পায়ে পুরুষের জুতা, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, চোখে টরটয়েজ শেলের চশমা; মেক-আপ্ করবার লোক ভাড়া করে আনা হয়েছিল, চুলটাকে বেঁধেছেঁদে অদ্ভুতভাবে অবিকল বেটাছেলের বাবরির মতো ক'রে দিয়েছে; খুব হালকা একটু গোঁফ, কানের পাশে, চোয়ালের ওপর দাড়ির অল্প অল্প রেখাও আছে।··· সব মিলিয়ে বিচিত্র এক কাণ্ড, যা স্টেজের ওপর এমন করে ঠাহর করবার ফুরসত হয়নি। এই কাঠামোর মধ্যেই মণিমালা বলে যে একটি মেয়ে ছিল এতদিন, তাকে যেন আর অনুভবই করা যাচ্ছে না।

কী সব আজগুবি কথাও মনে হচ্ছে ক্রমে,—এই ধরো, বাড়ি ফিরে যাওয়াটা; মনটা যেমন উঁচু পর্দায় বাঁধা রয়েছে, তাতে একজন পুরুষের অভিভাবকত্বে যাওয়াটা কেমন যেন হালকা বলে মনে হচ্ছে, কতকটা আত্মাবমাননাই বলা চলে। কেন এতটা পরাশ্রয়ী হওয়া? ঠিক এর পাশেই আবার নিজের পোশাকের, নিজের দাড়ি-গোঁফের কথা ভেবে একটু হাসিও ঠেলে উঠছে মাঝে মাঝে। গুরু-লঘু দুইয়ে মিলিয়ে কী যেন একটা করতে ইচ্ছে করছে মণিমালার! একটা নূতন রকমের কিছু।

স্টেজের দিকে খোঁজ পড়ে গেছে—মণিমালা কোথায়?...মোনু হঠাৎ কোথায় গেল?

স্বাতি এসে উপস্থিত হ'ল: 'বাঃ মোনুদি, তুমি এখানে! আর ওদিকে তোমায় গোরুখোঁজা করছে সবাই। প্রফেসার মিত্রের মোটরে তুমি বাড়ি যাবে তো? তাঁরা সবাই তোয়ের।'

মণিমালা কী ভাবছিল, স্বাতির মুখটা চেপে ধরলে, একটু চাপা গলায় বললে: 'ওঁকে বল্‌গে আমি অরুণাদির কারে চলে গেছি। অল্‌রেডি। যদি জিগ্যেস করেন, কার কাছ থেকে জানলে, অবিশ্যি করবেন না তত খুঁটিয়ে জিগ্যেস,—তাহলে কারুর নাম করে দিস্, লক্ষ্মীটি। যা, অবিশ্যি যে চলে গেছে, তার নামই করবি।'

'তা যাবে কি করে তুমি? রাত প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে এল।'

'বাঃ, কেন? এতবড় বীরের পার্টটা করলাম, আর নিজে একটু একলা বাড়ি যেতে পারব না?'

অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে একটু হেসে তার মাথায় হাতটা দিয়ে বললে: 'নারে, বোকা, আছে ব্যবস্থা, তাই তো বলছি। তুই যা, লক্ষ্মী দিদি আমার।'

স্বাতি স্কুল-বিভাগের মেয়ে। ছেলেমানুষই, তবু কথাগুলো তার একটু কিরকম-কিরকম লাগল; কিন্তু আর কিছু বললে না, আস্তে আস্তে চলে গেল।

মণিমালা সত্য কথাটাই একটু ঠাট্টার ভাবে বলেছে। আর স্টেজ বা সাজঘরের দিকে ফিরে গেল না। সেইখান থেকেই বেরিয়ে একটু গা-ঢাকা দিয়ে একেবারে খানিকটা দূরে একটা মাঝারি গোছের রাস্তায় গিয়ে উঠল।

এখান থেকে তার বাড়ি ছু'দিক দিয়েই যাওয়া যায়, সারকুলার রোড হয়েও আর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হয়েও। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ঢের কাছে, কিন্তু সেইজন্যই কারুর না কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা; থিয়েটার ভাঙল, এখন সবাই ঐদিককার ট্রাম-বাসই ধরবে। মণিমালা হনহন করে সারকুলার রোডের দিকে চলল, এবং পৌঁছুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাম পেয়ে গেল।

একেবারে শেষ ট্রাম নয়—শেষ ট্রামের ভরসা করে নিশ্চয় আসতও না মণিমালা—তবু বেশ খালি, রাত অনেকখানি হয়েছে তো। মণিমালা বেশী না এগিয়ে সামনের একটা মেয়েদের সীটেই বসে পড়ল।

গোটা দুয়েক স্টপেজের পরই একেবারে হুড়মুড় করে মাঝারি গোছের একটি দল—অবশ্য বেটাছেলেরই দল—উঠে পড়ে সমস্ত আসন ভর্তি করে ফেললে। পরে টের পাওয়া গেল, কোথায় যেন সব নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল,—কোন্ জিনিসটা কিরকম হয়েছিল তার সমালোচনা আছে, ঢেকুর আছে, ভরা পেটের রসিকতা আছে; বেশির ভাগই ছেলেছোকরা-যুবা, অল্প সময়ের মধ্যে ট্রামটা সরগরম হয়ে উঠল। একজন মণিমালার পাশেও বসেছে; একটু বেশী রসিক, অপরিচিত হলেও মণিমালাকে সাক্ষী মেনে ভোজন-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ছু'একটা সরস মন্তব্য করলে, একটু চেয়ে চেয়ে মুখটা দেখলেও, সুপুরুষকেও তো দেখে থাকে লোকে।

অদ্ভুত লাগছে মণিমালার, আজ অদ্ভুত লাগবার যেন মরশুমই পড়ে গেছে। ...একটু অন্য ধরনের রসিকতাও করলে; মেয়েদের সীটেই বসে আছে দুজনে, তাই নিয়ে: 'ওদের কেউ যদি দয়া করে এসে পড়েন মশাই, তো ভরা পেটে উঠে পড়তে হবে।'

মণিমালা বললে, 'আমি না হয় উঠে পড়ব'খন, আপনার অবস্থা বুঝিয়ে বললে আপত্তি নাও করতে পারে। আজকাল অনেকে এসব মাইণ্ড করে না।'

'আপত্তি করে না আপনাদের মতন ইয়ে সম্বন্ধে। আমাদের এই কাটখোট্টা চেহারা, এতে কখনও আমল দেয়, মশাই?—নজর পড়ার সঙ্গে ক্লিয়ার আউট! তার ওপর আবার খেয়ে কুমীর হয়ে রয়েছি—অসভ্যের মতন ঢেকুর মাঝে মাঝে...'

পেটে হাত বুলুতে বুলুতে সত্ত সত্ত একটা উদ্গার ক'রে নিজের রসিকতায় হেসে উঠল।...এও এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আজ মণিমালার,—ঠাট্টাটা গিয়ে সপাং

করে লাগল—ঐ যে 'আপত্তি করে না আপনাদের মতন ইয়ে সম্বন্ধে'। কিন্তু পরিপাক না করে উপায় নেই, বরং বেরসিক বলে গণ্য হবার ভয়ে একটু হাসতেও হল, পুরুষে-পুরুষেই কথা হচ্ছে তো? এতটুকুও হবে না?—বিশেষ করে ত্রিসীমানার মধ্যে যখন কোন লেডি নেই।

ছোকরা সুকিয়া স্ট্রীটে নেমে গেল; ও একাই এ পাড়ার দলের মধ্যে ছিল।

সুকিয়া স্ট্রীটে উঠল একটি মেয়ে। বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হবে, সুন্দরী, সাজ-গোজে মনে হয় একেবারে আপ-টু-ডেট্, বাঁ হাতে একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ পর্যন্ত।

ঐ একটি মাত্র খালি সীট, মণিমালার বাঁয়ে; পাশে এসে দাঁড়াতে পুরুষ সাজার জরিমানা হিসাবে মণিমালাকে উঠে দাঁড়াতে হ'ল। মেয়েটি হেসে বললে: 'আপনিও বসুন,...তাতে আর হয়েছে কি?'

নিজে বেশ অসঙ্কোচেই আসন গ্রহণ করলে। মণিমালা একটু থতমত খেয়ে গেছে—লোকটা যা বললে একেবারেই তাই!—আর সঙ্গে সঙ্গেই!...তখনও একটু বাকি আছে কিন্তু, মণিমালা বসে না দেখে বেশ একটু ভঙ্গির সঙ্গে ঘাড়টা বেঁকিয়ে মুখের ওপর দৃষ্টি তুলে বললে: 'উল্টে আপনারই শুচিবাই দেখছি!'

এবার হাসিটা আর একটু স্পষ্ট করলে। মণিমালা বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে বসে পড়ল, ও যেন বাস্তবিকই একজন বেটাছেলে, একজন অতি-আধুনিকার কাছে প্রগতির দিক দিয়ে খেলো হয়ে গেছে।

ট্রামের যত লোকের দৃষ্টি ওদের দুজনের ওপর এসে পড়েছে। পুরুষের পোশাকের মান রাখবার জন্যও কিছু একটা উত্তর অন্তত দিতে হয়, আবার রয়েছেও এতগুলি পুরুষের মাঝে বসে। মণিমালা বললে: 'না, তা নয়, আপনার একটু অসুবিধে হচ্ছে তো...'

'আই ডোন্ট্ মাইণ্ড (I don't mind)।'

মণিমালা কাঠ হয়ে বসে রইল; একটু আগে ঠিক এই কথাটাই না ওর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল! কিন্তু এতটা ভেবে বলেছিল কি?...একটা ধন্যবাদ যে দেওয়া উচিত ছিল, বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়ে সেটা আর হয়েই উঠল না।

ট্রাম এগিয়ে চলল। রাজাবাজারের স্টপেজে দুজন নেমে গেল, সামনের একটা বেঞ্চ থেকে। সবাই মেয়েটির দিকে ঘুরে চাইলে—এবার তো উঠে গিয়ে বসা উচিত, সমস্ত বেঞ্চটাই খালি। উঠল না কিন্তু। মণিমালার দিকেও

চাইছে লোকে, সেই অস্বস্তিতে মণিমালাই সঙ্গিনীকে বললে : 'আমিই না হয় উঠে যাচ্ছি, আপনার অসুবিধে…'

সে একটু হেসে বললে : 'অসুবিধে এই যে, আপনাকে পথ ছেড়ে দিতে আমায়ও দাঁড়াতে হবে।'

বললে ওকেই, কিন্তু কাছের ক'জন যে শুনলে, কান পেতে আছে, তারপর কথাটা ফিসফিসানির মধ্যে চারিয়েও গেল—সেদিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই।… হাতে রুমালটা রয়েছে, বিদেশী এসেন্সের খুব হালকা গন্ধ, মাঝে মাঝে তাই দিয়ে কপালের চুলগুলো তুলে দিচ্ছে ; এদের যা রসিকতা হচ্ছে, মাঝে মাঝে তাতে মুখে রুমাল চেপে একটু একটু হাসছেও।

শিয়ালদর মোড়ে এসে সমস্ত দলটি ধুয়ে-মুছে নেমে গেল। রাত হয়েছে, উঠল মাত্র তিনজন। তিনজনেই বয়স্ক, কি ভেবে আর এদিকে না এসে ট্রামের পেছন দিকেই গিয়ে বসল।

এত খালি, মেয়েটি তবুও কিন্তু উঠল না, পাশেব সীটে গিয়েও বসতে পারত, তাও নয়। অতগুলি পুরুষেব দৃষ্টির নিচে মণিমালারও যে এতক্ষণ একটা সঙ্কোচের ভাব ছিল, সেটা গেল কেটে।…তার জায়গায় একটি সকৌতুক কৌতূহল জেগে উঠেছে, দেখাই যাক না এর শেষ কোথায় ; ক্ষতি কি ?—মেয়েই যখন দুজনে শেষ পর্যন্ত।

প্রশ্ন করলে : 'আপনি যাবেন কোথায় ?'

'আমি নামব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ; আপনি ?'

'আমি আরও খনিকটা এগিয়ে।…কোথায় গিয়েছিলেন ?…মানে একটু রাত হয়ে গেছে বলে জিগ্যেস করছি, অফেন্স নেবেন না আশা করি।'

মেয়েটি একটু ভাবলে, যেন একটু কুণ্ঠা, তারপব মুখের পানে একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতেই চেয়ে বললে : 'বন্ধুর বিয়েতে।'

কি মনে হতে কতকটা যেন আপনা-আপনিই মণিমালার দৃষ্টি তরুণীর সীমন্তের ওপর গিয়ে পড়ল, সেটা লক্ষ্য করে সে নিজেই হেসে বললে : 'না, আমার নিজের এখনও ও-পাঠ পড়া হয়নি।'

ব'লে মুখে রুমাল চেপে বেশ একটু তরল কণ্ঠে হেসে উঠল।

কেন এত সরস মন এতক্ষণে বুঝল মণিমালা। বললে : 'আপনারও তাহলে ওদের মতন নেমন্তন্নর ব্যাপার।……আমিই শুধু উপোসী !'

'কেন, নেমন্তন্ন-বাড়ির গন্ধ তো পেলেন, এতগুলো লোকের গায়ে···ঘ্রাণে তু অর্ধভোজনম্···'

রুমালে মুখ চেপে হেসে এবার একটু কাত হয়ে পড়ল। অবশ্য মণিমালার দিকে নয়।

মণিমালা একটু সাহস করলে, বললে : 'অবিশ্যি ঠিক খাওয়ার দিক দিয়ে না হোক, অন্য দিক দিয়ে গেছে বৈকি পুষিয়ে।'

তারপর কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে সামলে নিলে : 'মানে, তারই গল্প শুনতে শুনতে তো আসছি বরাবর।'

মেয়েটি একটু গম্ভীর হয়ে চেয়ে থেকে বললে : 'এই কথা!···ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'কেন?'

'আমি মনে করি পুষিয়ে যাওয়া মানে বুঝি···'

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই আবার লজ্জিতভাবে হাসতে হাসতে সীটের পিঠে লুটিয়ে পড়ল।

মণিমালার মনে অদ্ভুত রকমের একটা সুড়সুড়ি লাগছে, প্রশ্ন করলে : 'একটা কথা—যদি কিছু মনে না করেন—'

'মনে করবারই মতন মানুষ দেখছেন?'

'না, মনে রাখবার মতন।'—একটু হাসলে মণিমালা, এত সাহস বাড়তে দিলে না—বাড়ান উচিত বেটাছেলে হয়ে? তারপর বললে : 'আমি জিগ্যেস করছিলাম, বন্ধুর বিয়ে, কিন্তু বাসর জাগতে আটকে রাখলেনা যে!'

'এ-কথাটা আপনার জিগ্যেস করা খুবই ভুল হয়েছে।'

'কেন?'

'আটকে রাখলেই আটকে পড়ে থাকতে হবে?'

'আপনারও এ-কথাটা বলা ভুল হয়েছে।'

'কেন?'

'এই তো আমায় আটকে রেখেছেন।···পারছি যেতে?'

মেয়েটি উঠে সরে দাঁড়াল, একটু হেসে বললে : 'যান—।'

উঠবার যথেষ্ট সময় দিয়ে আবার বসতে বললে : 'আপনার কথার উত্তর,—হিংসে বলেও তো একটা জিনিস আছে?—আমার বন্ধু আবার আমার চেয়ে

অন্তত বছর দুয়েকের ছোট···ব'সে ব'সে তার বিয়ে দেখা—আবার তারই বাসরঘরে ব'সে···'

এবারের হাসি আগের সবকেই ছাড়িয়ে, যেন যত চাপতে চাইছে, শরীরের দুকূল ভেঙে ততই ছল্‌কে ছল্‌কে পড়ছে—খিল্‌-খিল্‌-খিল্‌, খল-খল—উঃ !···

এবারের উত্তরটাও যেমন সহজ, তেমনি সরস, মণিমালার জিভ চুলকাচ্ছে। গাড়িও একেবারে খালি হয়ে গেছে কখন, এক যা কনডাক্‌টারটা অন্যমনস্ক হবার ভান করে সিঁড়ির রড্‌টা ধ'রে আছে দাঁড়িয়ে।···তা থাক্‌ গিয়ে। আর সেই কথা—সত্যিকার পুরুষ হয়ে দিলে তখন দোষ ছিল , এতো শুধু অভিনয়ই, যা এতক্ষণ করে এল তারই মেয়াদ একটু বাড়ানো—না হয় অন্যভাবেই।···বলে ফেলতে যাবে, কিন্তু এবার হাসির ঘটা দেখে সন্দেহ হ'ল—পাগল নয়তো !—একেবারে পুরোপুরি নয় নিশ্চয়, তবু···

এই সময় ট্রামটা দাঁড়িয়ে পড়ল, মেয়েটিও বাইরেব দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, নমস্কাব করে বললেঃ 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার···আসি তাহলে··· আপনার খানিকটা সময় একেবারেই নষ্ট করলাম—ক্ষমা চাইছি।'

মণিমালাও নমস্কার ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে, বললেঃ 'সেকি ! এত সার্থক খানিকটা সময় তো আমার জীবনে আসেইনি···আর কখনও আসবে বলেও আশা হয় না···'

বিদায় দেবার জন্য ও-ও তরুণীব সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে, যাই হোক কাটল তো চমৎকারই।

তরুণী নামবাব মুখে একটু ঘুরে দাঁড়াল, একটু হেসে বললেঃ 'ছুটির আগে আমাদের কলেজেব ড্রামা ছিল আজ—বিজয়া—আমার ছিল বিজয়ার পার্ট··· আমার নিজের নাম যদুপতি চট্টোপাধ্যায়···এও একটা ড্রামাই হোলো তো, কি বলেন ? অন্তত তার খানিকটা···আচ্ছা নমস্কার।'

ট্রাম চলতে আরম্ভ করেছে। মণিমালার বিমূঢ় দৃষ্টির দিকে চেয়ে লঘু-পদক্ষেপে এমন টুপ ক'রে নেমে গেল—সে নিজের নামটা জানিয়ে আর বলবার অবসরই পেলে না যে, পরিপূর্ণ ড্রামাটি একেবারেই এক অন্য ধরনের।

ভাঁটু-মোক্তারের নাভি

কথাটা খুব গোপনীয়ই রাখা হয়েছিল, জানত এক শুধু স্বামী।

থিয়েটারের সখ খুবই আছে বাড়িতে—ছেলেবুড়ো সবার মধ্যেই, কিন্তু শুধু বেটাছেলে মহলে। শ্বশুর নেই, তবে খুড়োশ্বশুর একজন উঁচুদরের অভিনেতা, বয়সকালে অ্যামেচার হিসেবে অনেক পাবলিক স্টেজে দাঁড়িয়ে হাততালি লুটেছেন। এখন ষাটের ওপর, কান গেছে, চোখেও মোটা চশমা, অভিনয়-জগৎ থেকে কতকটা বানপ্রস্থই নিয়েছেন, তবু কানের নিতান্ত কাছে যদি কারুর অ্যাকটিঙে একটু এদিক-ওদিক হোল তো আর স্থির থাকতে পারেন না।

কিন্তু ঐ যা বললাম, এ সবই ব্যাটাছেলে মহলের কথা। সুবালাকে দেখতে গিয়ে কেউ গানের কথাও তোলেনি; নাচতে জানে শুনলে পাঁচজন যে গিয়েছিল দেখতে তার মধ্যে বড়ব দিকে অন্তত তিনজন তো তখুনি শিউরে উঠে হার্ট-ফেল করে পড়ত।

সেই সুবালা থিয়েটারে পার্ট নিয়েছে।

স্বামী লোকেন যে কথাটা শুধু জানে তাই নয়, পার্ট যে নিলে সুবালা, সে তারই উৎসাহ আর উদ্যমে। সরস্বতী পূজো উপলক্ষ্যে স্কুল হোস্টেলে থিয়েটার হবে; প্রাক্তন ছাত্রী আর দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে মেট্রন লোক পাঠিয়েছিলেন তার কাছে। গুরুবল এই যে শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা না জানা থাকায় শ্যামবাজারে তার বাপের বাড়িতেই পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা সেখান থেকেই বিদেয় ক'রে দেন। দুদিন পরে শ্বশুরবাড়ি এসে লোকেন যখন শুনলে, বললে, 'ভালোই হয়েছে; ওরাই বা এ ধরনের অনুরোধ কি ক'রে করেন আর?—চিরকাল থিয়েটারই করবে লোকে?'

শ্বশুরবাড়িতে এইরকম একটা ভাঁওতা দিয়ে বাড়ি এসে লোকেন সুবালাকে করালে রাজী, বললে সে কলেজ হোস্টেলে গিয়েই দিয়ে এসেছে কথা। সহজে যে হোল রাজী এমন নয়, সুবালা বলে, এখন আমার উঠোনে চলতেই পা কাঁপে, তো স্টেজে! ভদ্রতা রক্ষার জন্যে আরও অনেক করলে আপত্তি, তারপর একবার মতটা দেওয়া হয়ে গেলে পুরানো উৎসাহটা ফিরে এল; কখন পার্ট মুখস্থ

করবে, কোন সুযোগে লোকেন তাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে সব ঠিক হোল।

উৎসাহটা যখন বেশ চরমে, লোকেন আসল কথাটা পাড়লে, 'তাহলে তোমাকে তো একবার যেতে হয় হোস্টেলে।'

একটু বিস্মিতভাবেই মুখের দিকে চেয়ে সুবালা প্রশ্ন করলে, 'কেন, তুমি তো কথা দিয়ে এসেছ বললে!'

'মেয়েদের হোস্টেলে কথা দিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একখানা হাত কি পা দিয়ে আসতে হোত না? গেটে টুলের ওপর চৌবেজীর চেহারটা তো দেখা আছে।'

মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল, একটু থেমে প্রশ্ন করলে, 'তাহলে?...ছেড়েই দেবে না হয়?'

আর সে ছাড়া সোজা নয় সেটা জেনেই প্রশ্নটা করা, ঝোঁকটা যেরকম বাগিয়ে উঠেছে। সুবালার মনে সেই দ্বন্দ্বই চলছিল, খুব ভারিক্কে হয়ে মুখটা তুলে বললে, 'তোমাদের মিথ্যে বলা অভ্যেস আছে, আমি কিন্তু একবার কথা ভাঙতে জানি না; তা যাকেই দিই।'

—সঙ্গে সঙ্গে নিজের দুর্বলতা বা পরাজয়টা চাপবার জন্যে বললে, 'কিন্তু যাবার কথা যে বলছ, সে কি ক'রে হবে? তার চেয়ে আমি বলছিলাম একখানা চিঠি...'

নিজের রাস্তাতেই নিয়ে যাবে লোকেন, উল্লসিত হয়ে বললে, 'ঠিক আমিও সেই কথাই বলছিলাম। তোমার বুদ্ধি এক এক সময় এমন চমৎকার খোলে!'

সুবালাই আবার আপত্তিও করলে, 'কিন্তু নিয়ে যাবে কে?'

'আমিই তো পারি নিয়ে যেতে, মেট্রনের নামে চিঠিখানা থাকলে তো চৌবেজীর লাঠির ভয় থাকবে না।...সেই ঠিক, তুমি লেখো, এই নাও কলম, দেরি করাটা ঠিক নয়, পার্ট একজনকে দিয়ে দিলে আবার ফিরিয়ে নিতে চক্ষুলজ্জায় পড়ে যাবেন তিনি।'

উৎসাহের মুখে আবার বুদ্ধির প্রশংসা হয়েছে, সুবালা একটা প্যাড টেনে নিলে।

'লেখো—মাননীয়াসু, পত্রবাহক এই ভদ্রলোকটি আমার স্বামী এবং অতিশয় সচ্চরিত্র, অনুগত ও বিশ্বাসভাজন; এঁকে...'

'ঠাট্টা!'—ব'লে সুবালা কলম-প্যাড টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসল।

হাসিটা কোনরকমে কমিয়ে এনে লোকেন বললে,'আচ্ছা, একবার না গেলে কি ক'রে হবে বলো? কী পার্ট তাঁরা দিতে চান, তোমার কোন্‌টে পছন্দ …এমনকি, বইটা কী তাও জানা নেই।'

'কিন্তু যাব কি ক'রে, সে আক্কেলটা আছে? কাকাকে কাকিমাকে চেন না?'

'যাবে তো আমার সঙ্গে।'

'তোমার সঙ্গে থিয়েটারের পার্ট ঠিক করতে যেতে ওঁদের আপত্তি না থাকে তো বলো গিয়ে; যাব।'

'তোমার যেতে আপত্তি আছে কিনা আগে বলো না; যা বলতে হবে আমি ঠিক করব।'

'কি বলবে শুনি?'

'একবার তোমায় শ্যামবাজারে নিয়ে যাচ্ছি; আজ বিকেলে আমি গিয়েছিলাম, তাঁরা বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছেন।'

'ডাহা মিথ্যে কথাটা বলবে গুরুজনদের? আমার হয়ে যখন বলছ তখন এক হিসেবে আমারও তো মিথ্যে কথা বলা হোল?'

'তুমি তো এক হিসেবে এক গুরুজনের কথায় অন্য গুরুজনকে বলছ; শাস্ত্র হিসেবে আমি আবার পরমগুরু।'

সুবালা হেসে ফেললে, তারপর ভারিক্কে হবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'উঃ, গুরুজন! বেশ, না হয় গেলাম। তারপর যখন তাঁদের কাছেই কোনদিন টের পাবেন যে যাইনি সেখানে।…ভেবে দেখেছ কি সেটুকু—পরমগুরু মহাশয়?'

'দেখেছি। হোস্টেলে কাজ সেরে শ্যামবাজারটা হ'য়ে আসব।'

'কী ধূর্ত বাবা!…বেশ, তাহলে আর একটু এগিয়ে ভাবতে হয়,—আজ একদিন গেলেই তো হবে না, মাঝে অন্তত দু'তিনবার তো যেতে হবে। রোজ তো শ্যামবাজার চলবে না।'

'একদিন কালীঘাট দর্শন করতে…'

অতিরিক্ত বিস্ময়ে সুবালা, মুখটা গোল ক'রে চোখদুটো বড় ক'রে চেয়ে

রইল খানিকক্ষণ, কথা কইবার মতো অবস্থা হলে বললে, 'ঠাকুরের নাম ক'রেও মিথ্যে কথা! হ্যাঁগা, তোমার পাপেরও ভয় নেই একটু?'

'পাপ বলেই তো ঠাকুরের নাম নিয়ে শুদ্ধ হওয়া, দেহমনে পাপ থাকলেই না গঙ্গাজলে বেশি ক'রে ডুব দিতে হয়।...আর একটা কথা একেবারে ভেবে দেখছ না,—এখন থেকে ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তির ভাব না দেখালে শেষরক্ষা হবে কোথা থেকে?—একদিন কালীঘাট, তারপর একদিন দক্ষিণেশ্বর, তারপর তো আসল দিনটিতে বলা যাবে রাত একটা পর্যন্ত কেবল সরস্বতী-ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছি ছ'জনে।'

সুবালা সেইরকম নির্বাক বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়েছিল, বললে, 'তারপরে?... ওরকম এক নাস্তিক হঠাৎ এত ধার্মিক হ'য়ে উঠল কি ক'রে?'

'সে-যশটা তো তোমার। মনে করবেন—দেখেছ!—কী বউই ঘরে এনেছি। অমন যে নাস্তিক তাকে পর্যন্ত শায়েস্তা করে নিয়ে আঁচল ধরিয়ে তীর্থে-তীর্থে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে!'

ছবিটুকুর মধ্যে কি ছিল, সুবালা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, তারই মধ্যে বললে, 'যা খুশি করো তোমার; আমার আর কি? কী ফিচলেমি বুদ্ধি বাবা পুরুষদের; ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার!'

হোস্টেলে ওরা সিঁথিতে সিঁদুর-পরা সুবালাকে এই নূতন পেয়ে, তার সঙ্গে আবার সিঁদুরের উপলক্ষ্যটিকেও পেয়ে একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠল; পাওয়াও কেমন, না, খানিকটা নিরাশার পরে। একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। নাটক ঠিক হয়েছে 'চন্দ্রগুপ্ত'। ওরা ওকে চন্দ্রগুপ্তের পার্টটাই দেওয়ালে জোর করে; বড় পার্ট, বাড়িতে নানা রকম অসুবিধে—এসব কোন আপত্তি টিকল না। শ্যামবাজার হয়ে একটু রাত ক'রে ফিরল দুজনে।

কিন্তু এত তোড়জোড় ক'রে দাঁড় করিয়ে শেষ পর্যন্ত বুঝি সব ভেস্তে যায়।

জানাজানির সম্ভাবনাটা বেশ সতর্কভাবেই বাঁচিয়ে এসেছিল লোকেন। দুপুরে যখন ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে, দাদা আফিসে, কাকা নিজের ঘরে গড়গড়ার শটকা-হাতে ঝিমোচ্ছেন, কাকিমা ওদিকে ছেলের ঘরে বৌয়ের কাছে চরিতামৃত শুনছেন—লোকেন কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বা অন্য কারুর সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে এসে সুবালাকে দিয়েছে ট্রেনিং। পাশের ঘরেই রেডিও খোলা,

তাতে সুবালার চাপা গলা একরকম পুরোপুরিই চাপা পড়েছে ; লোকেনের গলা যে তত পড়েনি, তাতে মোটেই ক্ষতি হয়নি। এ-বাড়িতে শুধু কাকাকে একটু এড়িয়ে যেতে পারলেই হোল। সেটা, কাকা যখন পূর্ণজাগ্রত তখনও খুব শক্ত নয়। আর দুপুরে যখন চোখের সঙ্গে কানও ঝিমোচ্ছে তখন তো খুবই সহজ।

দিব্যি চলে যাচ্ছিল ; দুদিন হেস্টেলেও রিহার্সেল দিয়ে এসেছে ; তার সঙ্গে ঠাকুর-দেবতার ওপর ভক্তিরও রিহার্সেল। তবে সুবালা ষোল আনাই ফাঁকি দিতে দেয়নি। কপালে সিঁদুরটুকু ওঠা পর্যন্ত ভয় বলে জিনিসটাও এসে জুটেছে ; টেনে নিয়ে গিয়েছিল স্বামীকে কালীঘাটে। মা-কালী যে আবার অন্তর্যামী ওদিকে, ফ্যাসাদ কম নয় তো! বেশ চলে যাচ্ছিল, তারপর এই কাণ্ড। এটা ঘটলও খানিকটা বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে। এবার তার জন্যে দায়ী সুবালা,—মা-জানকীর সময় থেকে মেয়েরা যে নিজের গণ্ডীর মধ্যে আর টিকে থাকতে পারে না। তারপর সুবালার আবার কপালগুণে এইরকম স্বামী হ'য়ে সঙ্গদোষও ঘটেছে।

পূজোর চারদিন আগের কথা। হোস্টেলে আজ ড্রেস-রিহার্সেল, সাজ-গোজ ক'রে পুরোপুরি বইটার মহলা দেবে আজ সবাই। সুবালার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে। কিন্তু অতটা সাহস হয় না। তারপর ভেবে ভেবে মাঝামাঝি একটা ঠিক করলে ; সেও মন্দ হয় না।

দৈনিক পূজোর যোগাড়যন্ত্র করছে, খুড়িমা বসতে যাবেন, বললে, 'আপনি অনেকদিন কালীঘাট যাননি খুড়িমা, আজ দুপুরে হ'য়ে আসুন না, বারটা অলো...'

শেষ না ক'রেই, 'এই যাঃ!'—বলে জিভ কাটলে।

খুড়িমা প্রশ্ন করলেন, 'কি হোল ?'

'কেন মরতে বললাম, মুখ দিয়ে খপ ক'রে বেরিয়েই গেল—নাম করলে আবার নাকি যেতেই হয়।'

'অন্যায়টা আর কি হয়েছে, মা ?...মার বোধ হয় দয়া হয়েছে তাই বের করিয়ে দিলেন তোমার মুখ দিয়ে। এমনি তো মুখ গুঁজে পড়ে আছি সংসারে, মনেও পড়ে না।'

দুপুরেই হোল ঠিক ; স্বামী সঙ্গে যাবেন, চোখও ভালো নয়, কানও ভালো নয়, সন্ধ্যে হতে না হতে ফিরে আসতে হবে।

সঙ্গে গেল বড়বৌ ; ভবানীপুরের চৌকোশ মেয়ে, সামলে-সুমলে নিয়ে যাবে। আর শাশুড়ী-শ্বশুর গেলে সে যাবেই, তার জন্যে মুখ ফসকে কিছু বলতেও হোলনা সুবালাকে। বেশ হোল ব্যবস্থা, কালীঘাট হয়ে বেয়াইবাড়ি, ঘণ্টা তিন-চারেকের জন্যে নিশ্চিন্দি।

তারপর বাড়িটি যখন একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ, লোকেন কলেজ থেকে ব্যবস্থা ক'রে এল, দুজনের পরামর্শ-মতোই। আজ সুবালারও ফুল-রিহার্সেল হবে ; বলবেও মুক্তকণ্ঠে, কোথায় কিরকম তুলতে হবে, কোথায় কিরকম নামাতে হবে, আওয়াজ চেপে এতদিন ঠিকমতো হচ্ছিল না, আজ ঠিক করে নিতে হবে ; আর দিন কোথায় ?

সুবালার আরও একটা মতলব ছিল। স্বামীকে বই হাতে বসিয়ে যখন মিনিট কয়েক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, লোকেন প্রথমটা থতমত খেয়েই গেল। বেনারসী শাড়িটা বেটাছেলের মতো মালকোঁচা মেরে পরা, গায়ে ওরই ম্যাচ-করা খাটো জামা, তার ওপর আড়াআড়িভাবে লোকেনের ফুলকাটা সিল্কের চাদরটা বাঁধা, কোমরের কাছে একটা গেরো দিয়ে একটি লাল কাগজ মোড়া তলওয়ারও ঝুলছে ; গলায় একছড়া নকল মুক্তার হার, মাথায় লোকেনেরই অন্য একটা চাদরের পাগড়ি।

ঢুকেই প্রথমটা একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, লোকেন বললে, 'ও, তোমারও ড্রেস-রিহার্সেল ? একেবারে সত্যিকার চন্দ্রগুপ্ত যে !'

'বাঃ, নৈলে ফিলিংস্ আসবে কেন ?'—বলে সোজা হয়েই দাঁড়াল সুবালা চন্দ্রগুপ্তের দৃপ্ত ভঙ্গীতে ; বললে, 'নাও, আরম্ভ করো।'

প্রথম প্রথম আওয়াজটা বিশেষ উঠল না, তারপর এগুতে এগুতে অল্প সময়ের মধ্যে জড়তা গেল কেটে। পার্ট কণ্ঠস্থ, তরতর ক'রে এগিয়ে চলল। লোকেন দেখিয়েও দিচ্ছে আবার কো-অ্যাকটারের পার্টও বলছে—কখনও সেলুকাস, কখনও ছায়া, কখনও হেলেন। একবার শেষ হ'তে দেখানো-শোনানো নিয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের ওপর লেগে গেল। সুবালা বললে—'দাঁড়াও একটু চা ক'রে নিই ; গলা কাঠ হ'য়ে গেছে ; বাবাঃ ! একি পোষায় ?'

বড় চমৎকার লাগছিল লোকেনের পূর্ণমুক্তির মধ্যে হুজনের এই চুরিকরা অবসরটুকু, ঠাট্টা করেই বললে, 'চা করাটাও তো মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের না পোষানোই উচিত।... তুমি বোস, আমিই না হয় ক'রে দিই।'

কৌতুকে সুবালারও মন ছলছল করছে, ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে একটু মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের দৃপ্ত ভঙ্গিতেই বললে, 'কে তুমি যুবক যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের চা তৈরি করবার স্পর্ধা মনে পোষণ কর!'

লোকেনের কি মতিচ্ছন্ন ধরল, একেবারে শেষের দিকের পার্টটুকুর কথা মনে পড়ে গেল, উত্তর করলে, 'স্পর্ধা নয় সম্রাট, আমি ছায়া, সম্রাটের আশ্রিতা ভগ্নী, সেবিকা; আছে বৈকি অধিকার আমার।'

সুবালা চকিত হ'য়ে ভালো ক'রে ঘুরে দাঁড়াল একটু, কৌতুকভরে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু না বলেই একটু যেন দুষ্টু হাসি ঠোঁটে ক'রে বেরিয়ে গেল।

তারপর যখন মাঝামাঝি গিয়ে চন্দ্রগুপ্ত আর ছায়া একত্র হয়েছে, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এইভাবে বেঁকে বসল,—ড্রেস-রিহার্সেলে একজনের পোশাক আছে, একজনের নেই, এতে ফিলিংস্ আসে না; ছায়ার মতো ভীল রমণীর পোশাক প'রে লোকেনকে প্রকৃসি দিতে হবে; নৈলে রইল পার্ট। ধ্বস্তাধ্বস্তি গেল খানিকটা, কিন্তু আজ সুবালারই দিন, টেঁকল না আপত্তি লোকেনের। ·দুখানা ছাপা শাড়ি, একটা স্পোর্টিং শার্ট আর মাথায় একটা রঙিন সিল্কের রুমালে যতটা ভীল রমণী সাজা যায় সেজে নিয়ে আবার পার্ট আরম্ভ করলে। মুখে দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, ফিলিংস্ আসবার মতো কতক কতক হোল চেহারাটুকু।

ভবানীপুরে বেহাই-বেহান তাঁদের মেয়েকে এক রাত্রের জন্যে আটকে রাখলেন; কাজেই গিন্নী আর বেশি দেরি না ক'রে একটি ছেলেকে সঙ্গে ক'রে কর্তাকে নিয়ে চলে এলেন। সংসারী মানুষের মন বাড়িতেই তো থাকে পড়ে। ছেলেটি তাদের পৌঁছেই গেল ফিরে।

গিন্নী উঠোনে পা দিয়েই ডাইনে মুখটা ঘুরিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'রেডিওটা খুলে রেখেছে?'

তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, 'ও! বৌমা যে আবার একলাটি রয়েছেন।'

হাতে ঠাকুরের ফুল, প্রসাদ—সেগুলো নিয়ে ওপরে ঠাকুরের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

কর্তা রসময়ের কানে না রেডিওর আওয়াজ গেল, না গিন্নীর মন্তব্য। ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন, নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'সাড়াশব্দ নেই, বৌমা বোধ হয় ঘুমুচ্ছেন, তুমিই এসে একটু তামাকটা সেজে দাও।'

গিন্নী ফুলের পুঁটুলিটুকু কপালে ঠেকিয়ে নিজের মনেই বললে—'রেডিওতে ঢাক পিটোচ্ছে ওদিকে, উনি সাড়াশব্দ পেলেন না!··· কানটুকু একটু সুদ্‌রে দাও মা, একেবারে গেছে ; আবার গিয়ে পূজো দিয়ে আসব।'

বাড়িটি বড়। মাঝখানে প্রশস্ত উঠোন, সেইটুকু পেরিয়ে কর্তা ঘরে এসে বিছানায় দেহটা একটু এলিয়ে দেবেন, হঠাৎ সোজা হয়ে কান খাড়া ক'রে বসলেন, রেডিওতে নাটক হচ্ছে না ?··· আজ হঠাৎ অসময়ে!

রেডিওর নাটকের জন্যে মাথাব্যথা থাকে না কর্তার, কিন্তু জিনিসটা যেন মনে হচ্ছে 'চন্দ্রগুপ্ত', সেকালের জিনিস, আর ওঁর সবচেয়ে প্রিয় নাটক। গলাটা বাড়িয়ে বাঁ কানটা পেতে দিলেন। 'চন্দ্রগুপ্ত'ই তো—তৃতীয় অঙ্কে, পঞ্চম দৃশ্য,—চন্দ্রগুপ্ত বলছে—'আমি লক্ষ্য করেছি ছায়া যে, তুমি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যখন কথা কইছ, তখন আমি এলেই তুমি তৎক্ষণাৎ চলে যাও। এত উদাসীন!'

হাসি ফুটে উঠল রসময়ের মুখে, নাটক হচ্ছে, না, ন্যাকামি ?—ঐ চন্দ্রগুপ্তের পার্ট বলা!

তবুও 'চন্দ্রগুপ্ত' বলেই কৌতূহলটা দমন করতে পারলেন না, উঠে যেতেই হোল। ততক্ষণে ছায়া বলছে, 'উদাসীন!··· মহারাজ! আপনি কখনও পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখেছেন ? দিগন্তবিস্তৃত বনানীর ওপর দিয়ে বিকম্পিত সূর্যরশ্মির ঢেউ খেলে যায় যখন,—দেখেছেন কি ?'

হাসিটা আর একটু বাড়ল রসময়ের—এই হচ্ছে ছায়ার পার্ট ? কেন যে এরা এসব বড় জিনিস ধরতে যায়!

কিন্তু পাশের ঘরের মধ্যে গিয়ে ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল, রেডিও কি ? কাছে কান দুটো নিয়ে গেলেন··· কৈ, না তো! রেডিও যে বন্ধ। তারপরেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল—ঐ অংশটুকুই আবার আওড়াচ্ছে।

তার মানে লোকেন পার্ট মুখস্থ করছে তার নিজের ঘরে। ক্লান্ত হয়ে

রয়েছেন, একটু গড়াতেই ইচ্ছে করছে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের পার্ট নিয়ে কেউ এত অনাচার করবে এও তো মুখ বুজে শোনা অসম্ভব। একটু দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অন্য একজনের গলা কানে গেল,—চন্দ্রগুপ্তের পার্ট বলছে।... তাহলে কো-অ্যাকটার নিয়ে রিহার্সেলই দিচ্ছে লোকেন!—দুজনে মিলে বইটাকে জবাই করছে!

আর সহ্য করতে পারলেন না রসময়। এই ঘরেরই লাগোয়া ঘর, দরজাটা খুলে, 'ও হচ্ছে না বাপু' বলেই ভেতরে একটা পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

মোটা চশমা, তার মধ্যে থেকে ঠাহর করতে সেকেণ্ড কয়েক দেরি হ'ল, তারপর লোকেনের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও! ড্রেস-রিহার্সেল দিচ্ছ বুঝি? তা ভালো, ফিলিংস্‌টা জমে, কিন্তু পার্ট যে তোমার মোটেই হচ্ছে না।... তোমার এ কো-অ্যাকটার ছোকরাটি কে? চিনলাম না তো··'

হঠাৎ বিপদে দুজনেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। লোকেনের গলা একেবারে গেছে কাঠ মেরে, কোন রকমে ঢোঁক গিলে, ঠোট ভিজিয়ে কুঁথিয়ে-কাঁথিয়ে বললে, 'আজ্ঞে, ও হচ্ছে·· ও হচ্ছে ওপাড়ার···আজ্ঞে ওপাড়ার ভাঁটু কাকার নাতি।'

রসময় 'ভাঁটু কাকার' নাতির দিকেই চেয়ে বললেন, 'আমাদের ভাঁটু ভায়ার? এত বড়টি হয়েছে! তা, কি কর তুমি?'

লোকেনই করলে উত্তর, 'আজ্ঞে·· কি যে বেশ · ভুলে যাচ্ছি·· পোর্ট কমিশনারে বেরুচ্ছে।'

'বেশ বেশ!···তা মুখ তোল না। থিয়েটারে রিহার্সেল দিচ্ছ তাতে লজ্জা কি ভাই? আমিও তো দাদুই।'

'আজ্ঞে ও আবার একটু বেশি লাজুক···তায় আপনার সামনে···আপনি চলে গেলে আবার···'

'তা আমি না হয় যাচ্ছি, কিন্তু অ্যাকটিং যে তোমাদের মোটেই হচ্ছে না। ঐ চন্দ্রগুপ্তের অ্যাকটিং, না ঐ ছায়ার?···ছায়া বলবে···'

রসময় ক্লান্তির কথা ভুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, খারাপ পার্ট যেমন সহ্য করতে পারেন না, তেমনি দেখিয়ে দেবার সময় সমস্ত ধমনীর মধ্যে দিয়ে একটি আনন্দের প্রবাহ খেলে যায় বয়সের গাম্ভীর্য ভুলিয়ে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা সামনে বাড়িয়ে বললেন, 'ছায়া এইরকম ক'রে

বলবে,—দিগন্তবিস্তৃত বনানীর ওপর দিয়ে বিকম্পিত সূর্যরশ্মির ঢেউ খেলে যায় যখন,—দেখেছেন কি ?'

—ঐ যে 'বিকম্পিত সূর্যরশ্মির ঢেউ খেলে যায়'—ওখানটায় গলাটাতে ট্রেমোলো ক'রে একটু ঢেউ খেলিয়ে দিতে হবে।'

তারপর সুবালার দিকে চাইলেন, 'আর তোমার ঐ চন্দ্রগুপ্তের ঐখানটা—এতো উদাসীন !···ঐ এত্তো কথাটার ওপর···'

হঠাৎ থেমে গেলেন। তারপর মাথাটা একটু এগিয়ে নিয়ে এসে একটু ভালো ক'রে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন—

'হ্যাঁরে লকু, চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছে, না, ফার্স ! তোরা একালে পার্ট নিয়ে যা করছিস, করছিস—এ আবার কী বিপরীত কাণ্ড ! চন্দ্রগুপ্ত ছায়ার পাশে দাঁড়ালে সে তার কাঁধ পর্যন্তও হবে না ! নাঃ, এটুকু কাণ্ডজ্ঞানও যদি তোদের না থাকে···'

গিন্নী ঘরে এসে দেখেন কর্তা নেই। 'কৈ গো ?'—বলে কলকেটা গড়গড়ার ওপর বসাচ্ছেন, কানে গেল—'দিগন্তবিস্তৃত বনানীর ওপর দিয়ে···'

দারুণ বিরক্তিতে মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠল—সেই চিবকেলে বোগ—থিয়েটার !

কলকেটা তাড়াতাড়ি বসিয়ে তিরস্কারটা মুখে করেই এগুলেন, 'বলি হ্যাঁগা ! এই পাঁচকোশ থেকে তেতেপুড়ে এসে···'

ঘর দুটো পেরিয়েই থমকে দাঁড়াতে হ'ল—'বউমা !!···একি কাণ্ড !!'

মোটা চশমার মধ্যে দিয়ে চেয়ে আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন রসময়—

'দিয়েছে তোমারও চোখে ধুলো ! বউমা নয়, আমাদের লোকেন—মেয়ে সেজে ড্রেস-রিহার্সেল দিচ্ছে—ছায়ার পার্ট···আর উটি যে দেখছ, ও হচ্ছে আমাদের ভাঁটু-মোক্তারের নাতি—চন্দ্রগুপ্ত সেজে···'

বাক্‌বোধই নিশ্চয় হয়ে গিয়েছিল গিন্নীর, কর্তার হাতটা ধরে টানতে টানতে ঘুরে বললেন, 'আচ্ছা, থাক্ তোমার ভাঁটু-মোক্তারের নাতি—তুমি এসো চলে···এস্‌সোনা—কী জ্বালা গা !—ওদিকে তামাক যাচ্ছে পুড়ে···'

শ্বশুর-মন্দিরম্

স্বামী-স্ত্রীতে একেবারেই বনিবনাও নেই। এর কথায় ওর গায়ে ফোস্কা পড়ে। এ যদি যায় পূবে, ও যাবে উত্তরেও নয় দক্ষিণেও নয়, একবারে সিধে পশ্চিমে। এর যা মিষ্টি ওর তা টক, এর জিভে যা ঠ্যাকে আলুনি, ও সেটাকে বলে নুনে বিষ। রাজযোটক একেবারে। লোকে আশ্বাস দেয়, 'এরকম থাকবে না, বয়েসকালে ঠিক হয়ে যাবে।'

বাপ-মায়েরা বলেন, 'তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।'

এখন স্বামীর বয়স পঁচিশ, স্ত্রীর আঠার পেরিয়ে এই কয়েক মাস হয়েছে।

স্বামীর নাম নারায়ণ, স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী; সম্বন্ধ করবার সময় কর্তারা ঐ মিলটুকুর ওপরই বেশি ভরসা করেছিলেন বোধ হয়।

আরও একটা ব্যাপার আছে যার জন্যে দুজনের বৈষম্যটা একটু জানা-জানির মধ্যে পড়ে গেছে,—সেটা হচ্ছে দুজনেরই বাড়ির চেয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে টান বেশি। এটা অবশ্য হয়ই, মেয়েদের মধ্যে বরং যত তাড়াতাড়ি হয় ততই বাহবা। বাপের বাড়ি তো দুদিনের অতিথ্‌শালা, ছেড়ে এসে যে-মেয়ে যত শীগ্‌গির নিজের ঘর-দোর বুঝে নিতে পারে সে তত সেয়ানা। লক্ষ্মীর বেলায় হয়েছে তাই। তবে, একটু যেন বাড়াবাড়ি; হোক অতিথ্‌শালা, তবু তো কাটাতে হয়েছিল দুটো দিন, বেরুতে হয়েছিল চোখের জল নিয়েই।

নারায়ণের টানের কথা লোকে অত ধরে না, শুধু এইটুকু যে শ্বশুরবাড়ির আসল মানুষটির সঙ্গেই যখন অত আড়াআড়ি তখন শুকনো বাড়িটা নিয়ে এত মাতামাতি কেন রে বাপু! তবে, নারায়ণের কথা কেউ অত ধরে না; পুরুষের খেয়াল, আরও পাঁচটা খেয়ালের মতো একদিন যাবেই কেটে। দুটো বাড়ির মধ্যে যেমন কথায় কথায় রেষারেষি তাতে নারায়ণও সম্বন্ধ খুইয়ে হাত ধুইয়ে বসে থাকেনা এটা ভালোই, তাতে দুটো বাড়ির যোগসূত্রটা একরকম করে বজায় থাকে। শুধু কুটুমই নয় তো, প্রতিবেশীও। যদি আগুন লাগে তো সম্বন্ধ ধরে দুটি বাড়িতেই আবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়তে কতক্ষণ? এখন ঘোঁট বলো, দলাদলি বলো—কিচ্ছু নেই গ্রামের মধ্যে।

প্রতিবেশীও এমন কিছু দূরপাল্লার নয়।

কাঠা কয়েক নিয়ে ছোট্ট একটি পুকুর, ডোবা বললেও চলে, তার তিনদিক থেকে তিনটি খিড়কির ঘাট নেমে এসেছে—এপারে লোকনাথ মুখুজ্জের বাড়ির, সোজাসুজি ওপারে অনাদি চাটুজ্জের, মাঝামাঝি রাজীব ঘোষের। সকাল-সন্ধ্যায় নাইতে, গা-ধুতে জমাট গল্প হয়। অবশ্য জমে বেশি দুপুরেই ; পাট-সাট সব সারা হয়ে গেছে, পুরুষেরা কাজে কিংবা বিছানায়, বাসন ক'খানা মেজে এখন বাকি সময়টা নিজেদের, তার খানিকটা কেটে গল্পে লাগাতে কোন বাধা থাকে না। ওপারে থাকেন বেশিরভাগ কাকিমাই, সঙ্গে হয়তো লক্ষ্মীর ছোট বোন শৈল ; এপারে থাকে লক্ষ্মী, তার ননদ কালীতারা ; গল্প চলে—

'শাশুড়ী কি রাঁধলে লো লক্ষ্মী ? ওমা, বাসনের যে বাড়াবাড়ি গো আজ, শাশুড়ী ভোজ করেছিল নাকি গো ? না, হবে ভোজ তারই আয়োজন ?—দেখিস বাছা যেন ফাঁকি না পড়ি।...তা শাশুড়ী করছে কি ?'

'ভোজ খেয়ে একটু আড় হয়েছেন।' উত্তরটা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে লক্ষ্মী।

'তা বাসনের ঘটা দেখে মনে হয় বটে আড় হবার মতনই ভোজ। আমরা ফাঁকি পড়লাম এই যা দুঃখু। তা বলব বেয়ানকে, ছাড়ব নাকি ? আজ আসব'খন বিকেলে।'

'শাশুড়ী বোধ হয় বলবেন কাকিমা, গরীবের ভোজ, বাসন দেখিয়েই যশ নেওয়া, তাতে বেয়ানদের মতন মর্যেদার মানুষকে কি ডাকতে ভরসা হয় ?'

দুলে দুলে বোক্‌নো মাজা চলছে, তারই মধ্যে ঘাড়টা ফিরিয়ে টেপা হাসি হেসে চাপা গলায় লক্ষ্মী ননদকে প্রশ্ন করে, 'ঠিক হ'ল না ঠাকুরঝি উত্তুরটা ?'

ননদ কালীতারা বলে, 'দেওয়াও হয়েছে ঠিক লোককে, জেঠাইমার চেয়ে এঁর যেমন বেশি ঠ্যাকার !'

ঠ্যাকারের মানুষ ওপার থেকে জবাব দেয়, 'তুই যে উল্‌টো বললি বাছা, ছেলের মার কাছে মেয়ের মা-খুড়ির আবার মর্যাদা ! একটা হাঁক দিলে কেতাত্ত হয়ে উঠোনের এককোণে ব'সে খেয়ে এঁটো তুলে নিয়ে আসব।'

এর উত্তর লক্ষ্মী আর নিজে দেয় না, ননদের মুখ দিয়ে দেওয়ায়, 'কেন কাকিমা, বাবা-মা যেমন মেয়ে নিয়েছেন তেমনি তাব জায়গায় তাঁদের

ছেলেও তো দিয়ে দিয়েছেন একেবারে দখল-স্বত্ব সব খুইয়ে। অমন ছেলে! …মর্যোদা বাড়ল কি কমল একবার হিসেব করে দেখুন না?'

নিজেই বলায়, তারপর টীকা করে উত্তরটাকে আরও জোরালো করে তোলে লক্ষ্মী, 'তোমার বড় মুখ হয়েছে, ঠাকুরঝি! সামলালেই পার নিজের গুণধর দাদাটিকে। আমার অমন ভাই হ'লে আমি খুঁটিতে বেঁধে রাখতাম।'

রাজীবের মেয়ে ক্ষান্ত ঘাট বেয়ে নেমে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়ে; হাতে থালা, তার ওপর একটা গেলাস, একটা বাটি, একপাশে চেবানো ল্যাউডাঁটার একটি ছোটখাট পাহাড়। ঠোঁটে কৌতুকের হাসি; লক্ষ্মী যেমন পুকুরের বাঁ দিকের হিসেবে বোন, তেমনি আবার ডান দিকের হিসেবে ভাজ, কথা পড়লে ঠাট্টা করতে বাধে না। বললে, 'ক্ষান্তমণি এয়েছেন গো ঠাকরুণ, একটু সমঝে-বুঝে কথা বোল; বলি, সাতপাকের বরকেই বড় বেঁধে রাখতে পারলে, তো ভাইকে!…কিন্তু কি থেকে উঠল কথাটা? আমার আবার সবটা শোনা হয়নি।'

কাকিমা মুখটা একটু ঘুরিয়ে চাপা ঠোঁটেই একটু হেসে নেন; হয়তো ঐ উত্তরটাই মনে হয়েছিল, কিন্তু ভাসুরঝিকে তো দেওয়া যায় না। তবে, কথাটা যে বেশ লাগসই হয়েছে সেটা জানিয়ে দেবার জন্যে কৃত্রিম রোষে শৈলর দিকে চেয়ে বললেন, 'আ-মর, হাসছিস যে! তুই গেলাস মাঝছিস মাজনা; ওদের ননদ-ভাজে কি কথা হচ্ছে ওঁকে কান পেতে শুনতে হবে!'

লক্ষ্মী ক্ষান্তকে দেয় উত্তর, 'এলেন! আন তো বউ ঘড়া, না, পেয়েছি কোঁদলের গোড়া!…কি সব কথা হচ্ছিল, ওঁকে খুঁটিয়ে বলো, উনি কোঁদলের খুঁট টেনে বের করুন!'

ক্ষান্ত নেমে এসে ডান হাতটা ঘুরিয়ে আঁচলটা কাঁধের ওপর ফেলে দেয়, বসতে বসতে বলে, 'ওমা, তা বের করব না? দু'বাড়ির মধ্যে আজ মাস দুই কোঁদল নেই, আমার ভাত হজম হচ্ছে না।'

লক্ষ্মী বলে, 'আর কাজ নেই বেশি হজম হয়ে, তোমার হজমের জ্বালায় লোকের জুটছে না এদিকে!'

একটু হাসি ওঠে, ক্ষান্তও যোগ দেয়; অনুযোগ করে—'শুনলে কাকিমা, ঘুরিয়ে রাক্কুসী বলাটা?…বেশ, এবার কোঁদলে আমি কাকিমাদের দিকেই, ভাজের তো ভারী ভরসা!…দলে ভারী হয়ে এবার থুড়ব তোমায় আচ্ছা করে।'

থালার ওপর ঘটির ঘা দিতে দিতে খোড়ার ভঙ্গিতে সবাই ওঠে হেসে, তারই মধ্যে কাকিমা বলেন, 'রক্ষে করো মা, আর কোঁদলের প্রার্থনায় কাজ নেই, এমনিই বড় কসুর! কী লগ্নেই যে কুটুম্বিতে হয়েছে, একদিন ভাব তো পাঁচদিন আড়ি। ভাগ্যিস ছেলেটা দিনান্তে একবার করে 'মা-কাকিমা' ব'লে এসে ঢোকে বাড়িতে, নৈলে তো ভুলেই বসে থাকতে হ'ত যে, হাত দেড়েক তফাতেই কুটুম করেছি। তাও কি কারুর পছন্দ?—বেয়াই-বেয়ানের কথা তোলা থাক, লক্ষ্মীটা পর্যন্ত চায় না যে জামাই একবারটি করে এ-বাড়িতে…'

'ওমা, আমি তো আরও চাইব না, একেবারেই!'—বোক্‌নো মাজা থামিয়ে ঘুরে চায় লক্ষ্মী, ক্ষান্তমণিকে সাক্ষী রেখে বলে, 'তুই-ই বল ক্ষান্ত, চাইতে পারি কখনও?—ভুলেও কখন মা-কাকির মুখে লক্ষ্মীর নাম নিয়ে একটা সুখ্যেতি শুনেছিস?—খালি জামাই—জামাই—জামাই! জামাই আমার এত ভালো, জামাই আমার তত ভালো!…'

হাত দুটো একটু তুলে এমন ভাবে একটু দুলে ওঠে যে আবার একটু হাসি পড়ে যায়। তারই ঝোঁকে সবার বাসন মাজায় আবার জোর পড়ে, কাকিমা বলেন, 'শুনে রাখিস ক্ষান্ত! নকল করার ঢংটা দেখে রাখিস!'

ক্ষান্ত বলে, 'আমি তোমার হয়ে বলছি, কাকিমা। বলি, কত সুখ্যেতি খাবে আর?—শাশুড়ীর অত সুখ্যেতির ওপর যদি মা-খুড়িতেও আবার চাপায় তো বদহজম হয়ে যাবে যে…'

'একে তো আদর-সুখ্যেতির বদহজমে নেতিয়েই আছ।'

একটা তুমুল হাসি ওঠে, জলস্থল উচ্চকিত করেই। তার কারণ আছে, শেষের এই টিপ্পনীটুকু বেরোয় শৈলর মুখ দিয়ে। বছর দশেকের মেয়ে, কিন্তু শুনে-শুনে, বলে-বলে কথার দিব্যি ধার হয়েছে, তালের মাথায় এক একটা কথা আবার এমনি মোক্ষম হয়েই বেরোয়।

বললেও দিদির হাতনাড়ার বেশ নকল করেই; ছেলেমানুষ, তার অঙ্গ-সঞ্চালনে অত কুণ্ঠাও জাগেনি এখনও।

হাসি চলে গড়িয়ে। কাকিমা বলেন, 'কথা শোন', ঢং দেখো ঐটুকু মেয়ের!'

ক্ষান্ত বলে, 'ঐরকম না হলে তো ঠাণ্ডাও হবেনা মেয়ে তোমাদের, কাকিমা; ও যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!'

লক্ষ্মী শৈলকে উদ্দেশ করে বলে, 'তোমায় হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতব আমি পোড়ারমুখী, আসতে দাও একবার বাড়িতে…'

শৈল বলে, 'এসোনা, তাই তো চাই।…জামাইবাবু আছেন—সাক্ষাৎ যম!'

হাসির ঢেউয়ের ওপর ঢেউ পড়ে আছড়ে। গিন্নিদেরও টনক নড়ে। 'কিসের এত হাসি গো?…আজ বড্ড হাসির ধুম যে!' বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন—একজন হোক, দুজন হোক, তিন বাড়ির তিনজনই হোক। ঘাটের মধ্যাহ্ন মজলিস ওঠে গুলজার হয়ে। গুল-দোক্তার আদান প্রদান চলে—'শৈল, উঠে আয় তো মা, বেয়ানকে আমার নতুন দোক্তা খাওয়া একটু। মুখ বন্ধ করে দিই।'

'নিয়ে আয় শৈল, একটু শান দিয়ে নিই জিভে।'

এ হ'ল যখন ভাব চলেছে দু'বাড়ির মধ্যে।

অবশ্য, কলহ বলতে দেওয়ানিও নয়, ফৌজদারিও নয়, এমনকি গলাবাজিরও কিছু থাকে না তার মধ্যে। বেশ চলছে, বেশ চলছে, হঠাৎ দু'বাড়ির মধ্যে যাওয়া-আসা কথাবার্তা সব বন্ধ হয়ে গেল। পুকুরঘাটও নিস্তব্ধ, যার গা ধোবার গা ধুয়ে উঠে এল, যার বাসন মাজবার বাসন মেজে দোর বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে সেঁদুল, আর ঝনাৎ করে বন্ধ করবার মধ্যে দিয়ে একটু জানিয়ে দিলে—কেউ কারুর তোয়াক্কা রাখে না। কর্তারা দুজনে একটু নিরীহ প্রকৃতির, হয়তো মন থেকে চান না, কিন্তু গিন্নীদের ব্যবস্থা বলে না-মেনে নিয়ে উপায়ও থাকে না।

ব্যতিক্রম হয়ে থাকে শুধু নারান। তার যাওয়া-আসাটা যায় বেড়ে, বরং বলা যায় যাওয়াটা যায় বেড়ে, আসাটা যায় কমে। ছেলেটা কথা কয় বড় কম, তবে ঘা দিতে জানে ভালো করেই। সে যে শ্বশুরবাড়িতেই রয়েছে,—শালীকে গান শেখাবার ছুতো করে সেটা জোর গলাতেই জানিয়ে দিতে থাকে যখন তখন, অবশ্য বাবা যখন বাড়ি থাকেন না। লক্ষ্মীর সারা অঙ্গ জ্বলে খাক হতে থাকে। বাড়িতে এসে খাবার চাইলে বলে, 'ঠাকুরঝি, জিগ্যেস করো না, অমন জোর চাকরি বাজানোর পরও মনিবরা একমুঠো খেতে দিলে না!'

নারান উত্তর দেয়, 'কালী, জিগ্যেস কর—আর, আমি যার মনিব সে কি বসে খাবে?'

এর আবার কথা বলার সঙ্গে একটু হাসা রোগ আছে। লক্ষ্মী চাপা ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'ইস! মনিব!...বাবা-মা না থাকলে আমি যেতাম ঠেলতে হাঁড়ি!...ভালো করে!'

'চাকরিও থাকত তাহলে...ভালো করেই!'

গুরুজনদের কেউ যদি এসে পড়ল তো কথা-কাটাকাটিতে বাধা পড়ে, নয়তো যায় বেড়েই। দুজনের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত দু'বাড়ির ঝগড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়।

পৌষের তত্ত্বের সব জিনিস নাকি এসে গেছে, আজই বিকেলে পাঠানো হবে; কালীতারা এসে খবরটা দিলে।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সারার পর লক্ষ্মী বললে, 'ঠাকুরঝি, দেখো তো তোমার গুণধর দাদাটি ও-বাড়িতে জমিয়ে বসেছেন কিনা? একবার মনে করছি যাব আজ।'

কালীতারা এসে খবর দিলে নারান নেই।

'তাহলে দেখছি হায়া আছে শরীরে একটু। আমি মনে করলাম হয়তো হ্যাংলার মতন তত্ত্বের জিনিসগুলো আগলে বসে আছেন।'

গিয়ে খানিকটা এদিক-ওদিক করে কাটালে লক্ষ্মী, কিছু গল্পসল্প করলে, ওঠার সময় মা বললেন, 'একেবারে কুটুম হয়ে গেছিস, বাছা...ওবাড়ি কখন যাবে লোকে তবে তোর মুখখানি দেখতে পাবে। হ্যাঁ, তাও বুঝতাম যে দশখানা গ্রাম পেরিয়ে দিয়েছি, একটা কথা ছিল...ওবাড়ির চৌকাঠ ডিঙোলে এ বাড়ির চৌকাঠে পা পড়ে।'

জবাব দিতেও জানে লক্ষ্মী মানানসই করে, 'দূরে দাওনি মা, কিন্তু ঘর বেছেও তো দাওনি। চৌকাঠ ডিঙুতে দিচ্ছেই বা কে, আর ডিঙুই-ই বা কখন?—শুধু কাজ, কাজ, আর কাজ...দাসী বলে আমি পদে আছি।'

কাকি বললেন, 'লক্ষ্মীর মুখেও শ্বশুরবাড়ির নিন্দে!'

'তবেই বোঝ, কাকিমা—কী শ্বশুরবাড়ি করে দিয়েছ!'

মা হেসে বললেন, 'বাপের বাড়িরও করবে নিন্দে আজ, তাইতেই দোষটা কেটে যাবে'খন।...আজ পোষের তত্ত্বটা পাঠাচ্ছি লো, একবার দেখ না। না বাছা, দোষের কিছু থাকে তো এইখানেই বলে দে, এখনও সুদ্রে নেবার আছে।'

সেইজন্যেই তো আসা, শুধু অন্য ঘরের মানুষ হবার পর থেকে সেরকম গায়ে পড়ে কিছু জিগ্যেস করবার ক্ষমতাটা হারিয়েছে লক্ষ্মী, বললে, 'ওমা! আজই পাঠাচ্ছ নাকি? দেখো, কেমন গন্ধ পেয়ে ঠিক এসে গেছে মেয়ে তোমাদের!'

ঘরের মধ্যে থরে থরে সাজানো রয়েছে সব; থালে, চ্যাঙারিতে, গামলায় খঞ্চেপোষে-ঢাকা; কাকিমা খুলে খুলে দেখাতে লাগলেন। খাসা তত্ত্ব, বাপের-বাড়ির এদিক দিয়ে নাম আছে, তায় আবার এই তৃতীয় পৌষ-তত্ত্ব, আজকাল তো একটার পরই বন্ধ করে দিচ্ছে সবাই।

বাপ-মায়ের পছন্দ নিয়ে ভেতর থেকে একটি তৃপ্ত গরবের হাসি ঠেলে বেরিয়ে আসছিল লক্ষ্মীর, প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে মুখ খুলতে যাবে, এমন সময় 'কাকিমা!' বলে একটা ডাক দিয়ে নারান সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বাড়ির ছেলের মতোই গটগট করে পাশের ঘরে এসে ঢুকল।

দুটো ঘরের মধ্যে একটা দরজা, ঘোমটা টানবার আগে একবার চোখো-চোখি হয়ে গেল; মুখটা যে অন্ধকার হয়ে গেল সেটা ঢাকবার জন্যে আরও একটু টেনে দিলে ঘোমটাটা লক্ষ্মী।

তবে কথার আওয়াজের ওপর বেশি পর্দা টানা দরকার মনে করলে না, অথবা পারলেই না টানতে; ওঘর পর্যন্ত বেশ স্পষ্টভাবেই পৌঁছায় এইভাবে চাপা গলাতেই বললে, 'মন্দ হয়নি, মা; আলোয়ান জামা সে তোমাদের জামাইয়ের; ভালো হলেও খুশী, মন্দ হলেও খুশী, আবার একেবারে না হলে বরং বেশি খুশী, তবে...'

কাকিমা বললেন, 'কি "তবে" বল্ না, থামলি কেন?'

'তবে তোমাদের বেয়ান হয়তো বলবেন,—ক্ষীর আজকাল অচল হয়ে আসছে, তার জায়গায় রাবড়িটা থাকলেই হত; দইয়ের তিজেলটাও ছোট; আর এ-কথাও হয়তো বলবেন—অমন দোফলা কাঁঠাল, বেয়াই-বেয়ান কি একলাই খাবেন?'

মা অতটা নয়, জানেই তো মেয়েকে, কারণটাও তো বুঝেছে হঠাৎ মুখের ভাব কেন গেল বদলে; কিন্তু কাকিমা তেতে উঠছিলেন, প্রশ্ন করলেন, 'আরও কিছু আছে খুঁৎ?'

লক্ষ্মী বললে, 'অবিশ্যি এগুলো ওঁদের মনের কথা, আন্দাজেই বলছি;

তবে মাছটা তোমাদের মেয়ের চোখেও কেমন কেমন ঠেকছে বাপু; কি হবে ঐ সের দেড়েকের একটা মাছে?—পাড়ায় দিতে-থুতে তো হবে, এক টুকরো করেও কুলোবে না।'

কাকিমা বললেন, 'ওটা পাকা চার সের তিন ছটাক।'

'তা হবে তাহলে।...আমি এখন আসি, মা...কাকিমা, আসি; ছেলেটা বোধহয় উঠেছে। বল তো লক্ষ্মী আসেনা কেন, জো আছে একটু নড়বার?' উঠোনেই তার কানে গেল, কাকিমা বলছেন—'না, না, একেবারেই তত্ত্ব যাবে না...আমি তাহলে হুলুস্থুল কাণ্ড করব...লক্ষ্মী কিনা তেজ ক'রে...'

কথাগুলো বেশ সাজিয়ে-গুজিয়ে শাশুড়ীর কাছে এসে বললে লক্ষ্মী, 'কি করব মা?—বাপেরবাড়ি-ই, তবু না বলে পারলাম না, এ-বাড়িরও তো একটা মান আছে?'

শাশুড়ী বললেন,—'ছুটো তুশ্চু কথা, তাও পর নয়, নিজের পেটের মেয়েই বলেছে, তাই বলে তত্ত্ব বন্ধ করে এতবড় অপমানটা করবেন বেয়ানেরা!... তাহলে সব কিছুই থাক্ বন্ধ।...আমিও ছেলের মা বাছা!'

যাওয়া-আসা, কথাবার্তা সব বন্ধ হয়ে গেল; দরজা বন্ধ হতে লাগল বেশ জানান দিয়েই,—কেউ কারুর তোয়াক্কা রাখে না।

এবার কিন্তু বেশিদিন বন্ধ রইল না। দিন চারেক পরে বিকালবেলায় সাতজন মেয়ে-পুরুষের মাথায় নারানের শ্বশুরবাড়ির তত্ত্ব এসে হাজির হ'ল। শাশুড়ী বললেন, 'ওমা, কী দয়া বেয়ানদের আমার! যেমন চারদিন উপোস করালেন, তেমনি দিয়েছেনও ঢেলে!'

সাতজনের লীডার হয়ে এসেছে অর্জুন বাঘের মা বাতাসী, বললে; 'ওমা, সে কি! দয়াধম্মো সে তো তোমাদেরই গো,—নারানের মতো অমন জামাই দিয়েছ! এ-তো নিজের পুণ্যিই নিজের ভোগে এল তোমাদের।'

বাতাসীর কথার অক্ষরে অক্ষরে থাকে মানে, সবাইকে একটু ভাবিয়ে তুললে; তারপর কথাটা গিয়ে পরিষ্কার হ'ল পরের দিন সকালে—

শ্বশুর খেতে বসেছেন, লক্ষ্মী পাশটিতে বসে হাওয়া করছে।

বারো সেরের কাতলা, তার মুড়োটাই সের তিনেকের, একখানি বড় রেকাবির সমস্তটুকু জুড়ে সদ্গতির অপেক্ষা করছে।

শ্বশুর তুলে নিয়ে বললেন, 'বাঃ, বেয়াই পাঠিয়েছেন বুঝি? পোষের তত্ত্ব?'

কথা কখন ওঠে, মুখিয়ে বসে ছিল লক্ষ্মী, একটু ঠোঁট কুঁচকে বললে, 'তত্ত্বেরই মাছ, তবে বাবা কেন পাঠাতে যাবেন?—ব্যবস্থা করে পাঠাবার অমন লোক রয়েছে যখন···'

'কে?'

'আর কে, বাবা?'

'নারান?'

বধূ চুপ করে রইল।

শ্বশুর খানিকটা ভেঙে নিয়ে খেতে খেতে বললেন, 'বড় স্বাদওলা মাছ, মা। তা যেই ব্যবস্থা করুক—শ্বশুরের পয়সাতেই কবেছে তো? আমার খেয়েই সুখ।'

'বয়ে গেছে শ্বশুরের পয়সায় কিনতে।'

'তবে?'

'আমাদের চালদা-পুকুরের সেই বড় জীয়ানো কাতলা-জোড়াটার একটা, ক'বাব ধ'রে ধ'রে যে, ছুটোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরশু জেলে নামিয়ে শেষ রাত্রিরে ধরিয়েছে।'

'কে, নারান?'

'আর কে, বাবা? অত দরদ কার?'

ছেলেয়-বৌয়ে ঝগড়া, প্রবীণের দৃষ্টিতে একটা খেলাই, নিজেদের ঘাড়ে যেটুকু এসে পড়ে, প্রসন্ন মনেই নিতে হয়; এবকম তো থাকবে না চিরকাল।··· মুড়োর চাকলাটি ভেঙেছেন বড় করেই, তারই আড়ালে বড় বড় গোঁফের জঙ্গলে হাসিটা কোনরকমে চেপে রাখলেন শ্বশুর। তারপর আবার, 'বাঃ, এই যে এঁচোড়ও পাঠিয়েছেন বেয়ান, ওঁদের সেই দোফলা গাছের বুঝি?'

'কেন বাবা, নিজেদের গাছ থাকতে শ্বশুরের লোকসান করায় কেউ? আর আপনার বেয়ানের কথা বলছেন?—তিনি বোধহয় জানেনও না; অমন জামাই ঘরে, তাঁর অত ভাববার দরকার?'

খাওয়া চলতে লাগল। শ্বশুর যেন কী! এততেও রাগ নেই পুরুষের; অন্য কেউ হ'লে থালা ছেড়ে উঠে পড়ত, সন্ধির মুখেই কেমন হয়ে যেত বিচ্ছেদ। ···লক্ষ্মীর ভেতরটা যেন জ্বলে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে, হাতের পাখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে থেমে।

শেষ পাতে এল রাবড়ি।

'বাঃ, এবার ক্ষীরের বদলে রাবড়ির ব্যবস্থা করেছেন বেয়াই!'

যেন কী! শুনেও কথা কানে তোলেন না। লক্ষ্মী বেশ একটু অসহিষ্ণু-ভাবেই বললে, 'আপনার বেয়াইয়ের কী মাথাব্যথা পড়েছে, বাবা?'

'এও নারান?···তা···তা রাবড়িটা কিন্তু হয়েছে চমৎকার, মা।'

কাল রাত্রে কৌশল ক'রে স্বামীর সঙ্গে ভাব করে যে-সব কথা বের করেছিল লক্ষ্মী, সবই দিলে ফাঁস করে—

'চমৎকার হবেনা কেন, বাবা? আপনার ছুটো গাইয়ে সাত সের করে দুধ দিচ্ছে আজকাল, তা আজ ছুদিনের সমস্ত দুধটুকু গোয়াল থেকে সোজা গেছে ময়রাবাড়ি, ছেলেমেয়ে ছুটোর জন্যেও একফোঁটা জোটেনি; বাছুরকে দিয়ে খাইয়ে দিয়েছে মনে করে রাখাল ছোঁড়াটার আর কিছু বাকি রাখা হয়নি।···এ রাবড়ি যদি মিষ্টি না হয়, তো কোন্ রাবড়ি হবে, বাবা?'

এততেও ফল হয় না দেখে ছেলের গুণ আরও স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যান করে দিলে লক্ষ্মী, 'সাজ্জন্মে এমন শ্বশুরবাড়ির ওপর টান দেখিনি বাবাঃ, ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না!'

রাবড়ির বাটিটা আর মুখ থেকে নামাতে পারছেন না শ্বশুর, শুধু গোঁফের ভেতর আর কতখানি হাসি লুকিয়ে রাখা যায়?

'হ্যাঁ মা, আর তুমি যে শ্বশুরবাড়ির মান বাঁচাতে বাপেববাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে এলে সেদিন!'

অবশ্য, মুখ ফুটে বললেন না। ছেলে নিয়ে বেয়াই-বেয়ানের কাছে অতবড় পরাজয়ের সামনে, বধূ নিয়ে এই বিজয়টুকুই তো যা সান্ত্বনা!

ডম্ফার ভয়ে

ডম্ফা একরকম বাদ্য। ধ্বনিগৌরবে জয়ঢাকের সমগোত্র, যদিও গতর ঢের কম। একটা ইঞ্চি তিনেক চওড়া কাঠের চাকায় চামড়াটা আটকানো থাকে; যখন চাঁটি পড়ে, পাঁচশ গজ দূরেও টেঁকা দায় হইয়া ওঠে। পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা হোলির সময় এটাকে একেবারে নিজের কানের কাছে তুলিয়া গানের সঙ্গে বাজায়, আওয়াজটাকে আরও খোলতাই করিবার জন্য কোন কোন ডম্ফায় খঞ্জাল বা ঝাঁঝর বসাইয়াও লয়। ...অল্পে সুখং নাস্তি।

হোলির দিন। কোন কোন গাড়িতে সঙ্গীত চলিতেছে, তবে আমাদের ইন্টার ক্লাসের কক্ষটায় কোন উপদ্রব নাই। হোলির জন্যই ভিড়টাও কম, শিমুলতলা স্টেশনে একটি ছোটখাটো দল উঠিল বটে, মুখে-হাতে জামা-কাপড়ে, এমনকি কমবেশ করিয়া চোখেও সবার রঙের ছোপ; কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর যাত্রী, নির্ঝঞ্ঝাটেই এক একটা জায়গা দখল করিয়া কিউল পর্যন্ত আসিল, তাহাব পর সাবধানে পা ফেলিয়া নামিয়া গেল।

এদিকে ছুটি বেঞ্চে আমরা পাঁচ-ছয়জন শুধু বাঙালী ছিলাম। সামনের বেঞ্চটিতে আছেন তিনজন, তাঁহাদের মধ্যে মাঝের ভদ্রলোকটির মাথায় একটু ছিট আছে বলিয়া মনে হইল। আসানসোলে উঠিয়াই আগে আমাদের চারজনের নামধাম গন্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজেরও নাম বলিলেন রাজীবলোচন মল্লিক, তাহার পর সেই যে বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন, না নিজের বিরাম আছে, না শ্রোতাদের। বিষয়বস্তু লইয়া কোন তারতম্য নাই, যাহাই চোখের সামনে দেখেন, বা যে-কোন প্রসঙ্গই ওঠে প্রত্যেকটির বিষয়ে তাঁহার পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব একটি অভিমত আছে। এক একটা বিষয়ে সত্যই কিছু কিছু জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এক একটাতে খানিকটা গভীরতা পর্যন্ত, তাই মনে হয় ডাহা পাগল নয়, তবে নিজে না হইলেও আর সবাইকে করিয়া তুলিবার ক্ষমতা রাখেন।

আমার বেঞ্চটিতে আমরা দুজন আছি। একজন কোণটি আশ্রয় করিয়া গল্প হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একখানি দৈনিক কাগজের পিছনে

আত্মগোপন করিয়াছেন, যখন নিতান্তই অসহ্য হইতেছে, মুখটা তুলিয়া ঠোঁট দুইটা নাকের নিচে চাপিয়া ধরিতেছেন। আমি বহু অভিজ্ঞতার ফলে এরকম অবস্থায় নীরবে শুনিয়া যাইবার একটি বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছি, তবে পাশের দুইজন যাত্রীর সঙ্গে ভদ্রলোকের মাঝে মাঝে খিটিমিটি হইয়া যাইতেছে। ওঁর ডানদিকের লোকটিরও একটু গল্প করিবার বাতিক আছে, কিন্তু আসর খালি না পাওয়ায় অপ্রসন্নভাবে বসিয়া আছেন, যখন বোধহয় নিতান্তই পেট ফুলিয়া উঠিতেছে, চেষ্টা করিতেছেন, ফলে কথা-কাটাকাটি হইতেছে। ওঁর অপর পাশের ভদ্রলোকটি ক্ষীণজীবী গোছের, তাহার উপর দাঁতে ব্যথা উঠিয়া এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে নামটাও ভালো করিয়া বলিলেন না, 'নাম হচ্ছে বটেশ্বর'—বলিয়া ক্লান্তভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন। বাঁ হাতে বাঁদিকের চোয়াল আর কানের খানিকটা চাপিয়া চুপ করিয়াই বসিয়া আছেন। যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিলে নিজের মনেই কাতরাইতেছেন, দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছেন। এক একবার কিন্তু গল্পের জন্য ধৈর্যও হারাইয়া ফেলিতেছেন, খানিকটা করিয়া বচসা হইয়া যাইতেছে।—

'থামুনই না দয়া করে, যেন কাকে বলছি! বকর—বকব—বকর··· দেখছেন একটা মানুষ দাঁতের যন্ত্রণায়···উঃ, ইস—স্—স্!'

'আপনাকে বললাম বাবলার ছাল সেদ্ধ করে কুলকুচু করতে···'

'বাড়ি গিয়ে তবে তো মশাই? বাবলাব তলায় তো বসে নেই···ইস্-স্-স্, ই-হি-হি-হি···'

'চটেই রয়েছেন! ভালোর দুনিয়া নয় তো, বললাম একটা টোটকার কথা—নিজের পরীক্ষিত···'

'আগে আমায়ও পরীক্ষা করতে দিন—বাড়ি গিয়ে···'

'তা না হলে বিশ্বাস হবে না?'

'দেখো জ্বালা! আরে মশাই, কথা শুনেই ব্যথা মরে যাবে?···উ-হু-হু—মাগো!'

'বেশ, কথা শুনেই ব্যথা না কমে তো, কথা শুনে বাড়বেই বা কেন, মশাই? —সেটা বলুন।'

'বকুন, যতো পারেন। ভগবান এক এক জনকে আকালকেঁড়ে দমও দেন তো!'

ভদ্রলোক সাময়িকভাবে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, আমায় সাক্ষী মানিয়া বলিলেন, 'দেখলেন তো? কারুর ভালো করতে ইচ্ছা করে এতে?'

বলিলাম, 'একটু না হয় চুপই করি আমরা, বেদনাটা বোধহয় চাগিয়েছে; একে গাড়ির আওয়াজটা লেগেই আছে—'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, যেন গল্পের জন্য যে দমটুক আহরণ করিয়াছিলেন, অপ্রয়োজনবোধে সেটাকে খালাস করিয়া দিলেন; তাহার পর চুপ করিয়াই রহিলেন।

মিনিটখানেকও গেল না, ডান দিকের ভদ্রলোকটি বারদুয়েক অল্প অল্প গলাখাঁকারি দিয়া আরম্ভ করিলেন, 'তখন সেই যে বলছিলাম, খুব একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল গ্রামের মধ্যে—খোঁজ, খোঁজ, বের কর্ কোথায় গেল বেটা সন্ন্যাসী—দেখা গেল গ্রামের বাইরে সদর রাস্তার ধারেই একটা বেলগাছের তলায় চিমটেটি পুঁতে বসে আছেন—সবার একটু ধাঁধা লেগে গেল—এই গ্রামের ভেতরেই অমন একটা কাণ্ড করেছে, কোথায় গাঢাকা দিয়ে বেড়াবে, না একেবারে সদর রাস্তা আগলে গ্যাঁট হয়ে ধুনি জ্বেলে বসেছে! শেষে দুটো চ্যাংড়া ছোঁড়া এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলে, 'সে সোনার তালটা কোথায়?—পেতল-কাঁসা সোনা করে দেবে বলে যেটা যজ্ঞি করে শোধন করবার জন্যে নিয়েছিলে'...সাধুবাবা মুখে কিছু না বলে ধুনি থেকে তিনটি আঙুলে করে...'

'কি মশাই, আর এটা বুঝি দাঁত কনকনানির ওষুধ?'

বাধা দিলেন রাজীবলোচনই, বক্তার দিকে চাহিয়া নয়, দন্তশূলগ্রস্ত বটেশ্বরবাবুর দিকেও নয়, আমার পানে ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া। আমরা আপত্তি করি কিনা এতক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিলেন, সমস্ত গল্পটাই নির্বিবাদে শেষ হয় দেখিয়া আর ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না।

বলিলাম, 'কি করে বলুন লোকে? অনুরোধ করা সত্ত্বেও উনি যখন থামবেন না...'

গাড়ি ছাড়িয়া কিউলের পুলের ওপর আসিয়াছে, শব্দ হইতেছে, সেইটা ধরিয়া বলিলাম—'অবশ্য এটুকুতে ক্ষতি হয়নি, কেননা পুলের আওয়াজই সব চাপা দিয়ে দিয়েছে।'

বটেশ্বরও ক্ষীণকণ্ঠে কতটা আক্রোশের সঙ্গে বলিলেন, 'আর পুলের

আওয়াজটা হ'ল দৈব, উপায় নেই; মানুষ জেনেশুনে শত্রুতা—উ-হু-হু-হু, মলুম!'

লক্ষ্মীসরাইয়ে থামিবে গাড়িটা, পুল পার হইয়া গতিবেগ কমিয়া আসিয়াছে, রাজীবলোচন হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রশ্ন করিলাম, 'উঠলেন যে?'

আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। গাড়িটা থামিতে সতরঞ্জি-জড়ানো ছোট্ট বিছানাটা তুলিয়া লইলেন, নিজের মনেই বকিতে বকিতে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন, 'তুই বেটা কথা কইলেই সেটা হ'ল বকর-বকর; দম বন্ধ করে বসে থাক্‌, আর সবাই গ্যাঙাক, না হয় ঢাক পিটুক—বসে বসে শোন্‌··· "উঠলেন যে!" 'না, কাজ কি উঠে?'

একটা কড়া হেঁচকায় দরজাটা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

গাড়ি ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোকটি আবার আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, 'আমি সেই যে সাধুবাবার কথা বলছিলাম···'

কোণের ভদ্রলোক খবরের কাগজের ওপর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আর আপনি নামবেন কোথায়?'

একটা কি হইল, এর পর লোকটি আর মুখ খুলিলেন না, কোথায় নামিবেন সেটুকুও বলিবার জন্য নয়, ওঁর দিকে একটু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বেশ বোঝা গেল এবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ভাবা গেল বিপদটা তবে বুঝি কাটিল শেষ পর্যন্ত, এমন সময় ডম্ফা আসিয়া উপস্থিত হইল—সপরিবারে এবং সবান্ধবে—তুইটি ডম্ফা, তুই জোড়া ডবল সাইজের খঞ্জনি, এক জোড়া কাঠের করতাল।

২

লক্ষ্মীসরাই হইতে কয়েকগজ গিয়া গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষিয়া থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা কোলাহল: 'আগ লাগা হ্যায়!'

গলা বাড়াইয়া দেখি সামনের দিকে, দুখানা গাড়ি পরেই কে চেন টানিয়া দিয়াছে, পাখাটা বাহির হইয়া আসিয়াছে। নিশ্চয় হট্‌ অ্যাক্‌সেলের ব্যাপার। লোকগুলো তাড়াতাড়ি পৌটলা-পুঁটলি লইয়া নামিয়া পড়িল। গার্ড আসিল,

ইঞ্জিনের লোকেরা আসিল, একটু পরে আবার গাড়িটাকে আস্তে আস্তে পিছু হটাইয়া প্ল্যাটফর্মে হাজির কবা হইল। দুষ্ট গাড়িটা যতক্ষণে কাটিয়া বাদ দেওয়া হইতেছে, ততক্ষণে আশ্রয়ভ্রষ্ট লোকগুলাও আসিয়া পড়িল প্ল্যাটফর্মে। সবাই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি করিয়া এ-গাড়ি সে-গাড়িতে উঠিয়া পড়িল, শুধু একটা হোলির দল সুবিধা করিতে পারিতেছে না। একসঙ্গে প্রায় জন কুড়ি, রঙে-আবিরে লাল, আর নেশায় চুর, প্রায় সকলেই। সকলেই এক গাড়িতে উঠিবে।

আমাদের গাড়িব সামনে দিয়া টলিতে টলিতে পিছনদিকে বেশ খানিকটা গেছে, এমন সময় রাজীবলোচন হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া দরজার সামনে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন, 'আপলোক ইস্ গাড়িমে আইয়ে না, তোকলিফ কাহে কবতা, গাডি খুল যায়গা।'

আক্রোশ মিটাইবার ফিকিব দেখিয়া রাগে বিস্ময়ে মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথা বাহির হইল না, তাহার পর বলিলাম, 'আপনার এত মাথাব্যথা কিসের, মশায়? যান না যে-গাড়িতে রয়েছেন।'

'একদম খালি হ্যায় গাড়ি, আইয়ে না। ইধার, এই গাড়িমে।'

কোণের ভদ্রলোকটিও আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, 'ইণ্টার ক্লাস সেটা হুঁস আছে? লেলিয়ে দিচ্ছেন, চেকাব ওদের ধরলে ম্যাও সামলাতে পারবেন?'

'এই-যে এই গাড়ি, আইয়ে; হাত-পা খেলায়কে হোলি গানেকা আর এয়সা গাড়ি নেহি মিলেগা, বহুৎ জায়গা।'

বটেশ্বরবাবু আতঙ্কে একবারে সিঁটকাইয়া গেছেন, ত্রস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'আসছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আসছে, এসে পড়ল বলে, অত উতলা হচ্ছেন কেন? এসেই গান ধরবে'খন।'

'মশাই, আপনিই না-হয় দয়া করে আসুন, বেশ গল্প করছিলেন, অন্যমনস্ক ছিলাম...'

'আইয়ে—আইয়ে—এই গাড়ি—'

খাতির করিয়া একজন ডাকিতেছে দেখিয়া দলটা উৎসাহের সঙ্গে আগাইয়া আসিতেছে, ডম্ফার খত্তালের আওয়াজও আরম্ভ হইয়া গেছে, অবশ্য অসংলগ্ন

ভাবে। বটেশ্বরবাবু আগুন হইয়া উঠিয়াছেন—'কি করি? হ্যাঁ মশায়!··· উহু-হু-হু-উস্। চাগালো আবার; হ্যাঁ মশাই?—এসে গেল যে, এ-যে প্রাণে মারবার ব্যবস্থা!'

কোণের লোকটিও বেশ সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন, বলিলেন, 'র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ফ্ল্যাট্ হয়ে যান, ওই ওঁর উরুতে মাথা দিয়ে···ওঁর—ওঁর—এই জামাই—অসুখে পড়ে গেছেন···নিন, আর দেরি নয়—এসে পড়ল বলে!'

ভদ্রলোক উরু লইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন, বলিলেন, 'সে কি, মশাই! বাঃ, আমার জামাই!—বা রে তামাসা!—আবদার মন্দ নয় তো!'

'ম'লে মেয়ে বিধবা হয়ে যাবে—এমনি ও ব্যাটারা থামবে না, জামাই না বলে উপায় নেই, একটা লোকের প্রাণ···নিন, আপনি শুয়ে পড়ুন—না হয় তথতার ওপরই···'

বটেশ্বরবাবু র‍্যাপারটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া শুইয়া পড়িলেন, ঢাকার মধ্যে থেকেই চিঁচিঁ করিয়া বলিলেন, 'না হয় শ্বশুরই বলবেন, মশাই, আগে বাঁচান সবাই মিলে, এর ওপর ডম্ফা বাজালে আর···'

দলটা আসিয়া পড়িল। রাজীবলোচন দোরটা ঠেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'আইয়ে, বহুৎ জায়গা, সবচেয়ে এই গাড়ি খালি হ্যায়, কেত্তা দূর তক যাইয়েগা?'

ইঞ্জিন আসিয়া জুড়িয়াছে, কয়েকজনকে উঠিতে একটু সাহায্য করিয়া নিজের গাড়িতে চলিয়া গেলেন।

৩

খানিকটা হট্টগোল হইলই, হোলির মাতালদের কাণ্ড তো; তাহার পর ওরই মধ্যে গোছগাছ করিয়া লইয়া গান শুরু করিবার জন্য ডম্ফায় ঘা দিয়াছে, আমি উঠিয়া হিন্দীতে বলিলাম, 'এক মিন্‌তি হ্যায় আপ লোগোঁসে—'

দলটি নিস্তব্ধ হইয়া গেল একটু, বুঝিতে কিছু সময় গেল, তাহার পর জড়িতকণ্ঠে নানা মুখে প্রশ্ন, মন্তব্য: 'কেয়া হ্যায়, বাঙালীবাবু?···বাৎ কেয়া হ্যায়?···মিন্‌তি কেঁও?···আপনার গোলাম হাজির, কি কোরতে হোবে হুকুম করুন, আভি তামিল হোয়ে যাবে···'

কোণের ভদ্রলোকটিও নিশ্চয় মাথা ঘামাইতেছিলেন, আমি কিছু বলিবার

আগেই কাগজের উপর মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'ও বাবুঠো মর গিয়া হ্যায়, বাৎ বোলতা থা, হঠাৎ বেঞ্চপর লুটায়ে পড়া। এই বাস্তে মেহেরবানি করকে গানঠো নেই কিজিয়ে।'

আমরা দুইজনেই বিস্মিতভাবে চাহিতে বাংলায় বলিলেন, 'ও শ্বশুর-জামাইয়ের সম্বন্ধের হাঙ্গামই চুকিয়ে দিলাম, মশাই।' সঙ্গে সঙ্গেই কাগজটা আবার আড়াল করিয়া বটেশ্বরবাবুর উদ্দেশে একটু চাপা গলায় বলিলেন, 'আপনিও কাঠ হয়ে পড়ে থাকুন, বাঁচতে চান তো—'

দলটা একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেল। সবাই বসিয়া বসিয়া টলিতেছে, কথাটা বুঝিতে একটু সময় লাগিল, তাহার পর আবার প্রশ্ন হইল—

'মরে গেছেন? ওহো-হো! বেঁচে থাকলেন না কেন? এমোন হোলিকা দিন!'

'মরে গেছেন বলেই বেঁচে থাকতে পারলেন না; আপনারা দয়া করে গানটা একটু বন্ধ রাখবেন এই মোকামাঘাট পর্যন্ত।'

'মোকামাঘাট কেনো, বাবুজী?'

ভদ্রলোকের মুখে বোধ হয় কথাটা একটু আটকাইল, অল্প চুপ থাকিয়া বলিলেন, 'সেখানে নেমে ওঁর সৎকারটা করতে হবে। আমরা নেমে গেলে আপনারা আবার আরম্ভ করবেন; এইটুকু তো, এর পরেই মোকামাঘাটে আসবে গাড়ি।'

আবার একটু চুপচাপ, প্রায় সবার মাথাই একটু একটু দুলিতেছে, বিপুল সমস্যার সামনে পড়িয়া মুখে কথা যোগাইতেছে না। তাহার পর উহারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু ধাতস্থ গোছের একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'বাবুজী, গোস্তাকি মাফ কিজিয়ে গা। লেকিন বাবু তো শুনেগা নেহি, মুর্দা হো গিয়া।'

ভদ্রলোক উত্তর করিলেন, 'তা উনি পাচ্ছেন না শুনতে···লেকিন—লেকিন—আর সবকো তোকলিফ হোগা তো?'

'কিস্‌কো, বাবুজী?'

ভদ্রলোক বটেশ্বরবাবুর পাশের লোকটির পানে একটু আড়ে চাহিতে তিনি সরিয়া বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে না, আবদার থাক, আমার কেউ নয়, আগেই বলে দিয়েছি, মনে থাকে যেন,—একটা মানুষকে এক কথায় শেষ

করে দিয়ে এখন···আপলোক গাইয়ে যেত্তা খুশি, ও মুর্দাকা কেয়া ব'য়ে গিয়া হ্যায়?—গান হোনেসে ভি য্যায়সা, হরিবোল হোনেসে ভি ত্যায়সা; ও তো পগার পার হো গিয়া।'

ডম্ফার ভয় আমারও ছিল, আশা করিয়াছিলাম সামলাইয়া যাইবে, মাতালদের মন যেদিকে চালানো যায় সেইদিকেই চলে; ভদ্রলোকও নিশ্চয় সেই ভরসাতেই ব্যবস্থাটা করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য রাস্তা নেওয়ায় একটু যেন থমকিয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটা কাঁচিয়া যায় দেখিয়া আমি বলিলাম, 'আতে আতে বেচারি মর গঁয়ে, আপসবকা ভি তো তকলিফ হোনা চাহিয়ে। আব্ স্বরাজ হো গয়া, বাঙ্গালী মরনেসে বিহারীকা দুখ্, বিহারী মরনেসে বাঙ্গালীকা দুখ্।'

কাজ হইল। 'ঠিক বাবুজী, ঠিক, ঠিক···নেহি গায়গা, বাবুজী···অ-হা-হা, বাঙ্গালীবাবু মর গিয়া!···আমি বাংলামুলুকে থাকছিল, বড়া আচ্ছা বাঙ্গালীবাবু সব···'

এই হাওয়াই বহিল কিছুক্ষণ, তাহার যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাহাও বাদ গেল না, শেষের দিকে একজন হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া 'বাঙ্গালীবাবু হো!' বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পাশের লোকটি বলিলেন, 'নিন, গান ছেড়ে মড়াকান্নার ধাক্কা সামলান এখন—ঐ গোটা দলটির!'

ভাবনার কথা নিশ্চয়, তবে হাওয়াটা আবার মোড় ফিরিল হঠাৎ, একটি অধিকতর বয়সের বেশ মোটাসোটা লোক সবার মধ্যে আগাইয়া আসিল, 'মড়া'র দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, 'অ-হা-হা! হায়রে বাঙ্গালীবাবু, বড় ভালা আদমি আছে।···বাবুজী, এক আর্জি আছে আমাদের।'

এই লোকটাই পিছন থেকে ভাঙা-ভাঙা কথা বলিতেছিল, বলিলাম, 'কেয়া? কহিয়ে, কহিয়ে।'

সফলতায় বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছি।

'হামলোক ভি সোৎকার করতে লিয়ে যাব বাঙ্গালীবাবুকে; আমি বাংলা মুলুকে থাকছিল, অনেক লাস অস্‌মশানে লিয়ে গেছি।'

এতটা ভাবিয়া বাঙালী-বিহারী এক করিতে যাই নাই স্বরাজের যশ গাহিয়া। মুখটা শুকাইয়া গেল। পাশের লোকটি বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, 'নিন এবার, ঠিক হয়েছে। টেনে-হিঁচড়ে ঐ কুড়ি-বাইশ জনে মিলে না চিতেয় তোলে জ্যান্ত মানুষটাকে তো কি বলেছি ; ওর আবার দোরোস্ত হাত।'

হঠাৎ 'মড়া'র পায়ের পাতা একটু নড়িয়া উঠিল। অবশ্য লোকটি উত্তরের আশায় আমার পানে চাহিয়াছিল, দেখিতে পাইল না। কোণের ভদ্রলোকটির নজরে পড়িয়াছে, আবার কাগজের আড়াল থেকে চাপা কণ্ঠে ভরসা দিলেন, 'ভয় নেই, আমরা আছি, পড়ে থাকুন।'

আমিও একটু সামলাইয়া লইলাম, ভাবিবার সময় লইবার জন্য লোকটিকে বলিলাম, 'সে তো আপনাদের দয়া, পথে-ঘাটে এরকম বিপদে সাহায্য না করলে করবে কে বলুন ? তাহলে আপনারা গুছিয়ে-সুছিয়ে বসুন নিশ্চিন্দি হয়ে, মোকামাঘাটটা আসুক। যাবেন কোথায় সব ?'

'আমরা মোকামা জংশনকো যাব, বাবু, আগে এক ইস্টিশন। লেকিন পহিলে বাবুর লাস জ্বালায়কে ত পরে যাব। আপনি কুচ্ছু ভাববেন না, আমরাই লিয়ে যাব। অহা-হা! বাবু মোরে গিলেন, বড়া ভালা ছিলেন বাঙ্গালীবাবু।'

ওর কথার মধ্যে কোণের ভদ্রলোক আবার সেইভাবে কাগজের আড়াল থেকে বলিলেন, 'আবার যেন ভয়ে পা নড়িয়ে বসবেন না, মশাই।'

'অচ্ছা বাবুজি, হমলোক ভজন গাই না ? ভজন তো চলতে পারে মুর্দার সঙ্গে—'

বিপদ কাটিয়াও কাটে না, গলা খুসখুস করিতেছে, বাগ মানিবে কেন ? বলিলাম, 'আপনি বাংলাদেশের রেওয়াজ জেনে-শুনেও ও-কথা বলছেন ? ভজন-কীর্তন হয় বুড়ো-বুড়ি কেউ ম'লে, আর এ চল্লিশও পেরোয়নি ভদ্রলোকের, তার ওপর এই বিঘোরে মরা, সুখের নয় তো। আপনি বিজ্ঞ লোক, ভেবে দেখুন না।'

'অহ-হ! চালিশও হোয় নি। শুনিয়ে ভাইসব, চালিশ ভি ন পুরা থা বাঙ্গালী-বাবুকা, আপশোস!...তাহলে ভজনভি থাক্, বাবুজী। আপনি রত্তিভর্ভি ফিকির কোরবেন না, গাড়ি থামলেই হমলোক নামিয়ে নিব— আমি অকেলাই নামিয়ে নোব কন্ধা কোরে।'

কোণের লোকটি আবার কাগজের আড়াল হইলেন, বলিলেন, 'পা সামলে, কিছু ভয় নেই, না হয় পুলিশ ডাকা যাবে তখন।'

৪

ডম্ফার দুশ্চিন্তা কাটিল, এইবার মোকামাঘাটে কি করিয়া সামলানো যাইবে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সমস্যাটা একেবারে গুরুতর আকার ধারণ করিল।

আমারই চোখে পড়িল এটা। কোণের ভদ্রলোক কাগজ আড়াল করিয়া বসিয়া আছেন, বোধহয় চারিদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িতেছেনই, পাশের লোকটি নির্বিকারভাবে সামনে চাহিয়া বসিয়া আছেন, আমার হঠাৎ মনে হইল বটেশ্বরবাবু যেন নিঃসাড় হইয়া গেছেন! ভীত হইয়া পড়িলাম; মড়ার অভিনয় করিবার জন্য যন্ত্রণাটা চাপিতে চাপিতে হার্টফেল হইয়া যায় নাই তো? গাড়ি লেট্ হইয়া পড়ায় ড্রাইভার গতিবেগ খুব দ্রুত করিয়া দিয়াছে, প্রবল ঝাঁকানিতে ভদ্রলোকের শরীরটা দুলিতেছে বলিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটা হইতেছে কিনা বুঝিতে পারা যাইতেছে না।...এ আবার কিসে কী হইয়া গেল!

মনটা যথাসাধ্য সংযত করিয়া লইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছু মাথায় আসিতেছে না। কতকটা দোমনা হইয়াও রহিয়াছি; না হয় নাড়ী টিপিয়া দেখিব! কিন্তু তাহা হইলে হোলির দল সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিবে, ডম্ফা আরম্ভ হইয়া যাইবে দ্বিগুণ আবেগেই, কিছু যদি ধুকধুকুনি থাকেও বুকের মধ্যে তো সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যাইবে। কি করা যায়? কিছু একটা হইয়াছেই, হয় শেষ, না হয় খুব কাছাকাছি; একটা মানুষ ওভাবে কানে হাত চাপিয়া কাতরাইতেছিল, আর একেবারে ঠাণ্ডা!—তাহাও গাড়ির এই প্রবল দোলানির মধ্যে!

কোণের ভদ্রলোকটির দিকে সরিয়া গেলাম, গলা নামাইয়া বলিলাম, 'মশাই, শুনছেন?'

কাগজের উপর মুখ তুলিলেন।

'নড়ে-চড়ে না কেন? দেখছেন?—এ তো জ্যান্ত মানুষের দোলা নয়, একটা যেন কাঠের গুঁড়ি নড়ছে।'

ভদ্রলোক স্থিরভাবে একটু চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন, 'বোধহয় গানের ভয়, তার ওপর আবার দাহ করতে নিয়ে যাবে কিনা, রুখতে পারবেন কি না-পারবেন—সিঁটকে-মিটকে পড়ে আছেন।'

'ভগবান করুন যেন তাই হয়, কিন্তু ধরুন যদি না হয় তাই! একটা মানুষ কাটা-ছাগলের মতন অমন করে ছটফট করছিল, আর একেবারে…'

'তাইতো! ও মশাই পা'টা না হয় নাড়ুন না—একটু—খুব সাবধানে…'

নড়ার আশায় দুজনে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।…কোথায়? গোটা শরীরটা শুধু গাড়ির আক্ষেপে টলমল করিতেছে।

ভদ্রলোক বিহ্বলভাবে চাহিয়া বলিলেন, 'তাহলে?'

'তাই তো ভাবছি! নাড়ী দেখতে যাওয়াও ঠিক হবে না। দাঁড়ান, ও ভদ্রলোককে ডাকি।…মশাই, একটু এদিকে ঘেঁষে বসুন তো, একটা কথা আছে। একটা সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে।'

'এতক্ষণে মোটে একটা চোখে পড়ল আপনাব? আমি তো কূলকিনারা পাচ্ছি না।'—বলিয়া বিরক্তভাবে সবিয়া আসিলেন। বলিলাম, 'লক্ষ্য করছেন? লোকটা সত্যিই টেঁসে গেল নাকি? যা ক্ষীণজীবী, আর যা যন্ত্রণাটা পাচ্ছিল! একবার না হয় ওদের আড়াল করে একটু নাকের কাছে হাতটা নিয়ে গিয়ে দেখবেন?'

ভীত এবং বিরক্তভাবে একবার মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া লইয়া আরও একটু এদিকপানেই সরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'হ্যাঃ, আমি এখন মড়া ঘাঁটতে গেলাম, এই সন্ধ্যের বেলা! টেঁসে গিয়ে থাকে ভালোই তো হ'ল; ঐ কুড়ি-বাইশটা যমদূতে জ্যান্ত মানুষ নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করত তো! যা ব্যবস্থাটা করেছেন, ওরা ছাড়ত ভেবেছেন নাকি?—টেঁসে গিয়ে থাকে, সে তো বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।'

গাড়ী উন্মত্তবেগে ছুটিয়াছে, ড্রাইভারটারও হোলির ছোঁয়া লাগিল নাকি? একটা কাণ্ড না করিয়া বসে! স্টেশনের পর স্টেশন সট্ সট্ করিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, মোকামাঘাট আসিয়া পড়িল বলিয়া।

ওদিকে দলের বেশির ভাগ লোকই নেশার ঝোঁকে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, তবে কয়েকজন দাহ করিবার লোভে যেন চেষ্টা করিয়া চোখে চাড়া দিয়া সজাগ আছে, বিশেষ করিয়া সেই লোকটি, যে প্রস্তাবটা করে।

এই সময় গাড়ী মেন লাইন ছাড়িয়া ঘাটের লাইনে প্রবেশ করায় আচমকা একটা আরও বড় রকম ঝাঁকানি লাগিল। 'বাবুজী, মুর্দা বিরিঞ্চ্ থেকে গিরে যাবে।'—বলিয়া লোকটি নিজেই উঠিয়া আসিতেছিল, আমার মাথায় একটু বুদ্ধি খেলিয়া গেল—পরীক্ষার এই একটা সুযোগ। বলিলাম, 'থাক, আপনি কষ্ট করবেন না, আমিই ঠিক করে দিচ্ছি।'

উঠিলাম, গাড়ির বেগ কমিয়া আসিয়াছে, গোছ-গাছ করিয়া দিবার অছিলায় র‍্যাপারের মধ্যে হাতটা চালাইয়া একবার নাড়ীটা টিপিলাম। বুঝিতে পারিতেছি না—গাড়ির দোলানি আছে একটু, সেই সঙ্গে নিজের মানসিক উদ্বেগ; নাকের নীচে হাত দিলাম, আরও বোঝা যায় না; শেষে বুকের ওপর চারিটা আঙুল চাপিয়া ধরিয়াছি, এমন সময় ব্রেক্‌টা চাপিয়া বেশ একটু গতির মুখেই গাড়িটা আর-একটা বড় নাড়া দিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

বটেশ্বর একেবারে ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিয়া সামনেই আমাদের তিনজনকে দেখিয়া বলিলেন—'আ—হ্! ব্যথাটা গেছে মশাই, এক্কেবারে টানা একটি ঘুম—কিচ্ছু বুঝতে পারিনি। মোকামাঘাট এসে গেল নাকি?'

তারপর পিছন দিকে নজর পড়িয়া যাইতেই সব মনে পড়িয়া গেল; তীব্র আতঙ্কে কয়েক সেকেণ্ড দলটার পানে চাহিয়া থাকিয়া, নিজের পুঁটুলিটি পর্যন্ত না লইয়া তিন লাফে দরজার কাছে গিয়া পড়িলেন এবং কোনরকমে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া দরজা গলিয়া প্ল্যাটফর্মের ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

লোকটি সবাইকে 'লাস জ্বালাইতে' যাইবার জন্য চাঙ্গা করিয়া তুলিতে যাইতেছিল, এরকম বিপরীত কাণ্ড দেখিয়া কিম্ভুতকিমাকার হইয়া গিয়া বলিল, 'বাবুজী—মুর্দা তো··· !'

'তাই তো দেখছি'—বলিয়া আমি গলা বাড়াইয়া হাঁক দিলাম, 'কুলী! এই কুলী, ইধার আও, জলদি—'

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস

ছেলেরা খুব সন্তর্পণে কোনরকমে বারান্দা পর্যন্ত উঠে এসেছে, তার পর আর সাহস পাচ্ছে না। বারান্দার মাথায় একটা বড় ঘড়ি পেণ্ডুলাম দুলিয়ে যাচ্ছে, বিমল আর একবার সেদিকে দেখে নিয়ে পাঁচটা আঙুল দেখিয়ে ইসারায় হাতটা ঘুরিয়ে দিলে—অর্থাৎ পাঁচ মিনিট হয়ে গেল।

নূতন ভাড়াটে শোনা যাচ্ছে নাকি অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক। এই বাড়িতে আগে ছিলেন কাশীনাথবাবু; বৃদ্ধ নিজে, ছ'টি ছেলে, তার মধ্যে মেজ আর ছোট এখানেই থাকত, বাকি চারজনের যাওয়া-আসা লেগেই থাকত সমস্ত বছর, পরিবারবর্গ নিয়ে। সর্বদাই পাড়ার ছেলেমেয়েদেরও যাতায়াত লেগে থাকত বাড়িতে, নাতি-নাতনীদের সাথী, ছেলেদের বন্ধু। এই লোহার বর্শার ফটক তখনও ছিল, দুটি পাল্লায় কখনও এক হতে পেত না; রাত্রে মাঝখানের বড় ঘরটায় কাশীনাথবাবুর নিজের সমবয়সীদের নিয়ে পাশার আড্ডা বসত, সমস্ত পাড়াটা করত গমগম।

সদাশিব মানুষ, ডাকলে সব দলে আছেন, সব কাজে; যে-কোন প্রয়োজনে যখন খুশি গিয়ে উপস্থিত হও, যতজনে খুশি, সেই এক প্রসন্ন হাসির অভ্যর্থনা। একেবারে সেরকম দরকার পড়লে ছেলেরা পাশার আড্ডার মধ্যেও এসে দাঁড়িয়েছে, ওঁর ভরসায় আর সবার বিরক্তিকে গায়ে না মেখে।

তখন পাড়ার বড় সরস্বতী পূজাটা এই বাড়িতেই হ'ত।

নূতন ভাড়াটে রুক্মিণীবাবু এসে একদিনে অভ্যাসটা দিলেন ছাড়িয়ে। গেটের একটা থামে বাইরের দিকে ইংরাজিতে নামের ফলক বসল রুক্মিণী-কুমার শেঠ; অন্য থামে, গেটের ভেতরে একটা লেটার-বক্স; তার নীচে "In আর Out" লেখা একটা কাঠের তকৃতি, In-টা সর্বদাই ঢাকা। গেট সর্বদাই বন্ধ; তালা দেওয়া নয়, ওপরে লোহার ছিটকিনিটা দিয়ে আটকানো। ভেতরটা ঝাঁট-পাট দেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; যেটুকু রাস্তার মতো, তার দুধারে কাটি-পোঁতা চারা ফুলের টব বসল, বাঁদিকের ফাঁকা জায়গা—যেখানে

পাড়ার ছেলেদের সকালে-বিকেলে হুল্লোড় হ'ত—তার চারিদিকেও কি এক বেড়া গাছের ডাল কেটে পোঁতা হয়েছে।

বাড়িটা নিস্তব্ধ, দোরে জানলায় পরদা টাঙানো, একেবারে রোদ পড়ে গেলে একটা পশ্চিমা চাকর তিন-চারটি ধোওয়ানো-মোছানো ছেলেমেয়ে সঙ্গে করে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ায়—গেটের মধ্যেই।

ছেলেরা যেতে যেতে গেটের বাইরে থেকে সব দেখে, তারপর একটু বোধহয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে যার কাজে-অকাজে চলে যায়। বুড়োরাও দু'একবার সন্ধ্যার পর উঁকিঝুঁকি মেরেছে—গেটের বাইরে থেকেই ; দীর্ঘশ্বাসও পড়েছে। তারপর অন্যত্র বসেছে পাশার আড্ডা।

মাস-চারেক হয়ে গেছে, অভ্যাস গেছে ছেড়ে, এখন আর দীর্ঘশ্বাসও পড়ে না।

তারপর মাস চার পরে আবার এই সরস্বতী পূজা এসেছে। চাঁদার দরকার। অতবড় বাড়িটা যে অমন ভাবে ভোগদখল করছে তার আর কিছু না থাক, টাকা আছে ; তাকে বাদ দিলে লক্ষ্মীর বোন সরস্বতী সন্তুষ্ট হবে না।

সেই এসেছে সবাই কপাল ঠুকে, সংখ্যায় আছে পাঁচজন। ঠিক যে সাহসের অভাব বলা যায় তা নয়। একটা জায়গায় ছিল অমন অবাধ গতিবিধি, বোধ হয় বাড়ির চেয়ে বেশি, সেখানে এইভাবে হ'ল আসতে, কেমন একটা অস্বস্তি আর সঙ্কোচ। ঠিক ভয় নয়, বারান্দার নিচে পর্যন্ত খানিকটা বেপরোয়া ভাবই ছিল, নইলে গেটের তক্তিটাকে 'Out' লেখা সত্ত্বেও প্রবেশ করতে পারত না ; বারান্দায় উঠে কিন্তু একটু খেয়েই গেছে থতমত।...কি বলবে না-বলবে ; লোকটার চেহারাও ভালো করে দেখা নেই—সকালবেলায় মোটরের মধ্যে বসে বেরিয়ে যায়, বিকেলবেলায় ফেরে—তাও কেউ দেখেছে, কেউ আবার দেখেওনি।

যতীনই দলের অগ্রণী, পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে জানিয়ে বিমল ইসারাটা করতে একটা গলাখাঁখারি দিলে, সেটার আওয়াজ একেবারেই খুলল না দেখে আর-একটা একটু বড় ক'রে। ভেতর থেকে প্রশ্ন হ'ল, 'কে ?'

'আজ্ঞে আমরা, আসতে পারি কি ?'

চেয়ার ঠেলে ওঠার শব্দ হ'ল, তারপর একজোড়া চটি এগিয়ে আসছে ;

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে, এমন সময় পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলেন ভদ্রলোক।

বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স, সৌখিন গোছের চেহারা, বিশিষ্টতা-বর্জিত, সাধারণ একটা চেহারা কামিয়ে-কুমিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখলে যেমন হয়। জিগ্যেস করলেন, 'কাকে চান ?'

'আজ্ঞে···রুক্মিণীবাবুকে—'

'তিনি তো আউট (Out), গেটে দেখেননি ঢোকবার সময় ?'

দেখে শুধরেও দিয়েছিল যতীন, বললে, 'আজ্ঞে, In-টাই তো চোখে পড়ল আমাদের, Out-টা ঢাকাই ছিল—নারে আশিস ?' আশিস বললে, 'তাই তো দেখলাম, নারে বসন্ত ?'

বসন্ত প্রমাণ দিয়ে বললে, 'নৈলে এলাম কি ক'রে ?'

ভদ্রলোক মুখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবার উত্তরগুলো শুনলেন, কি যেন একটা ঠাহর করে নিয়ে বললেন, 'হু।···তা আমারই নাম রুক্মিণীবাবু, কি দরকার ?'

যতীন বললে, 'আমাদের পাড়ায় সরস্বতী পূজো হয়—আর বছর পর্যন্ত এই বাড়িতেই হয়ে এসেছে—তারই চাঁদা···'

'ও। সরস্বতীপূজোর চাঁদা ? তা আমার কতটা ভক্তি আর বিশ্বাস তা তো জানেনই সবাই, এ-বাড়ি থেকে সরিয়েই দিয়েছি ঠাকুরকে আপনাদের।'

ছেলেদের সাহস বেড়ে আসছে—আশা কম বলে, আরও ; সেই অনুপাতে সঙ্কোচটা যাচ্ছে কেটে। এদিকে লোকটা ভেতরে তো ডাকলেও না, বাইরেও, নিজে না বসে সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কম বয়সের যে তর্কের প্রবৃত্তি সেটা ঠেলে উঠছে সবার মধ্যে, তবু নরম ভাবেই বললে বিমল, 'আজ্ঞে তাতে হয়েছে কি ? চাঁদা দিতে হলে সে বাড়িতেই পূজো হতে হবে তার মানে কি ?'

'না, কথা হচ্ছে ভক্তির।'

'তার কি অভাব আছে ? ওটা আপনার বিনয় ; নিয়মই হচ্ছে, ভক্তি যত গাঢ় বিনয় তত বেশি হবে।'—পরিতোষ পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এসে সেও যোগদান করলে।

'এটা আপনাদেরই বিনয়, দেখছেন একটা লোক ঠাকুরকে ভিটে-ছাড়া করেছে, তবু তাকে ভক্ত সাব্যস্ত না করে ছাড়বেন না।···এক যদি বলেন ভক্তির চোটে ভিটেছাড়া করেছি তো অবশ্য নাচার।'

'তাহলে ?'

'তাহলে আর কি ? চাঁদা আমি দোবনা বুঝছেনই, সুতরাং আপনাদের সময় নষ্ট না করে চলে গেলেই ভালো। তবে তর্কের যখন একটা ঝোঁক রয়েছে, জিগ্যেস কচ্ছি, ভক্তি যে হবে একটা কিছু দেখে তো ?'

'আজ্ঞে, সে গ্যারান্টি দিতে পারি, আমাদের ঠাকুরের মূর্তি দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না ; গতবৎসর প্রাইজ পেয়েছিল।'

'মূর্তিতে আমার ভক্তি আসে না, যত প্রাইজই পাক ; কাঠ-খড়-কাদা-খড়িই তো ?'

'গুণের কথাই ধরুন, তিনিই তো বিদ্যে দিচ্ছেন।'

'কিরকম বিদ্যে সেই কথা হচ্ছে ; এই ধরুন আপনাদের কথা—অনেক বছর ধরেই নিশ্চয় করছেন পূজো ?'

পরিতোষ বোধ হয় আন্দাজ করেছে উদ্দেশ্যটা, একটু থতমত খেয়ে যেতে আশিস বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিয়েও তো যাচ্ছেন যার যেরকম ভক্তি সেইমতো।...এই ধরুন না, যতীন, আমাদের সেক্রেটারি—ও বি-এ'তে সেকেণ্ড স্ট্যাণ্ড করেছে।'

যতীন গোড়ায় সেই একটা কথা বলে, চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁতে নখ খুঁটছিল আর কি যেন ভাবছিল, সবাই একটু একটু করে এগিয়ে আসতে পেছনেও পড়ে গিয়েছিল ; ভদ্রলোক ঘুরে চাইলেন তার দিকে, তারপর আশিসকেই বললেন, 'বাঃ, ঠাকুরের সুবিচার আছে।...না, আমি বলছিলাম অন্য কথা—এই যে গেটের 'Out'টাকে 'In' করে দিয়ে ভেতরে আসা, এ-বিদ্যেটাও তো তাঁরই দেওয়া। সেটুকুকে বছরের পর বছর পূজো-তপস্যা ক'রে পেয়েছো ? তাঁর তো তাহ'লে প্রেসিডেন্ট হবার কথা ?'

আঘাতটা যেমন হঠাৎ তেমনি জোরালো, তার ওপর বেশ একটি স্পষ্ট ব্যঙ্গের হাসি লেগে রয়েছে ভদ্রলোকের মুখে, ছেলেরা আর একবার থতমত খেয়ে গেল। শুধু যতীন ছাড়া, সে নখ খুঁটতে-খুঁটতেই নিচু মুখে চোখদুটো তুলে শুনছিল, এক পা এগিয়ে এসে বললে, 'আজ্ঞে, ও বিদ্যেটাও তাঁরই কাছে পাওয়া...'

'সত্যি নাকি !' —উত্তরের ভাষা আর ভঙ্গিতে ভদ্রলোকও বেশ হকচকিয়ে গিয়েই চাইলেন মুখের পানে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গেটের সামনে দাঁড়াতেই কে যেন কানে কানে ব'লে দিলে— মা-ই নিশ্চয়—ও Out-টা ভাঁওতা, তবু আইন বাঁচিয়ে ওটাকে 'In' করে দিয়ে ভেতরে চলে যা, দেখা পাবি।'

দুজনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, হাসিটা এবার যতীনের মুখে, খুব সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি। খানিকটা সময় পেয়েও যখন ভদ্রলোকের কোন উত্তর যোগাল না, তখন বললে, 'তাহলে বুঝছেন প্রেসিডেন্ট হবার মতন বিদ্যেটা...'

ভদ্রলোক ভেতরে চলে গিয়ে পরদাটা টেনে দিতে প্রশ্ন করলে, 'তাহলে দাঁড়াই আমরা? —আনতে গেলেন?'

, —অবশ্য শুধু আর একটু চটিয়ে যাওয়া, যখন কোন আশাই নেই। ভদ্রলোক চৌকাটে পা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কথাগুলো বলার পরও আশা রাখেন?'

'মনে হ'ল অতগুলো কথা শোনার পর খালি হাতে ফিরতে হবে না...'

এর উত্তরে পরদার ওপরেও দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

পথে আসতে আসতে কেউ বললে 'হাড় কিপটে', কেউ বললে 'চালবাজ', কেউ বললে 'স্কেপটিক' (Sceptic), কেউ বললে 'চামার'। বেশি আশাও ছিল না, নৈরাশ্যও বেশি গভীর হ'ল না; বেশি মিষ্ট করে দু'কথা শোনানর যে আনন্দ সেটা হাতে রইল উপ্‌রি। এরপর ঘোরাঘুরির মধ্যে কথাটা ভুলেই গিয়েছিল সবাই, আবার রাত্রে একটু উঠল সেটা চাঁদা আদায়ের হিসাব মেলাবার সময়। ব্যাপারটা জুড়িয়ে এসেছিল, তাই থেকেই আবার একটা ফিকড়ি বেরুল।

আশিসের বাড়িতে জুটেছে সবাই, তাদের বাইরের উঠানে ম্যারাপ খাটিয়ে হবে পূজা এবার। তাদেরই বাইরের একটা ঘরে প্রতিদিনের কাজের আলোচনা হয়, কতদূর কী হ'ল না-হ'ল, কী হবে। কয়েকজন মেয়েও আছে।

আশিসের বোন অতসীও আছে, অন্যান্য কতকগুলা দোষের মধ্যে একটা দোষ যতীনের সঙ্গে একটু আড়াআড়ি—যেমন কথার খুঁত ধরবার জন্যে ওৎ পেতে থাকে, তেমনি প্রশংসার কিছু শুনলে সেটাকে সাধ্যমতো হালকা করে ফেলবার চেষ্টা।

চাঁদা আদায়ের প্রসঙ্গে আজকের ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত খুব মন দিয়ে শুনছিল, শেষ হ'লে টেবিল থেকে নেমে একটা চেয়ারের হাতলে ব'সে ব'লে উঠল, 'এই কথা? আমি মনে করছিলাম কী বীরত্বের কাহিনীই না শুনব যতীনদার!'

আশিসই দিলে উত্তর, 'যেখানে কথার লড়াই হচ্ছে সেখানে কথায় জেতাই তো বীরত্ব।'

ছন্দা এগিয়ে এসে অতসী টেবিলে যেখানটায় বসেছিল সেখানটা ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, বললে, 'তাহলে আমিও অতুর দিকে,—একটা কাজ করতে গিয়ে দুটো ফাঁকা কথা বলার লোভে সে-কাজ পণ্ড করে আসা খুব বেশি বীরত্ব বলে মনে করি না।'

জয়া ওদিকে চাঁদার তালিকাটা দেখছিল, মুখ তুলে বললে, 'আমি তো একেবারেই মনে করি না।'

পরিতোষের ভাইঝি জয়া। পরিতোষ বললে, 'তোরা রীতিমতো দল পাকাতে বসলি—তোদের বীরত্বের ডেফিনিশনটা শুনি, তোরা থাকলে করতিস কি?'

'কথাও শোনাতাম, চাঁদাও আদায় করতাম; এমন শোনানো শোনাতাম যে, বাড়ি বয়ে চাঁদা দিয়ে যেতে পথ পেত না বাছাধন!'

যতীন এতক্ষণ ওর সেই নিজের পদ্ধতিতে দাঁতে নখ খুঁটতে-খুঁটতে কি ভাবছিল, বললে, 'বেশ তো, তোরাই একবার না-হয় যা না; পালিয়ে যায়নি তো ভদ্রলোক।'

'ইস্! এখন আসর মাটি ক'রে এসে—তোরা যা না…'

দাদার শ্বশুরবাড়ির সুবাদে বিমলের সঙ্গে ঠাট্টার সম্বন্ধ, বললে, 'মাটি করা আসর জমিয়ে তুলতেই তো কৃতিত্ব তোমাদের…'

যতীন বললে, 'না, সত্যিই ঠাট্টা নয়, একটা লোক চাঁদা তো দেবেই না, তার ওপর আমাদের বুকে ব'সে এইরকম অপমান করবে, ঠাকুরকেও দেবে গাল—তোমরা যদি ভাবো যে ওকে দুটো কথা শুনিয়েই আমার গায়ের জ্বালা মিটেছে তো ভুল তোমাদের; ও হাম্‌বাগকে একটা সমুচিত শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত…'

'নিজে যে শিক্ষা পেয়েছি সেটা ভুলতে পারছি না।'—কথাটা বলে অতসী খিলখিল করে হেসে উঠল।

যতীনের মাথায় কিন্তু কথাটা ঢুকে গেছে, হাসি-ঠাট্টার দিকে মন নেই; বললে, 'তুই-ই যা, অতু, আর একজন কাউকে নিয়ে, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, তোকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দোব।'

জেদাজেদির বহর দেখে একটু ভয় পেয়েই অতসী উত্তর করলে, 'আসলে তোমার মাথা-খারাপ হয়ে গেছে, যতীনদা,—একটা কথা ঠাট্টা করে বললাম আর তুমি একেবারে সিরীয়াস হ'য়ে পড়লে…'

ছন্দার দিকে চেয়ে বললে, 'গালও সহ্য করতে পারে না, ঠাট্টাও বুঝতে পারে না—এ মানুষকে নিয়ে কি হবে বল্ দিকি, ছন্দা?'

ছন্দা ছোট্ট করে উত্তর দিলে, 'নিস্ নি।'

অতসী চকিতে একটু চোখ রাঙিয়ে কথাটা যেন কানেই যায়নি এইভাবে বললে, 'আরও বুদ্ধি দেখো যতীনদার, একদল ছেলে ফিরে এল, তারপরেই সেই চাঁদার জন্যে একদল মেয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল…'

'তুই বকেই যাবি, শুনবিনি তো প্ল্যানটা আমার?—সেই পুজো তা বলবিই বা কেন, জানতেই বা দিবি কেন?…'

অতসী রাগ বা রাগের ভান করে চেয়ারের হাতল ছেড়ে নেমে পড়ল, ছন্দার হাতটা ধরে বললে, 'আয় ছন্দা, এদের বুদ্ধি নেই-ও, দেওয়াও যাবে না।… জয়াদি, তুমি থাকবে নাকি ব'সে?'

তিনজনেই চলে যেতে এরা একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে, বিমল যতীনকেই প্রশ্ন করলে, 'বুঝলি ব্যাপারটা?—বোধহয় অফেন্স্ নিয়েছে—এইরকম একটা মিশনে পাঠানো—মেয়েছেলে বলেই…'

যতীন অন্যমনস্কভাবেই মাথা দুলিয়ে বললে, 'বোধহয় তাই, তবু কথাটা উঠে ভালোই হোল, নইলে স্ট্রাইক করত না আমার।…প্ল্যান আমার হয়েই গেছে ঠিক; রুক্মিণীনন্দনকে একবার দেখব—'

'এরা কিন্তু চটে রইল…'

'সে ঠিক মানিয়ে নোব'খন।'

পূজার আগের দিনের কথা, এ ব্যাপারটা যখন দিন-ছয়েকের বাসী হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দুটি মেয়ে রুক্মিণীবাবুর বাসার লোহার গেটটা খুলে

আবার ভেজিয়ে দিয়ে ছিটকিনিটা এমন শব্দ করে লাগিয়ে দিলে যে বাড়ি পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে যায় শোনা। তারপরেই কিন্তু দুজনে থামের দিকে চেয়ে যেন একটু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই তাদের নজর পড়ল একটি ভদ্রলোক বারান্দা থেকে দুটো সিঁড়ি নেমে দাঁড়িয়েছেন, সেখান থেকেই প্রশ্ন করলেন, 'কে? কাকে চান?'

বড়টি প্রশ্ন করলে, 'রুক্মিণীবাবু বাড়ি আছেন?'

'আমারই নাম।'—আরও দুটো সিঁড়ি নেমে এসে সুরকি-বেছানো রাস্তায় নামলেন। মেয়ে দুটিও এগিয়ে এল। বড়টিই বললে, 'Out লেখা দেখে ফিরে যাব মনে করছিলাম…'

উত্তরটা দিতে কণ্ঠ একটু স্খলিত হ'লেও রুক্মিণীবাবু হেসেই বললেন, 'ওটা সব সময় সত্যি নয়। …না দিয়ে রাখলে কলার্স (callers) ঠ্যাকাতে ঠ্যাকাতে প্রাণ অন্ত হয়, তাই…'

বড় মেয়েটি ছোটটির পানে চাইলে, বললে, 'কি রে, তাহলে তো আমাদের মানে মানে ফিরে যাওয়াই ভালো, খুব ওয়েলকাম্ কলার্স (Wel-come callers) নয়তো…'

রুক্মিণীবাবুর মনে হ'ল ছোটটিকে যেন কোথাও দেখেছেন—; একটু ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ, আর বড়টি বোধ হয় যেমন প্রগল্ভা, এটি তেমনি লাজুক; ঘাড়টা একটু হেঁট করাই; বড়টির কথা শুনে একটু মুখ তুলে অল্প শুধু হাসলে।

রুক্মিণীবাবু একটু ব্যস্ত হয়েই বললেন, 'সেকি! …আপনার…ঠাণ্ডাটা… এখনও ভালোরকম যায়নি—বারান্দায় উঠে আসুন।'

এগুতে এগুতেই বললেন, 'আমার সঙ্গেই দরকার, কি বাড়ির ভেতরে… ওঁরা একটু বাইরে…'

'না, আপনার সঙ্গেই…'

তারপর হেসে বললে, 'অবিশ্যি তেমন অবস্থায় পড়লে, ভেতরের সাহায্যও নিতে হতে পারে। …Unwel-come callers এইজন্যে বলছিলাম যে, আমরা এসেছি সরস্বতী পূজো উপলক্ষে—চাঁদা তো চাই-ই, তা ভিন্ন রাত্তিরে আমাদের ছোট একটি সাহিত্যিক আসর আছে তাতেও দয়া করে সভাপতিত্ব করতে হবে একটু—এই গান, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, কবিতা পাঠ—এই রকম।'

বারান্দায় উঠে তিনটি চেয়ারে তিনজনে বসল।

উত্তরটা দিতে সামান্য একটু বিলম্বই হয়ে পড়ল রুক্মিণীবাবুর; একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, তারপর একটু হেসেই বললেন, 'পূজোর চাঁদা? এর জন্যে এত কুণ্ঠা কেন?—বিশেষ ক'রে হিন্দুর বাড়িতে এসে।...তা ইয়ে—এটা আপনাদের নিজের পূজো?'

মেয়েটি প্রগল্‌ভাই; ঠিক উত্তরটা ইচ্ছা ক'রে এড়িয়ে যাবার জন্যে হোক বা যে জন্যেই হোক, হেসে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না, নিজের—মানে আত্মপূজা নয়—যদিও ঠাকুর মেয়েই...'

তারপরেই সামলে নিয়ে বললে, 'মাফ করবেন, চাঁদা অনেক সময় আত্মপূজাতেই লাগে—আমরা তো অপরিচিতাও, তাই...'

রুক্মিণীবাবু লজ্জিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'সে কি! অবিশ্বাসের কথা নয়—মোটেই সেভাবে জিগ্যেস করিনি আমি, সামান্য একটু চাঁদা দোব—দেবী-পূজায়—হিন্দু হয়ে...আমি জিগ্যেস করছিলাম—এ পাড়ায় আরও পূজো তো থাকতে পারে—তাই...'

এবারেও এড়িয়ে গেল মেয়েটি, বললে, 'না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন, একটা রসিদ তো দোবই আমরা, অন্যদল এলেও সেটা দেখালে আর জ্বালাতন করবে না।...এর আগে এসেছিল কি কোনও দল?'

রুক্মিণীবাবু আবার একটু অপ্রতিভ হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, বললেন, 'আসা মানে...হ্যাঁ, এসেছিল ক'টি ছেলে—তবে—তবে, ব্যস্ত ছিলাম—কত দোব কি বৃত্তান্ত, কিছু বলিনি।'

মেয়েটি যেন একটু কৌতুকের দৃষ্টিতেই মুখের পানে চেয়ে ছিল, বললে, 'দোব বলে কমিট্‌ও (Commit) করেননি তো?'

'না,...মানে...'

'তাহলে ঠিক আছে; এলে আমাদের রসিদটা দেখিয়ে দেবেন, বলবেন, তারা নাছোড়বান্দা হয়ে নিয়ে গেল। এই ব'লে ভাগিয়ে তো দেবেন, তারপর আমাদের ঝগড়া আমরা বুঝে নেব। ...তবে হ্যাঁ, একটা কথা...'

এবার মুখটা হাসি-হাসি ক'রে বেশ স্পষ্ট কৌতুকেই মুখের পানে চেয়ে রইল, তারপর ছোট মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে, 'এবার তুই বল্‌...বারে মজা, চাঁদা তুলতে এসে থাকবে একেবারে চুপ করে—অথচ ক্রেডিট (Credit) নেবে—দুজনে চাঁদা আদায় করে আনলাম! ...আপনিই বিচার করুন!'

রুক্মিণীবাবুও চাইলেন মেয়েটির দিকে—একটু হেসে ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিয়েছে। …কোথাও যেন দেখেছেন…এই জায়গাতেই যেন…

হেসে বললেন, 'আপনি বলুন না, সবাই তো পারেও না বলতে…'

'তা হ'লে এসেছে কি করতে বলুন না।…কি যে বলছিলাম—হ্যাঁ, একাধিকবার চাঁদা দেবার কথা,—রসিদ দেখালে অবশ্য আর চাইবে না, তবে যদি দেখে ফাঁকিতে সেরেছেন—(একবার বারান্দা-বাগানের ওপর চোখ বুলিয়ে)—যেমন ধরুন দশটাকা দেওয়া উচিত অথচ পাঁচটি টাকা ঠেকিয়েই বিদায় করেছেন, তো…'

হেসে উঠে বললে, 'মাফ করবেন—বড্ড বেহায়াপনা হয়ে যাচ্ছে…'

রুক্মিণীবাবুও যোগ দিয়েছেন হাসিতে; ছোট মেয়েটি মুখটা একটু তুলে বললে, লেখেন যদি দশটাকা—পাঁচটাকাই দিয়ে…'

বড় মেয়েটি চোখ দুটো বড় বড় ক'রে, মুখটা একটু হাঁ ক'রে চেয়ে রইল, বললে, 'দেখুন! কথা কয় না তো কয় না, যখন কয়!…তাও যদি নিজেদের টেনে হ'ত—এ ঘরের শত্রু বিভীষণকে সঙ্গে এনে…'

ওর বলবার ভঙ্গিতে দুজনেই হো-হো করে হেসে উঠল।

হাসি থামার পর রুক্মিণীবাবু একটু চুপ করে রইলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'পূজোতে হয় কি কি আপনাদের?'

উদ্দেশ্যটা স্পষ্টই, বড় মেয়েটি বললে, 'এও মুশকিলে ফেললেন দেখছি, হাজার কমিয়ে বললেও মনে করবেন বাড়িয়ে বলছে।'

ভদ্রলোক যেন উদ্দেশ্য ধরা পড়ে যাবার জন্যেই একটু হেসে উঠে বললেন, 'বলুনই না, তা মনে করলেও যতটা অবস্থা তার বেশি তো দিতে পারব না।'

'হয়—যা সাধারণ—পূজো, ভোগ, প্রসাদ—এদিকে বাজনা, আলো, বাজি, বিসর্জনের একটা খরচ আছে, তারপর রাত্তিরে ঐ একটু সাহিত্য-বাসর।'

তারপর একটু বিষণ্নভাবেই বললে, 'আজকালকার যা বাজার, খরচ আছেই, তবে খরচের কথা গোড়াতেই ভাবলে আর এগুনোই যায় না। ভাবিও না তাই, আপনাদের পাঁচজনের কাছ থেকে যা উঠল তা উঠল—শেষে খানিকটা নিজেদের ঘাড়ে পড়ে—পড়ছেই ক'বছর থেকে…'

বিষণ্ণতার আসরে একটু স্তব্ধতাই বিরাজ করতে লাগল। খানিক পরে রুক্মিণীবাবু বললেন, 'তবু যে আপনারা করছেন···পূজো তো আর উঠেই যাচ্ছে —হিন্দু জাতটাই যেন আমরা কি হ'য়ে যাচ্ছি দিন দিন···বিশ্বাস বলুন, ভক্তি বলুন সবই যেন উঠে যাচ্ছে—নয় কি ?'

এই সুরেই কথাবার্তা চলল খানিকক্ষণ—একেবারে পূজার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পর্যন্ত—মন্দ জানা নেই সেদিকে।

এক সময় বড় মেয়েটি বললে, 'আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করলাম···'

রুক্মিণীবাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমি তো বাড়িতেই বসে, সময় খানিকটা গেল আপনাদের।···আব দেখুন আক্কেল আমার! সারাক্ষণ বাইরেই রাখলাম বসিয়ে···'

'তা হোক, আর শীত তো নেই একেবারেই···বসন্ত বেশ ভালো করেই এসে গেছে।'

এ কথাটুকুর পরও রুক্মিণীবাবু একটু চুপ করেই রইলেন দাঁড়িয়ে, তবে খুব অল্প কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপর বললেন, 'তাহলেও ঘরে এসে বসুন একটু—আমি ততক্ষণ চাঁদাটা নিয়ে আসি ভেতর থেকে···আমার স্ত্রী এসে বাইরে-বাইরে থেকেই বিদায় করেছি শুনলে আমায় ক্ষমা করতে পারবেন না···'

'তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আর একদিন আসব···'

ছোট মেয়েটি বললে, 'আজ বরং একটু বাগানটা আপনার দেখি, কী যে চমৎকার!'

বাগানেও খানিকটা বেড়িয়ে বেড়িয়ে কথা হ'ল। পাশের প্রাঙ্গণটার সামনে এসে একটু আপশোসও করলেন রুক্মিণীবাবু,—শুনেছেন এখানটায় আগে পূজো হ'ত। যারা করত তারা তাঁর কাছে এলও না, তিনিও নূতন লোক, কাকে ডাকেন, কাকে বলেন···

বড় মেয়েটি একটু পাশে মুখ তুলে বললে, 'যা আপনার "Out" লেখা গেটের ওপরই!···Get out-ই তো।'

তিনজনেই হেসে উঠল। রুক্মিণীবাবু হাসির মধ্যেই বললেন, 'না, ওটা তুলে দিতে হবে···'

ছোট মেয়েটি বললে, 'আর অবশ্য থাকলেও দোষ নেই ; আমাদের মানেটা তো বোঝা রইলই…'

হাসিটা গড়িয়েই চলল।

দশ নয়, পাঁচ তো নয়ই, পনেরটি টাকা দিলেন রুক্মিণীবাবু, তাও যথেষ্ট ভদ্রতা ও সঙ্কোচের সঙ্গে মিষ্ট করে,—নূতন বাসায় এসেছেন—অনেক খরচ হয়ে গেছে এক চোট…

বলেন : যাবেন বৈকি—সাহিত্য-বাসরের জন্যেই নয়, তাঁর যোগ্যতাই বা কি সেদিক দিয়ে ?—তবে মার দর্শন তো করতে হবে—বছরে এই একটিবার… হিন্দুর ছেলে…

—যেমন বলতে হয় আর কি।

বড় মেয়েটি প্রশ্ন করলে, 'কাল তাহলে আমরা এসে নিয়ে যাব আপনাকে।'

সেদিকেও যেমন বলতে হয় তাই বললেন রুক্মিণীবাবু, 'না, কিছু দরকার নেই, ঠিকানাটি তো রয়েছেই…আপনারা আবার কাল বড় বেশি ব্যস্ত থাকবেন ওদিকে—আমি নিজেই ঠিক সময়ে গিয়ে উপস্থিত হবো'খন—সাড়ে আটটা তো ?'

'আমরা তাহলে ঐ সময় ম্যারাপের গেটের সামনে প্রতীক্ষা করব।'

গেটের সামনে করছিল প্রতীক্ষা চার-পাঁচটি মেয়ে ; তার মধ্যে চেনা কিন্তু একটি—কালকের সেই ছোট মেয়েটি, তাও যেন মনে হ'ল কালকের চেয়ে মুঠোখানেক বেশি ছোটই। সেই প্রগল্‌ভা বড়-মেয়েটি নেই।

তাকে দেখলেন পরে। মেয়েদের সঙ্গেই এগিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে দুটি টাকা প্রণামী ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—পাঁচ-ছ'জন ছেলে নমস্কার করলে—সেদিনকার সব ক'টিই আছে, তার মধ্যে একটি যে ঐ লাজুক মেয়েটির দাদা সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় রং, মুখশ্রী সব ঐরকম, শুধু দাদা বলেই মুঠোখানেক বড়।

নূতনের মধ্যে আর একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে সেদিন ছিল না, তবে কালকের সেই বড় মেয়েটির সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মেয়েলি-মেয়েলি চেহারা, ততখানিই উঁচু, সেইরকমই চটুল দৃষ্টি।

সেই মেয়েলি কণ্ঠস্বরও বললে, 'এবার আমাদের সাহিত্যিক আসরটা··· ঐদিকে···এই যে এই দিক দিয়ে রাস্তা···'

রুক্মিণীবাবু শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'না, শরীরটা আমার ঠিক নেই···শুধু একবার প্রতিমা দর্শন করতে···নেহাত একদিনের পুজো···'

ঠাণ্ডার মধ্যেও আঙুল দিয়ে যে-পরিমাণ কপালের ঘাম মুছে ফেললেন, তাতে শরীরের অসুস্থতার কথা অবিশ্বাস করা যায় না।

সবাই পেছনে পেছনে গিয়ে মোটর পর্যন্ত পৌঁছে দিলে।

আলট্রা

একটি নিতান্ত ছোট রেল-স্টেশন। কলকাতার গাড়িটা যখন এসে দাঁড়াল, একজন বেশ সুসজ্জিত যুবক প্রায় জনশূন্য প্লাটফর্মে নেমে কতকটা যেন দিশেহারা হ'য়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল। যেদিকে চাওয়া যায়, ফাঁকা মাঠ ; ভদ্র যানবাহন বলতে কিছুই নেই, শুধু খানিকটা দূরে একটা ছইওলা বলদগাড়ি দাঁড়িয়ে, বলদ দুটো খোলা, শীতের রোদে বসে ঝিমোচ্ছে, গাড়োয়ান নজরে পড়ে না।

যুবক একবার কব্জিটা ঘুরিয়ে হাতঘড়িটা দেখলে, কি ভেবে নিজের পরিচ্ছদের ওপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে, তারপর গটগট করে বলদ-গাড়িটার দিকে এগুল।

গাড়োয়ানটা ছইয়ের মধ্যে গুটিসুটি মেরে ঘুমুচ্ছিল, ডাক দিতে ধড়ফড়িয়ে উঠে নেমে দাঁড়াল। যুবকটি প্রশ্ন করলে, 'ভাড়া যাবি ?'

উত্তর হ'ল, 'এজ্ঞে না, বাড়ির গাড়ি।'

যুবক একবার পেছনে স্টেশনের দিকটা দেখে নিলে। আবার প্রশ্ন হ'ল, 'কোন গাঁ ?'

'রূপসালি।'

'রূপসালি ?...তা এক কাজ কর না ; যার আসবার কথা তিনি তো আসেননি দেখছি, কিছু বকশিশ ক'রে দোব, নিয়ে চল না, আমিও ঐদিকেই যাব...না হয় গাঁয়ের খানিক আগেই নামিয়ে দিবি...'

'এজ্ঞে, ঐ যে এসে গেলেন তিনি।'

দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে স্টেশনের দিকে আবার ঘুরে চাইলে যুবকটি। প্লাটফর্মের ধারে কতকগুলা আগাছার ঝোপ, তারই আড়াল থেকে বেরিয়ে একটি মেয়ে গটগট ক'রে এদিকে এগিয়ে আসছে। একেবারে আধুনিক প্রথায় সজ্জিত ; পায়ে হীল-তোলা স্ট্র্যাপ-সু, পরনে কালো ফিতে-পাড়ের শাড়ি, গায়ে একটা মেরুন রঙের স্কার্ফ জড়ানো, বাঁ-হাতে একটি ব্যাঙ্গল্, তার ওপরেও কালো রঙের একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ ঝুলছে ; মাথায় এলো খোঁপা। এ যা

জায়গা, এখানে একটু বিস্মিত হ'য়ে থাকতেই হবে চেয়ে ; সেইজন্যে যুবকটি চোখ ফেরাতে পারছিল না, তারপর মেয়েটি খানিকটা এগিয়ে আসতে তার বিস্ময়টা যেন আরও গেল বেড়ে। মেয়েটিও ভ্রূ-দুটি চেপে একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর সেইরকম নিঃসঙ্কোচ পদক্ষেপেই এগিয়ে এসে হাত তুলে নমস্কার করে প্রশ্ন করলে, 'আপনি এখানে ?'

যুবক প্রতিনমস্কার করে উত্তর করলে, 'আমারও তো ঐ প্রশ্ন।'

'আমার এখানে বাড়ি, রূপসালিতে'—সামনে যে কাঁচা রাস্তাটা একটু একটু এঁকেবেঁকে মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে তার শেষ প্রান্তের দিকে চাইলে।

যুবক একটু ভেবে নিলে, তারপর অল্প হেসে বললে, 'আমার অবশ্য বাড়ি নয়, তবে যাব ঐদিকেই। কি নামটা গায়ের—রূপসালির পরেই ?'

'মইমপুর ?'

'হ্যাঁ ঠিক, মইমপুর, একটু যেন কিরকম নামটা।'

'কোনও আত্মীয় থাকেন ?—কে ?'

যুবক একটু যেন আবাব ভেবে নিলে, বললে, 'আত্মীয়ই···তবে···'

এমনভাবে ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে হাসিটা একটু বাড়িয়ে দিলে যে, আত্মীয়টি কে সেটা বুঝতে আর বাকি রইল না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আবার প্রশ্ন করলে, 'কতদূর এখান থেকে রূপসালি ?'

জানাও গেল, অথচ স্পষ্ট ক'রে জানাতেও চায় না, সুতরাং ও-প্রশ্নটা আর চালালে না মেয়েটি। তবে ঠোঁটের কোণে যে একটু হাসি ফুটল সেটাকে লুকুবার বেশি চেষ্টাও করলে না। উত্তরটিও সেই ভাবেই দিলে—'আত্মীয়ের বাড়ি অথচ কতদূর তা জানেন না ?'

হাসিটি আরও একটু স্পষ্ট হয়েই গেল।

উত্তর হ'ল, 'এমনও তো হ'তে পারে, এখানকার বাড়িতে এই প্রথম আসা।'

'তা অবশ্য পারে···'

—ওটুকু হাসি আর মুখ থেকে মিলুতে চাইছে না।···আরও কারণ তো থাকতে পারে যার জন্যে পথের আন্দাজ না থাকবারই কথা ; যার জন্যে পথের দূরত্ব যেতে হয় ভুলে।

ঐটুকু হাসিতেই তার একটু ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্নটার উত্তর দিলে, 'দূর··· কতটা হবে রে রূপসালি এখান থেকে ?'

গাড়োয়ানকে প্রশ্নটা করেই খিলখিল ক'রে হেসে উঠলে, তার মধ্যে বললে, 'থাক, তোদের আবার ডালভাঙা কোশ, উনি ভড়কে যাবেন।···হবে—এই ধরুন—পো তিনেক—এক কোশও পুরো নয়।'

যুবক হাতটা উল্টে আবার ঘড়িটা দেখলে, প্রশ্ন করলে, 'লাগবে কতক্ষণ—এক ঘণ্টা ? তাহলে পা চালিয়ে দিই···'

'কেন, গাড়িতে যাবেন না ? আপত্তি আছে বলদগাড়িতে ?'

'নাঃ, বলদগাড়ি বলেই যে আপত্তি তা নয়, তবে···'

—ছইয়ের ভেতরে নজর গিয়ে যেন আপনি-আপনিই পড়ল।

মেয়েটি একেবারে গাড়োয়ানটাকে প্রশ্ন করলে এবার, 'হ্যাঁরে, তোর আপত্তি আছে—উনি যদি যান ?'

—তিনজনের মধ্যে আসল যার আপত্তি হওয়ার কথা তাকে এইভাবে বাদ দেওয়ার ধূর্তামিতেই হাসিটা আবার ছলছলিয়ে উঠল। গাড়োয়ান আরও সেটাকে দিলে বাড়িয়ে, বললে, 'এজ্ঞে, বলদ আমার আরও দশজন চাপালে "লা" বলবেনি।'

'ঐ নিন, বলদের পর্যন্ত আপত্তি নেই···'

—একটু সরে গিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে মুখে রুমাল চেপে দিলে।

কলেজে তৃতীয় বার্ষিকের ছাত্রী নন্দিতা রায়। এক ক্লাসের নয়, সমর হচ্ছে পঞ্চম বার্ষিকের। দেখাশোনা যে হয় তা ডিবেটিং রুমে, বা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে। নন্দিতা স্মার্ট ; মেয়ে বলেই যে কোন কিছুতে হ'টে দাঁড়াতে হবে এমন সংকোচ ওর দেহ-মনে কোথাও নেই, তবে এতটা স্মার্ট জানা ছিল না সমরের।

থাকবে কোথা থেকে ? মেলামেশা তো নেই, দেখাশোনারও তো সীমানা বাঁধা, তার ওপর দু'টো বছরের ব্যবধান, একটু সমীহেরই ব্যবধান। তা ভিন্ন কলেজও তো বাড়ির মাঠ-ঘাট-স্টেশন নয়।···এখানে, এক হিসাবে গৃহের পরিধির মধ্যেই এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কলেজের স্মার্টনেস যদি একটু প্রগল্ভতার কাছাকাছি এসে পড়ে থাকে, সেখানকার পরিচয় যদি একটা সাময়িক সখ্যের স্তরেই উঠে এসে থাকে তো আশ্চর্য হবার আছে কি কিছু ?

এইসব কথাই ভাবছিল সমর। যে ভাবে, বিশ্লেষণ করে সে বেশি কথা কইতে পারে না, ওর তাই হয়েছে। গল্প হচ্ছে—তাতে প্রতি মুহূর্তেই নন্দিতা রায় আরও অভিনব, আরও প্রগতিশীলা, আরও মুক্তছন্দা হ'য়ে উঠছে ওর দৃষ্টির সামনে, ওকে বিস্মিত করে দিচ্ছে। কথা কইছে সমর, হাসছেও কিন্তু তলে তলে একটা অনুসন্ধান চলেছে—কেমন ক'রে এটা হয়? মেয়েদের মধ্যে কি বেশি ক'রে হয়—আজকালকার মেয়েদের মধ্যেই কি বেশি করে হয়? না, মেয়েদের মধ্যে হ'লে আরও দেখায় বেশি?···কূল পাচ্ছে না।

লাগছে কিন্তু বেশ, ওর লাগেই বেশ। ওর স্বভাবটাই ঐরকম—কোন কিছুই কুঁকড়ে-মুকড়ে থাকবে—অন্ধকারকে নিজের বুকে আঁকড়ে ধ'রে, ওর বরদাস্ত হয় না। ফুটুক, একটি একটি করে সব দল ক'টি ফুটে উঠুক, আলো এসে পড়ুক রন্ধ্রে, ও চায় এই।

ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে হু-হু ক'রে শীতের হাওয়া আসছে; ছইয়ের গায়ে পড়ে সাঁ সাঁ করে যে আওয়াজটা উঠছে তাতেও একটা বাঁধনহারা মুক্তির উল্লাস। এর সঙ্গে মিল আছে নন্দিতার—কেমন ক'রে যেন চারিদিক দিয়েই,—তার নিঃসঙ্কোচ হাসিতে বিদ্রূপে, তার এলো খোঁপার স্খলিত কেশগুচ্ছের অবাধ্যতায়, তার কিসে নয়? ওরা মুখোমুখি হয়ে ছইয়ের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে, গল্প হচ্ছে—কলেজ, প্রফেসার, ডিবেট্,—একদিন যে সমরের সঙ্গেই তর্কটা বেশি জোর হয়ে উঠেছিল তার কথা। মেয়ে বন্ধুরা বলেছিল—সমরবাবু শেষের দিকে একটু ইচ্ছে করেই ঢিলে দিলে তাই, যদি খুলত মুখ তো নন্দিতাকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিত।···এলোমেলো গল্প সব।

'আচ্ছা সত্যি তাই? ইচ্ছে ক'রেই আর শেষের দিকে মুখ খোলেননি সেদিন? বলুন না,—যারই হারজিৎ হোক, এখানে তো লজ্জা নেই।'

—বড় অদ্ভুত লাগছে নন্দিতাকে, গল্প করতে করতে হঠাৎই প্রশ্নটা ক'রে হাসিমুখে চেয়ে রইল সমরের দিকে।

সমর হাসিমুখেই উত্তর করলে, 'মেয়ে হয়েও সামান্য একটা কথা কেউ ধরতে পারলে না?'

'কি কথা?'

'মেয়েরা যে পরিমাণে মুখ খোলে পুরুষদের মুখ সেই পরিমাণে বন্ধ হয়ে আসে না?'

'তার মানে মেয়েরাই বেশি ঝগড়াটে।'

—হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, মুখটা ভার-ভার। এও ভালো লাগে, রূপেরই রূপান্তর তো; তবু কি ব'লে গাম্ভীর্যটা নষ্ট করবে সেই কথাই ভাবছিল সমর, তার আগেই নন্দিতা আবার হেসে উঠ্‌ল খিলখিল ক'রে। কিছু নয়, গাম্ভীর্যটাকে ধ'রে রাখতে পারলে না; সেই কথা বললেও হাসতে হাসতে, 'কী জ্বালা বাবা! একটু যে রাগ করে থাকব তারও উপায় নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে এটাকে কাজেও লাগালে, বললে, 'এই দেখুন, এও একটা প্রমাণ যে আমরা ঝগড়াটে নয়, রাগ পুষে রাখতে পারি না।'

'তাই কি? বরং মেয়েদের আর একটা স্বভাবের কথা এনে ফেললেন আপনি!'

'কি আবার সেটা?······ব্যস্, আরম্ভ হ'য়ে গেল ডিবেট্!'

সমর চুপ করে রইল; শুধু হাসতে লাগল মিটিমিটি।

'কী বলুন না।'—তাগাদা দিলে নন্দিতা।

'সব কথা কি বলা চলে?···যদিও আপনার সম্বন্ধে খাটে না কথাটা—অন্তত এখন পর্যন্ত খাটে না।'

কি একটা আন্দাজ করে চোখদুটো একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নন্দিতার, বললে, 'তবে আর কি, বলে ফেলুন। বড্ড সঙ্কোচ আপনাদের, এদিক দিয়ে বরং আমরা ভালো; একটা কথা বলবেন তাতেও···'

'নিজের সম্বন্ধে হ'লে আমাদের সঙ্কোচ থাকে না।'

'নাঃ, থাকে না! মইমপুরে কোথায় যাচ্ছেন সেটুকু পর্যন্ত স্পষ্ট ক'রে বলতে পারলেন না···আন্দাজে ধরে নিতে হ'ল আমায়।'

সমর একটু যেন কি ভাবলে, তারপর হেসে বললে, 'কেউই বলতে পারত না।'

'নাঃ, শ্বশুরবাড়ি যাবে এ একটা মস্ত না-বলবার কথা!'—কথাটি স্পষ্ট ক'রে দেবার জন্যেই নন্দিতা আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল; তারই মধ্যে চোখ তুলে তুলে দেখতে লাগল, জানাজানি হয়ে যাওয়ায় সমরের মুখের ভাবটা কেমন হয়। সমর সেই রকম হাসতে হাসতেই বললে, 'কথাটা এর চেয়েও না-বলবার মতন হ'লে?'

নন্দিতা হাসছিলই, হঠাৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেল, হবার চেষ্টা করলে

বলাই উচিত, কেননা ঠোঁটে একটু হাসি লেগেই রইল। চোখ দুটো কোণের দিকে তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বেশ একটু কি ভাবলে, যেন কোথায় একটা দ্বিধা রয়েছে, মন স্থির করে উঠতে পারছে না; তারপর সমরের মুখের ওপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বললে, 'তবুও যায় বলা—অন্তত আমি পারি। এই তো, কি জন্যে যাচ্ছি বাড়ি…'

'কি জন্যে?'—ওর থামার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটা লঘু কৌতূহলে আপনা হ'তে বেরিয়ে গেল সমরের মুখ দিয়ে।

নন্দিতার প্রগল্‌ভতা একটু ধাক্কা যেন খেলেই; এতক্ষণে দারুণ দ্বিধায় পড়ে একটু যেন অপ্রতিভ হয়েই দাঁতে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল। ক'টি উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত বেরিয়ে গেল দুজনের মধ্যে দিয়ে, তাবপর নন্দিতা আবার কৌতুকদীপ্ত দুটি চোখ তুলে বলে উঠল, 'কিন্তু, বাঃ, আপনি খুব চালাক, দিব্যি গোড়ার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছেন কথার ফিকড়ি বের ক'রে ক'রে—সেই যে মেয়েদের আর একটা কি স্বভাবের কথা বলছিলেন—'

'বলতে পারি, একটা সর্তে…'

'অর্থাৎ আমিও একথাটি বলব, এই তো? বেশ, তা তো নিজের হ'তেই বলেছি আমি, সে বলতে আটকাবে না আমার।'

সমর আগেকার প্রসঙ্গটা একটু ভেবে নিলে, বললে, 'কথাটা কিছুই নয়, বলছিলাম—মেয়েরা যে ঝগড়াটে নয় এমন নয়, তবে বাপের বাড়ি আসবার সময় ওরা ঝগড়াটা শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসে…'

—হেসে আর একটু জুড়ে দিলে, 'মানে ননদের কাছে আর কি, ট্র্যাডিশন্ তো তাই।…কিন্তু তাও বলেছি—ব্যক্তিগতভাবে আপনার এতে রাগ করবার কিছু নেই, মানে, এখন পর্যন্ত।…ওকি, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে?'

'ভাবছি—'

—আবার হাসিটা একটু ছলছলিয়ে উঠল, বললে, 'ভাবছি সব ঝগড়া আপনার কাছেই শেষ করে ফেলেছি—ডিবেট্, এখানেও—ননদের কাছে জমা দিয়ে আসবার মতন হাতে কী থাকবে?'

'তার তো দেরি আছে, ততদিনে আবার জমবে। সাপের…মানে—মানে হরিণের সিং কেটে দিলে আবার তো গজায়।'

'সাপের বিষই বলুন না।'—আবার হেসে উঠল একটু।

বোধ হয় ভালো জবাবের অভাবেই সমরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'মেয়েদের সম্বন্ধে হরিণের কথাই বেশি মনে হয়, তাই…কিন্তু এই দেখুন! আমাকে যার দোষ দিচ্ছিলেন সেই চালাকি আপনিও ধরেছেন—সর্তের কথাটা চাপা দিচ্ছেন…'

নন্দিতা গম্ভীর হয়ে গেল, ভ্রূ-দুটো চেপে মাথাটা দুলিয়ে খুব নিরাসক্ত, সহজ স্বরে বললে, 'মোটেই নয়। আপনিই বরং বাধা দিয়ে পাড়তে দিচ্ছেন না কথাটা—কখনও সাপ বলে চটিয়ে দিচ্ছেন, কখনও হরিণ বলে ভুলিয়ে দিচ্ছেন—নইলে আমি তো আরম্ভই করেছিলাম—ননদের কথা তুলে।'…

কোন কারণ না থাকলেও সমরের দৃষ্টিটা আপনা হতেই নন্দিতার কপালে গিয়ে পড়ল। নন্দিতা সেইরকম সহজ কথাচ্ছলেই বললে, 'না, ননদ এখনও মাথায় ওঠেন নি, তবে উঠবেন শীগ্‌গিরই। আজ আমায় দেখতে আসছেন… স্বয়ং তাঁর ভাই।'

এরপর কথাবার্তা একটু বন্ধ হয়ে গেল। নন্দিতা ভাবছে—একটু কি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ঝোঁকের ওপর? আজ অনেকগুলি ব্যাপার একত্র হয়েছে—মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে শীতের এই দ্বিপ্রহর, সামনে বাড়ি, বাড়িতে ঐরকম একটি অনুষ্ঠান, যাতে জীবনের মধুরতম স্বপ্নটির স্পর্শ রয়েছে, সবার ওপর নিতান্ত দৈবাৎই কলেজের একজন সঙ্গী লাভ; এক ক্লাসের না হয়েও নানা কারণে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা তো রয়েছেই, তার ওপর নানা আলোচনার তর্ক-বিতর্কে খানিকটা মনজানাজানিও—একটু উন্মুক্ত হয়েই পড়েছে মনের কপাটটা। আরও একটা কথা আছে—যার সঙ্গে বোধ হয় এই শেষ আলাপই, আর হবেই না দেখা—তার কাছে সঙ্কোচ অত তো থাকেও না।

তবুও ভাবছিল নন্দিতা। ফসল-কাটা মাঠের হাওয়া, কখনও বাড়ছে, কখনও একটু কমছে—ছইয়ের ভেতর একটু রোদ ঢুকছে, গায়ের ওপর তার মিষ্ট পরশ—গ্রামের সীমানা এসে পড়বে এবার—গাড়োয়ানটি ভুল করে কি একটা গান ধরতে গিয়েছিল, সামলে নিয়ে বলদের ল্যাজ-মোড়ায় জুড়ে দিলে,—নন্দিতা বাইরের দিকে মুখ ক'রে ভাবছে—তবু কি হয়েই গেল একটু বাড়াবাড়ি?

বার দুই আড়চোখে ভেতরের দিকে চেয়ে দেখলে, সমর চোখ দুটো নামিয়ে মিটিমিটি হাসছে; ওর যা মুদ্রাদোষ—ডান হাতের আঙুলগুলো দিয়ে

ডান চোখের ভ্রূটাকে ক্রমাগত টেনে টেনে যাচ্ছে—ডিবেটের ভেতরে একটা কোনরকমের উচ্ছ্বাসের মতো এসে পড়লে করে—লক্ষ্য করেছে নন্দিতা।

এর পরে যা কথাবার্তা হ'ল নন্দিতার দিক থেকে তা যেন কতকটা মরীয়া হয়েই, যা আরম্ভ করেছে তা যেন সুসামঞ্জস্যের সঙ্গে শেষ করবার সংকল্প নিয়েই, যদি লজ্জা কিছু হয়েই থাকে তো আর একটু প্রগল্‌ভতা দিয়ে সেটাকে চাপা দেবার জন্যেই।

এক সময় হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে বললে, 'বাঃ, এ দিব্যি হ'ল তো। আমি কোথায় একটু প্র্যাকটিস্ করছিলাম, আপনি একেবারে কথাই বন্ধ করে দিলেন।'

'কি প্র্যাকটিস্?…কথা কেন বন্ধ করব? লাভ সেখানে আমারই বেশি…'

রসিকতায় যে একটু বাড়াবাড়ি হ'ল এবার সেটা গায়ে মাখলে না নন্দিতা, বললে, 'প্র্যাকটিস্ করছিলাম—আধুনিকতা। যিনি দেখতে আসছেন তাঁর শখ পাত্রী বেশ আধুনিকা হওয়া চাই—স্পষ্ট লেখেননি, হিন্ট দিয়েছেন—তবে তা খুবই স্পষ্ট—এই ধরুন, আজ আপনাব যেমন আত্মীয়ের হিন্ট—মডার্ন—আলট্রা মডার্ন—যতদূর সম্ভব এই প্রগতির যুগে—কিছুতে আপত্তি নেই তাঁর…'

'সত্যি নাকি?'

এবারে বেশ যেন প্রাণ খুলে হেসে উঠল সমর।…বোধ হয় ঐ জন্যেই—আর তো যাত্রা শেষ হয়ে এল, এই হয়তো শেষ দেখাও, দবকার কি আর রেখে-ঢেকে চলার?

প্রশ্ন করলে, 'কোথা থেকে আসবেন তিনি? এসে গেছেন? …যদি আমি দেখতে আসি আপত্তি আছে আপনাদেব—ফ্রেণ্ড হিসেবে?'

'সকালে এসে গেছেন।…না, আমাদের আপত্তি কি আর, আমার তো নেই-ই…তবে তিনি যদি মনে করে বসেন…'

'রাইভেল্?'—কথাটুকু পূরণ করে দিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল সমর।

'ঠিক তাই, আপনাদের তো গুণে ঘাট নেই।…তবু আসবেন, ও ভয় করাও তো আলট্রা মডার্নের লক্ষণ নয়। আসবেন নিশ্চয়।…অন্তত একটা দেখবার জিনিস হবে।'

'মানে?'—হাসছেই সমর; একটি গল্পের যেন ক্লাইমেক্স; খুব কৌতুক অনুভব করছে।

'বুঝছেন না ?···একেবারে আলট্রা মডার্ন হয়ে উপস্থিত হব বাবার ভাবী বাবাজীর কাছে—যদি হন। একেবারে এই মেক্-আপ আমার ; এই জুতো, এই শাড়ি, এই স্কার্ফ, এই খোঁপা, এই ভ্যানিটি-ব্যাগ···'

'চলনটাও বোধ হয় প্র্যাকটিস্ই করছিলেন—স্টেশনে যেমন দেখলাম···'

—খুব হাসি চলছে, দুজনেরই।

'ঠিক তাই। আরও একটু সোজা হয়ে চলব মনে করছি—শুধু একটা জিনিস ঠিক করে উঠতে পারছি না—সামনে উপস্থিত হয়ে শেক-হ্যাণ্ড করবার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দোব কিনা, আর ইণ্টারভিউয়ের সময় ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে লিপস্টিক আর পাফ্‌টা বের করে একটু···'

দুজনের প্রচণ্ড হাসির মধ্যেই গাড়োয়ান মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'কোন্ পথ দিয়ে যাই দিদিমণি ? —বোষ্টমপাড়াটা হয় শীগ্‌গির, কিন্তু বড্ড ভাঙাচোরা।'

নন্দিতা ব্যস্ত হয়ে উঠল ; বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়ে বললে, 'গাঁয়ের মধ্যে এসে গেলুম যে! তাহলে? আমায় পৌঁছে দিয়ে ওদিক দিয়েই আপনাকে না হয় নিয়ে যাবে ? রাস্তাটা জানা আছে তো ?'

'তাই না হয় যাক।'···রাস্তা জানা না থাকলেও নাম জানা তো।'

'কিন্তু···না, থাক, আমি এটুকু বরং হেঁটেই যাই। আপনাকে সোজাই নিয়ে যাক।'

—তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল।

একটু ভেবে নিতে যা দেরি হ'ল তাতে গাড়িটা খানিক এগিয়ে গেছে। থামিয়ে নেমে এল সমর। বাড়ির পথে নন্দিতাও খানিকটা এগিয়েছে, ডাকলে, 'শুনুন।'

নন্দিতা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আমি সকালের গাড়িতে আসতে পারিনি।'

'তার মানে ?···কোথায় আসতে পারেননি ?'

'আপনাদের বাড়ি ; পাত্রী দেখতে।'

'আপনি !!'—হাঁ ক'রে চেয়ে রইল। অত যে কথা তার একটি নেই মুখে।

'অবশ্য আমিও জানতাম না যে আপনাকেই আসছি দেখতে।···তাহলে চলুন গাড়িতে।'

'না···সেকি !···আপনি···তা···'

'তাহলে একলাই যান গাড়িতে। আমার জন্যে তো যায়ও নি গাড়ি এখন।...গিয়েছিল সকালে।'

'না, না, আপনি যান...বাঃ...আর আপনিই এসেছেন!'

মুখটা রাঙা হয়ে উঠেছে, কপালে ঘাম জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু। ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাইলে নন্দিতা, ত্রস্ত হরিণীই একটি—এইটুকুতেই! তারপর খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ির ওপর নজর পড়ল, তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আমি বরং সইযের কাকিমার বাড়ি যাই—সেখানে বলবেন, কেউ সঙ্গে আসেনি—গাড়োয়ানটাকেও বলে দেবেন...দয়া করে... দয়া করে একটু সামলে নেবেন...'

কী সে করবে, কী বলবে যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না।

সমব হেসে বললে, 'তাহলে কিন্তু হ'ল না।'

'কী হ'ল না?'—সেইরকম বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে চাইলে নন্দিতা।

'বলছি শেষরক্ষা করতে পাবলেন কৈ? কাজেই আমায় বলতে হবে— আমি চাচ্ছি আলট্রা মডার্ন, তা পাত্রী মনে হয় মডার্নও নয়।'

সবটুকু শেষ হবার আগেই নন্দিতা একটু হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েই পা চালিয়ে দিলে।

ওরা ও আমরা

দুইজনেই প্রায় একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল; নিমাই বলিল, 'নড়ন-চড়ন!' ঘুটু বলিল, 'নট্-নড়নচড়ন নট্-কিছু!' নিমাই তাক করিয়া আঁটের গুলি ছাড়িয়া দিল।

গুলিটা ঘুটুর গুলিতে লাগিল না বটে, তবে গুলির সংলগ্ন একটা কুটোকে আঘাত করিয়া যাওয়ায় ঘুটুর গুলিটাও নড়িয়া উঠিল। নিমাই বলিল, 'টোয়েন্টি; খাটো, ঘুটু।'

ঘুটু বলিল, 'আমি নট্-নড়নচড়ন নট্-কিছু বলেছিলাম।'

নিমাই বলিল, 'আমি আগে নড়নচড়ন বলে তবে আঁটি ছেড়েছি।'

ঘুটু বলিল, 'কখনও নয়, আমি আগে বলেছি।'

'আলবৎ নয়, খাটান দিয়ে যাও। তিনবার উপরোউপরি হেরে বেইমানি করতে আরম্ভ করেছিস!'

'খবরদার বেইমানির নাম নিবিনে নিমে! তুই কখন আগে বললি রে? মিথ্যেবাদী কোথাকার!'

'তুই মিথ্যেবাদী কাকে বললি রে?'

'তুই বেইমান কাকে বললি?'

'আলবৎ বেইমান, হেরো বেইমান। খাটান্ না দিয়ে এক পা এগুতে পারবি নি।' নিমাই আগাইয়া গিয়া ঘুটুর পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

ঘুটু তাহার পানে তাচ্ছিল্যের সহিত বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'লে লে, ভারি পথ আটকানেওয়ালা হয়েছিস। এই বাড়ালাম পা, কর কি করবি, দেখি কত মুরদ।'

নিমাই তাহার কোমরের কাপড়টা ধরিয়া বলিল, 'খাটান্ দিয়ে যা বলছি বাপের সুপুত্তুর হয়ে।'

আর বিলম্ব হইল না। 'তুই বাপ তুললি কাকে রে?'—বলিয়া দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ঘুটু একটা ঝটকা মারিয়া একেবারে নিমাইয়ের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর ঝাপটা-ঝাপটি, কিল, চড়, খামচানি; একবার এ ওপরে যায়,

একবার ও ওপরে ঠেলিয়া আসে। ঘামে গায়ের ধূলা কাদা হইয়া উঠিতেছে, নিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে দ্রুত আর ঘন, ফোঁসফোঁসানির মধ্যে এক আধটা যা চাপা কথা বাহির হইতেছে তাহার সামনে 'বাপের সুপুত্তুর' অতি ভদ্র উক্তি।

নিমাই ওপরে ছিল, ঘুটুকে বাগাইয়া নীচে ফেলিয়া একবারে তাহাকে খেঁতো করিবে, হঠাৎ নিজেই চিৎকার করিয়া উঠিল। ঘুটু নীচে থাকিয়া তাহার পাঁজরার কাছের মাংসটা কামড়াইয়া ধরিয়া এমন চাপ দিয়াছে যে, তুলাভরা গেঞ্জি গায়ে না থাকিলে মাংসটা তাহার মুখের মধ্যে গিয়া পড়িত। একটা ঝাঁকানি দিয়া ছাড়াইয়া নিমাই চিৎকার করিতে করিতেই তাহার কাঁধে পিঠে গোটাকতক ঘুষি কশাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়িমুখো হইল।

ঘুটু ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়াই প্রথমে হাতের টল-গুলি দুইটা প্রাণপণ শক্তিতে নিমাইয়ের পানে ছুঁড়িল। উগ্র রাগের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় একটা থান ইঁটের আদ্ধা তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় পিছনে খানিকটা দূরে একটা খনখনে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কান্না কার রে, ঘুটু?'

ঘুটু একবার ফিরিয়া দেখিয়াই দারুণ আতঙ্কে নিজের মনেই, 'পিসিমা-রে!' বলিয়া হাতের ইঁট ফেলিয়া ছুট দিবে, কড়া হুকুম হইল, 'দাঁড়া বলছি, এক পা নড়েছিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন—'

ঘুটু নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া তাড়াতাড়ি বাকি ধূলা-ময়লা ঝাড়িয়া লইতেছিল, ততক্ষণে পিসিমা হনহন করিয়া কাছে আসিয়া গিয়াছেন, গলার স্বরটাকে যতটা সম্ভব শান্ত, অবিচলিত রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কি হয়েছে শুনি?'

ঘুটু মাটির পানে চাহিয়া বলিল, 'কিছু নয়।'

পিসিমা চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'হয়েছে কিছু, একশো বার হয়েছে। তুই নিমের কপাল ফাটিয়ে দিয়েছিস, নইলে সোনার চাঁদ ছেলে, ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না, অমন পাড়া মাথায় করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল কেন?... বলি, তোমার চোখে জল দেননি একচোখো ঠাকুর? গতর যে চুর হয়ে গেছে এদিকে! ভাব করে একসঙ্গে খেলা করতে গিয়ে কতরকম বজ্জাতি শিখছ, আর ঐ ঢঙের মিছে কান্নাটুকু শিখে নিতে পারনি? এক কান্নাতে যে শত দস্যিবৃত্তি ঢাকা পড়বে, এ বুদ্ধিটুকু একচোখো ভগবান তোমায় দেননি

কেন? হাড় গুঁড়ো করে দিলেও ওর মারে তোমার চোখে জল আসবে না তো, ও যে নিমাই ভাই!…চল্ হতভাগা, বাড়ি চল্। আর এই দেখ কান্না আসে কিনা, দেখ তবে—'

কান্না না শিখিতে পারার জন্য এই নিদারুণ ধিক্কারের উপর গোটাকতক চড় খাইয়া ঘুটু ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসিমা তাহাকে হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে বাড়ির দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। মন্তব্যের উগ্রতার সঙ্গে তাঁহার নিজের গলা এদিকে ধাপে ধাপে উঠিতেছে। সমস্ত পাড়াটা যেন এক মুহূর্তেই গমগম করিয়া উঠিল।

২

ঠিক গলি নয়, তবে রাস্তাটা অপরিসর। এই রাস্তার এক দিকে নিমাইদের বাড়ি, অপর দিকে ঘুটুদের। সামনাসামনি নয়, দুইখানা বাড়ির মাঝখানে খানচারেক অন্য বাড়ি আব একটা এঁদো ডোবা। ডোবাটার পিছনে নিমাইদের বাড়ি। রাস্তা হইতে নামিয়া কচু, আশশ্যাওড়ার পাতলা জঙ্গলের মধ্য দিয়া পৌঁছিতে হয়।

নিমাইয়ের জ্যেঠাইমা উঠানে বড়ি দিতেছিলেন, হাত থামাইয়া বলিলেন, 'যেন নিমাইয়ের গলা শুনছি না? দেখ তো রে বেরিয়ে।'

অন্য কেহ বাহির হইবাব পূর্বে তিনি নিজেই বড়ির হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। নিমাই রাস্তা ছাড়িয়া নীচে নামিয়াছে; জ্যেঠাইমা দরজায় দাঁড়াইয়া একটু কান খাড়া করিয়া কি যেন শুনিলেন, তাহার পর গলা উঁচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'বলি, আবার কি হ'ল? একদণ্ড আমায় তোরা সুস্থির হয়ে থাকতে দিবি কিনা বল্ দিকিন?'

নিমাই চিৎকারের সঙ্গে নাকী সুর মিশাইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিল—'লক্ষ্মীছাড়া ঘুটে, বেইমান, খাটান্ দেবে না; উলটে—'

জ্যেঠাইমার গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল—'আবার তুই ঘুটুর সঙ্গে খেলতে গিয়েছিলি? যখনই নেত্য ঠাকুরঝির বাজখেঁয়ে গলা শুনেছি তখনই বুঝেছি একটা কিছু ঘটেছে। তোকে না পইপই করে বারণ করেছিলাম, 'ওরে নিমাই, ও আদুরে দুলালের কাছে যাস্ নি। তা শুনবে? আবার কান্না! বেরো, বেরো তুই; আর বাড়িমুখো হবিনি।'

নিমাই সেইরকম সুরেই খিঁচাইয়া উঠিল, 'ও আসে কেন ঘাড়ে পড়ে? সেদো! সেদে ভাব করে এসে খেলায় বেইমানি! বললে, উলটে কামড়ে দেবে, খামচে রক্ত বের করে দেবে!'

জ্যেঠাইমা দুয়ার ছাড়িয়া হনহন করিয়া রাস্তার ধারে ডোবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেয়েদের কণ্ঠে সপ্তমের পরেও একটা পর্দা আছে, সেই পর্দায় গলা তুলিয়া বলিলেন, 'ওরে অলপ্পেয়ে, তুই যে জ'ন্মেই মা খেয়ে বসে আছিস, তোকে কি একটা মনিষ্যির মধ্যে ধরে? তোকে তো করবেই সবাই পিঁটনে, তোকে না পিটলে ননীর হাতে সুখ হবে কি করে? তোকে মারলে তো তার নালিশ নেই, তোর জন্যে তো আদালত নেই। চল্ বাড়ি, আমিও দিই ঘা কতক বসিয়ে।...ঘুটু! ঘুটু না হ'লে ওঁর একদণ্ড চলে না। পইপই করে বারণ করি, ওরে নিমে, যাস্ নি, তোর প্যাঁকাটির মতো শরীর, তুই পেরে উঠবিনি ওসব দজ্জাল দাম্পাগুাদের সঙ্গে, তা গরীবের কথা বাসি না হ'লে তো—'

ঘুটুর পিসিমা ক্রন্দমান ভাইপোকে টানিতে টানিতে যখন বাড়ির রকে উঠিয়াছেন, নিমাইয়ের জ্যেঠাইমার আওয়াজ হঠাৎ কানে গেল। থমকিয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন, হাতের মুঠিটা আলগা হইয়া পড়ায় ঘুটু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। পিসিমা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা শুনিলেন, তাহার পর পিছনে ঘুরিয়া পা বাড়াইলেন।

ঘুটুর মা বলিল, ঠাকুরঝি, তুমি আবার এই দুপুর রোদ্দুর মাথায় ক'রে বেরিও না। অনামুখো ছেলে ঐ করে বেড়াবে চোপোর দিন, গালমন্দ খাবে না তো কি করবে?'

ঘুটুর পিসিমা চক্ষু কপালে তুলিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যাহাতে ডোবার ধার পর্যন্ত আওয়াজটা অবলীলাক্রমে পৌঁছায় এইরূপ কণ্ঠে ঝংকার করিয়া উঠিলেন, 'তুই বের করতে পারলি কথাটা মুখ দিয়ে, বউ? আটকালো না মুখে একটু? (নামিয়া অগ্রসর হইতে হইতে) ছিষ্টিধর ছেলে, সে হ'ল অনামুখো? তাকে পাড়ার শতেক-খোয়ারীরা এই ঠিকদুপুরে খুঁড়বে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনতে হবে আমায়? পরের ছেলের গতর দেখে ডাইনে! নিজের ছেলে হ'ল প্যাঁকাটি! সাতটা বাঘে খেতে পারে না, তা পড়বে নজর সেদিকে?'

পিসিমা রাস্তার ধারে পৌঁছিয়া গেছেন। স্রোত সমানে বহিয়া চলিয়াছে—

'তা হবে প্যাঁকাটি, হবে, হবে, হবে, এই পাতোব্বাক্যে বলছি আমি। ছেলের ছেলের ঝগড়া, বুড়ো মাগী কোমর বেঁধে এল ছেলে খুঁড়তে!'

নিমাইয়ের জ্যেঠাইমাও 'তবে রে? যত মনে করি কিছু বলব না—' বলিতে বলিতে পুকুরধার ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া উঠিলেন, এবং এর পর উভয় পক্ষের ভাষা উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া যাহা দাঁড়াইল তাহা লিপিবদ্ধ করা চলে না। ক্রমে ঘুটুর পিসিমার সঙ্গে ঘুটুদের বাড়ির অন্য মেয়েছেলেরা আসিয়া যোগ দিল; নিমাইয়ের জ্যেঠাইমারও দম্‌-গলা পুষ্ট করিতে লাগিল নিমাইদের বাড়ির নানা বয়েসের মেয়েরা মিলিয়া। উভয় দলই হাত-পা নাড়া ও উৎকট ভাষা প্রয়োগের ঝোঁকে এক রকম অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হইতে হইতে এক সময় খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল এবং প্রত্যেকেই সাধ্যমত প্রতিপক্ষ দলে নিজের নিজেব জোড়া বাছিয়া লইল। নিমাইয়ের পাঁচ বৎসরের ছোট ভাই এবং ঘুটুর চার বৎসরের ছোট ভাগ্নীর মধ্যে নানা প্রকারের ভেংচি কাটার বিনিময় হইতে লাগিল। ছেলেটি মধ্যে মধ্যে ধূলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল; মেয়েটি বলিতে লাগিল, 'তোল্‌ বাবা ম'লে যাক্‌, তোল্‌ মা ম'লে যাক্‌।'

ঘুটুদের ঝি খুব খরখরে—যেমনই ছড়া কাটায়, তেমনই হাত-পা নথ নাড়ায়। নিমাইদের ঝি কথার দিকে আদৌ গেল না, কোঁচড় পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং ঘুটুদের ঝি অনেকক্ষণ বকিয়া গেলে মাঝে মাঝে এক এক বার 'এই নে, এই নে' বলিয়া কোঁচড়টা ঝাড়িয়া দিতে লাগিল; অর্থটা বোধহয় এই যে, সে বিনাবাক্যব্যয়ে সমস্ত বাক্যবাণগুলি নির্বিচারে ফিরাইয়া দিতেছে। এই প্রায় নীরব প্রক্রিয়ায় ঘুটুদের ঝি যেরূপ দ্বিগুণিতভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে অনুমানটা বিশেষ মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।

নিমাইয়ের জ্যেঠাইমার পোষা বিড়ালটা কৌতূহলবশে সঙ্গে আসিয়াছিল; ঘুটুদের কুকুরটা তাহাকে তাড়া দিয়া গাছে তুলিয়া দিয়া উর্ধ্বমুখে আগলাইয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীদের কয়েকজন আসিয়াও সদ্‌ভাব অসদ্‌ভাব মতো যে যাহার দল বাছিয়া লইয়া ব্যাপারটিকে পুষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল। বেচারামের মা নিমাইয়ের পিসির পিঠটা চুঁচিয়া দিতে দিতে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল, 'ওগো দিদি, চুপ কর, মাথা খাও আমার। কখনও কাউকে

উঁচু কথা বলনি একটা, তুমি পেরে উঠবে না ও খাণ্ডাতের কাছে। তার উপর আবার তোমার মাথার ব্যামো, বুকের ধড়ফড়ানি, কি আছে তোমার শরীরে ওদের শাপমন্যিতে? আমার মরা মুখ দেখো, চুপ কর।'

বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাইতেছে; দিদির উৎসাহ চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইতেছে।

৩

ব্যাপার যখন চরমে, ঘুটুর বাবা নীরদ শনিবারের অফিস-ফেরত গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। একবার থমকাইয়া দাঁড়াইল, ব্যাপারটা মোটামুটি একটা আন্দাজ করিয়া লইবার চেষ্টা করিল; তাহার পর ভগ্নীর কাছে গিয়া অস্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, 'কি হয়েছে, এত গোল কিসের?'

বেটাছেলের আগমনে কলহটা একটু থামিয়া গেল।

ঘুটুর পিসি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 'কিছু হয়নি, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে। আমি উঠতে-বসতে এইরকম গালমন্দ আর সহ্যি করতে পারব না। তাও যত পারে না-হয় আমায় দিক্‌, ঐ দুধের ছেলেটার ওপর নজর কেন? ঠাকুর-দেবতার দোর ধ'রে কোন রকমে টেঁকে আছে, তা ডাইনীদের বুক করকর করছে, একটা অঘটন না-ঘটিয়ে ছাড়বে না। তার আগে দে আমায়—'

নীরদ অধৈর্যভাবে বলিল, 'আঃ, কে কি বলেছে, তাই বল না?'

নিমাইয়ের জ্যেঠাইমা চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, গলাটা একটু আগাইয়া সুর তুলিলেন, 'বলেছি আমি। বলব, একশো বার বলব, হাজার বার বলব। আমার ঐ হাজা-মরা একটা গুঁড়ো, আছে কি নেই, সে হ'ল পালোয়ান, তার হাতীর মতন গতর, তাকে সাতটা বাঘে খেতে পারে না...'

নীরদ আবার প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু উঠল কি করে এসব কথা? কি জ্বালা!'

নিমাইয়ের জ্যেঠাইমা বলিল, 'যা করে চিরকাল ওঠে, ঝগড়া করবার জন্যে যদি কেউ কোমর বেঁধে বসে থাকে।...হয়েছে ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া; গুলি খেলতে খেলতে নিমেকে দুর্বল পেয়ে তোমার ঐ আদুরে গোপাল—'

নীরদ অধৈর্যভাবে বলিয়া উঠিল, 'তা দেন কেন আসতে আপনার ছেলেকে —ছেলে যদি এতই ক্ষীণজীবী?'

নিমাইয়ের জ্যেঠাইমা নীরদের পানে চাহিয়া চিৎকার করিয়া, 'ওরে আমার!' বলিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গিয়া হনহন

করিয়া নিজেদের বাড়ির দিকে আগাইয়া গেলেন এবং দরজার দিকে হাত দুইটা বাড়াইয়া গলা ছাড়িয়া দিলেন, 'বলি অ মেনীমুখো! বাড়ির মেয়েছেলে যে দাঁড়িয়ে অপমান হচ্ছে গুণ্ডোর হাতে, বেরিয়ে দেখতে পার না? শুধু যে মারতে বাকি রাখলে! বাড়ির মধ্যে কনে-বউয়ের মতন ঘোমটা দিয়ে বসে থাকলে সে-ঘোমটা খোলবার মুখ থাকবে না যে চিরজন্মে!'

কথাগুলো নিমাইয়ের বাপ রসময়কে উদ্দেশ করিয়া বলা, তার চেহারা দেখা না গেলেও। রসময় সেই প্রকৃতির জীব, যাহাদের লেজে মোচড় না দিলে চাড় হয় না; তবে একটু মোচড় পড়িলেই যাহারা একেবারে সপ্তমে চড়িয়া ওঠে। লোকটা দুয়ারের আড়ালে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল ও ঘুটুর পিসিমার সামনে বাহির হওয়া নিরাপদ হইবে কিনা চিন্তা করিতেছিল, ভাজের ধিক্কারে বাংলা ছাড়িয়া একেবারে হিন্দী মুখে করিয়া বাহির হইয়া আসিল—'কিস্‌কা বুকের পাটা হুয়া হ্যায় যে অপমান করেঙ্গা।'

ঘুটুর পিসিমা খপ করিয়া ভাইয়ের ডান হাতটা ধরিয়া তাহাকে মেয়েদের দলের মধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে নীরু, চলে আয়, ও গুণ্ডোর সামনে দাঁড়াস্ নি, যে-ভাবে তেড়ে আসছে,—আমার অদৃষ্টে যে কি আছে!...'

'হেচকা টানে নীরদ মেয়েদের দলের খানিকটা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল, গা-ঝাড়া দিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল, 'ওর মতো দশটা গুণ্ডা আসুক, নীরে চাটুজ্যে একলা তাদের মোহড়া নেবে।...বোঝা নেই সোঝা নেই, তুই যে মেয়েদের কথা বিশ্বাস করে—'

রসময় আগাইয়া আসিয়া শীর্ণ বুকটা ফুলাইয়া বলিল, 'আগে একটার মোহড়া সামলা, নীরে, মেয়েদের দলে ঢুকে সেখান থেকে আস্ফালন করা পুরুষের কাজ নয়।'

দুই একটা এই ধরনের আলাপের পরই জমিয়া গেল। একদিকে বোন আর একদিকে ভাজ গোড়া থেকেই এমন দক্ষতার সহিত চালাইয়া গেল যে, মূলে যে ওরূপ উৎকট কলহের কিছুই নাই সেটা না রসময়, না নীরদ কাহাকেও ভালো করিয়া বুঝিবার অবসর দিল না। দুইটা পরিবারই একটু কলহপ্রিয় ও কলহে দক্ষ, অল্প সময়েই নূতন পুরানো বহু কুৎসা-কাহিনী একত্র হইয়া তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল।

প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িয়া হাতাহাতিটা কোনরকমে বন্ধ করিল, কয়েকজন নীরদকে এবং কয়েকজন রসময়কে নানা রকম নীতিবাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে একরকম ঠেলিতে ঠেলিতেই বাড়ির দিকে লইয়া গেল। যতক্ষণ দেখিতে পাইল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরস্পরকে শাসাইতে শাসাইতে তাহারা নিজের নিজের বাড়ি গিয়া উঠিল।

* * *

জের কিন্তু মিটিল না। দুই বাড়িরই গর্জানি, আফসানি পুরা মাত্রায় চলিয়াছে। ঘুটুর পিসিমা কোট ধরিয়াছেন, হয় এ অপমানের বিহিত করা হোক, নয় তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হোক। নিমাইয়ের জ্যেঠাইমা অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। নীরদ বলিতেছে—জান কবুল, এর শোধ লইবে তবে তাহার নাম নীরদ। রসময় বলিতেছে, আজ কোনরকমে ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল বলিয়া নীরে যেন নিশ্চিন্ত না হয়।

যাহারা নীতিবাক্য প্রয়োগে ব্যাপারটা থামাইয়াছিল, তাহারা রাত্রে আবার উপস্থিত হইল। দুই বাড়িতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা করিয়া স্থির হইল, ইহার একমাত্র উপায় আদালত।

নীরদের শুভার্থীরা ফৌজদারির ব্যবস্থা দিল। রসময়ের শুভার্থীরা দিল মানহানির পরামর্শ। সাক্ষীসাবুদ সব ঠিক হইয়া গেল।

৪

পরদিন দুপুরবেলার কথা। নিমাই একটা মোটা খাতা কোলে করিয়া কি লিখিতেছে, একটা চাপা আওয়াজ হইল, 'নিমে!'

ঘরের পিছনেই আগাছার ঘন জঙ্গল। নিমাই ঘুরিয়া দেখিল, জঙ্গলের মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া জানলার কাছে ঘুটু। এমন কিছু অনভ্যস্ত দৃশ্য নয়, খুব বিস্মিত হইল না। ফিসফিস করিয়া প্রশ্ন করিল, 'এলি কি করে?'

পূর্ববৎ উত্তর হইল, 'বাবা বেরিয়ে গেছে গুপী মোক্তারের কাছে মোকদ্দমার সলা করতে। পিসিমা ক্ষীরী গয়লানীর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ক্ষীরী কাল তোদের দলে ছিল কিনা? লুকিয়ে পালিয়ে এলাম।...খেলবি?'

'না!'—বলিয়া নিমাই গোঁজ হইয়া খাতায় মন দিল।

ঘুটু প্রশ্ন করিল, 'রাগ করেছিস?'

'না, করবেনা রাগ! হেরে গিয়ে খাটান্ দেবে না, তার উপর পেটে কামড়ে দাগ পড়িয়ে দেবে! যা বলছি, নইলে জ্যেঠাইমাকে ডাকব এক্ষুনি!... ও জ্যেঠাইমা! এই দেখো—'

ঘুটু সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঝোপের মধ্যে নামাইয়া লইল। একটু পরেই পাতার মসমসানিতে বোঝা গেল সে ফিরিয়া যাইতেছে। নিমাইয়ের মুখে একটু হাসি ফুটিল। খাতা ছাড়িয়া জানলার কাছে উঠিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, 'ঘুটু!'

ঘুটু ফিরিয়া তাকাইতে হাসিয়া বলিল, 'শোন্, ভয় পেয়ে গেলি? জ্যেঠাইমা কোথায়? সে বাবাকে নিয়ে দাসু উকিলের কাছে গেছে। বাবা বড্ড চটেছে কিনা তোদের ওপর...খিক্-খিক্-খিক্—'

ঘুটু বলিল, 'খেলবি তাহ'লে? না হয় কালকের খাটান দিয়েই আরম্ভ করব।'

নিমাই একবার খাতার দিকে চাহিয়া নিরুৎসাহভাবে কহিল, 'না ভাই, হবে না। ফিচলেমি বুদ্ধি বাবার, কুড়িটা অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে গেছে, এসেই দেখবে। মানে, কোথাও যাতে না-বেরুই আর কি। একে অঙ্ক আসেই না আমার—'

অঙ্কের জন্য আটকাইল না। ঘুটু অঙ্কে হুঁশিয়ার, জানলার মধ্য দিয়া খাতাটা লইয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে টকাটক করিয়া অঙ্কগুলা কষিয়া দিল। নিমাই নকল করিয়া লইল।

এ পাড়ায় সম্ভব নয়, ও পাড়ায় গিয়া রাধারমণের মন্দিরটার পেছনে গিয়া খেলা ঠিক হইল।

যাইতে যাইতে ঘুটু পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়া বাহির করিল। নিমাইয়ের নাকের কাছে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, 'কি বল তো?'

নিমাই নাকটা কুঞ্চিত করিয়া দুই-তিনবার ঘ্রাণ লইল, তাহার পর হাসিয়া-চোখ বড় করিয়া প্রশ্ন করিল, 'কোথায় পেলি রে?'

ঘুটু মোড়াটা খুলিয়া আমের গোটাপাঁচেক টক মিঠে আচারের বড় বড় ফালি মেলিয়া ধরিল, গুড়ে মসলার দিব্য নধরকান্তি। বলিল, 'খা, পিসি ছাতে শুকোতে দিয়ে ক্ষীরীমাসীর সঙ্গে ঝগড়া করতে গেল। ভাবলাম, নিমের জন্যে এই তালে গোটাকতক সরাই, তুই ভালোবাসিস কিনা'—

এক কামড়ে অর্ধেকটা মুখে পুরিয়া নিমাই অম্লরসে মুখটা বিকৃত করিয়া বলিল, 'তোর পিসির আচারের হাত খুব মিষ্টি।'

ঘুটু একটা নিজের মুখে পুরিতে যাইতেছিল, হঠাৎ নিমাইয়ের দিকে একটু ঝুঁকিয়া কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু কোঁদলের গলাটা!'

কথাটায় কি ছিল, দুজনেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

* * *

আসিয়া পড়িয়াছে। আচার কয়টা কাগজে জড়াইয়া মন্দিরের রকে রাখিয়া উভয়ে ট্যাঁক হইতে গুলি বাহির করিল।

ও-পাড়ায় যে ঝগড়ার আওয়াজটা শুনা যাইতেছিল, সেটা খুবই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আঁটি ছাড়িতে ছাড়িতে ঘুটু আর একবার হঠাৎ তেমনই ভাবে নিমাইয়েব দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু কোঁদলের গলা!'

দুজনেই আবার অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতেই নিমাই বাগ দেখাইয়া বলিল, 'খবরদার, হাসিয়ে অন্যমনস্ক করিয়ে দিওনা বলছি ঘুটু, ভালো হবে না। এ—ই নট্-নড়নচড়ন নট্-কিচ্ছু—আমি ফাস্ট্—এগিয়ে আছি—'

গ্রাম-সংস্কার

বেশ কাটিতেছিল।

ইউ. পি. স্কুলের হেডমাস্টার। ক্রোশ দুয়েক দূরে জগদীশপুরের এল. পি. স্কুল ছাড়া পাঁচ মাইলের মধ্যে মা-সরস্বতীর আর বৈঠক নেই ; ক'খানা গ্রামের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, অভিজ্ঞতায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ শৈল ঠাকুর—এই অধীন। ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথ-কল্পিত ভিলেজ স্কুলমাস্টারের জীয়ন্ত সংস্করণ।

একমেবাদ্বিতীয়মের আপনারা বাংলা অনুবাদ নিশ্চয় করিবেন—বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা। করুন, আপত্তি নাই। আচ্ছা, সুখ জিনিসটা কি নিতান্ত বস্তু-নিরপেক্ষ নয়? মনের দিক দিয়া ধরুন, আগ্রার দেওয়ান-ই-আমে নতশীর্ষ রাজন্যবর্গের সভায় মণিমাণিক্যখচিত ময়ূরসিংহাসনে উপবিষ্ট শাজাহানের বুকে যে অনুভূতি স্পন্দিত হইত—আকাশের মুক্ত চন্দ্রাতপতলে, কৃষ্ণশিলার দৃপ্ত সিংহাসনে অর্ধউলঙ্গ বন্য সামন্তদের মধ্যে উপবিষ্ট ভিলরাজার বুকেও কি সেই অনুভূতি জাগে না?

আপনারা এর উত্তর করিতে পারিবেন না ; কেননা, আপনারা কেহই শাজাহান নন। আমি পারিব ; কেননা, আমি যে এক বন্য রাজ্যের অধীশ্বর সেই কথা বলিয়াই সুরু করিয়াছি। তর্কে কিছু ভুল থাকিয়া গেল বলিতেছেন? তা থাক, এইরকম তর্কতেই আমার বেশ চলিয়া যাইতেছে।

'চলিয়া যাইতেছিল' বলা উচিত ; কেননা সম্প্রতি আমি রাজচ্যুত। এটা সেই দুঃখেরই কাহিনী বলিতে বসিয়াছি।

আমার স্কুলের সামনে দিয়া শিবডাঙা আর রত্নপাটির হাটের রাস্তা এবং পিছনে আশু মোক্তারের পুকুর। যে স্কুলের সামনে দিয়া হাটের রাস্তা আর পিছনের স্নানের পুষ্করিণী, সে স্কুলের একটা মস্তবড় সুবিধা, তাহাতে পড়া হয় না।

আপনাদের মধ্যে কি কেহ মাস্টার আছেন? থাকিলে, গুরুমহাশয়, স্কুল-মাস্টার, প্রফেসর, গবেষক—যে কোন স্তরেরই হোন না কেন, নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন, পড়ার ঝঞ্ঝাট না হইলে আমরা কেহই ক্ষুব্ধ হই না ; ছেলেরা তো

নয়ই, অনেক গার্জেনও নয়, অন্তত সেইসব গার্জেন যাহাদের কাছে ছেলেরা পড়া বলিয়া লইবার জন্য উপস্থিত হয়। আমি তো ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, মামা পড়া না করিবার জন্য যতটা প্রহার দিতেন, পড়া করিবার জন্য তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে অপর কোন-না-কোন ছুতা করিয়া তাহার চেয়ে ঢের বেশি ঠেঙাইতেন।

পড়া বাদ দিয়া আমাব স্কুলে আর সবই কিছুই হইত।

পাঠশালার আটচালার মাঝের ঘরটি আমার; একটি হল গোছের। আমি রাস্তার দিকে মুখ করিয়া বসিতাম।

* * *

দুর্লভ আসিয়া উপস্থিত হইল।

'পেন্নাম হই, ঠাকুর।'

'আরে, দুর্লভ যে! খবর কি? এস, ব'স।'

'খববের কথা আর জিগুবেন না। এদিনে শিবডাঙ্গার হাটে যাওয়া হ'ল না; রাঙী-গাইটা পর্শ হ'ল কিনা। দেখো, আসল কথা জিগুতে ভুলেই গেছলাম আর কি। রাঙী বিওল মঙ্গলবারের ঠিক সন্দের মুখে, দেবতা ঠিক পাটে বসলে আর কি; নই বাছুর, এখন শাস্ত্রে লক্ষণ কি বলেছে, বলেন তো ঠাকুর!'

উৎকর্ণ ছেলেগুলোর জন্যে টেবিলে একটা বেত আছড়ানি দিয়া বলিলাম—

'মঙ্গলের সাঁঝে হ'ল নই
কোথায় থুবি মাখন দই?'

খনার বচন নয়, আমার নিজের। এ ক্ষমতাটা ছিল আমার প্রতিপত্তির মূলে। দুর্লভ গদগদ হইয়া উঠিল—'এই দেখ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম!'

কাঁধের গামছাটা নামাইয়া আঁচলের গেরো খুলিয়া, কলাপাতায় জড়ানো খানিকটা দা-কাটা তামাক হাসিতে-হাসিতে সামনে রাখিয়া বলিল, 'সুখীর মা বললে,—'শৌল-ঠাকুরের ওখানে দিয়ে যাবে, একটু লতুন তামাক গামছায় বেঁধে দিনু।'...বলনু, তা দে।...ভুলেই গেছলাম আর কি! তা ভুলের দোষ দেওয়া যায় কি, ঠাকুর? তুমিই সালিসী কর না, মাথার কি আর ঠিক আছে? রাঙী পর্শ হ'ল, শিবডাঙার হাটে যেতে নারলাম, ভাবলাম রত্নপাটির হাটটা একবার

দেখে আসি, গরুটা লতুন বিওল, এই হাটে গুড়টা কিনে থুই। আজকাল গুড় দিচ্ছে কি দর, ঠাকুর ?'

বাজার-রেট কণ্ঠস্থ থাকিত। বলিলাম, 'সাড়ে তের সের পর্যন্ত দেয় তো কিনে নিও। ঐ দর চলেছে ক' হাটে।'

'স'পাঁচ আনায় তাহলে কতটা হ'ল ? সুখীর মা ওর বেশি বের করলে না পয়সা, বললে,—এ হাটে স'পাঁচ আনারই আনো। গরু আবার ভগবতী কিনা। সুখীর মা পাঁচ আনাকে স'পাঁচ আনা ক'রে দিলে।'

শির-পোড়ো পুঁটে তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটা বাড়াইয়া ধরিল। নূতন তামাক আসিলেই সে নিজে হইতে উঠিয়াই একাজটুকু সারিয়া ফেলে এবং হুঁকাটা বাড়াইয়া মুখ ঘুরাইয়া কোন ছেলের সঙ্গে কথা কহিতে থাকে, না হইলে তাহার নিশ্বাসের গন্ধে তামাক সাজিবার এত আগ্রহের কারণটা জাহির হইয়া পড়িবে। এই মুখ ঘোরানোটুকু আমাদের গুরুশিষ্যের মধ্যে পর্দা। এই পর্দার এধারে আমিও জানি, ও আমায় প্রসাদ না করিয়া দেয় না ; ওধারে ও-ও জানে, প্রসাদের কথাটা মাস্টারমশাইয়ের কাছে গুপ্ত নাই।

তামাক টানিতে টানিতে দুর্লভকে সাড়ে তের সেরের দরে সওয়া পাঁচ আনার হিসাব করিয়া দিলাম।

'কে, দুর্লভ নাকি ? তা বেশ, আমি বলি মাস্টারমশার সাথে বসে গল্প করে কে ? ছেলেরা তোমার পড়ছে কেমন, মাস্টারমশাই ? নে, একটু সরে ব'স দিকিন। তামাক নিশ্চয় দুর্লভের বাড়ির ?...ঠিক তো ? হ'তেই হবে। আমি যা আন্দাজ করব, তার আর নড়চড় হবার জো আছে ?'

দুর্লভ কৃতকৃতার্থ হইয়া একগাল হাসিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, 'দেবতা আপনারা আজ্ঞে, আপনাদের কাছে কি চাপা থাকে কোন কথা ?'

'খানিকটা দিয়ে আসিস্ বাড়িতে, দেখব।'

অবিনাশ ঠাকুর গ্রামের পুরুত। কৃষকপল্লীর পুরোহিত,—বিশুদ্ধ, প্রচুর ভক্তি, দুগ্ধ এবং ঘৃতের মধ্যে বেশ সুখেই থাকে ; চারটি ছেলের জায়গা লইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া হাতটা বাড়াইয়া বলিল, 'দাও, ধরেছে নাকি ?'

কয়েকটা টান দিয়া হুঁকাটা দুর্লভের দিকে বাড়াইয়া দিল। দুর্লভ বাঁ হাত দিয়া নিজের ডান হাতটা স্পর্শ করিয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকাটা তুলিয়া

লইল। অবিনাশ ঠাকুর বলিল, 'মহাদেব মাস্টারকে দেখি না, ঐ ঘরে পড়াচ্ছে বুঝি? আজকালকার আবার পড়া! তোমাদের নিস্‌পেক্টরের নিয়ম-কানুনে আর পড়ার কি রেখেছে বল? ছেলেবেলার কথা মনে আছে,—পাঠশালায় পা দিতেই গুরুমশায় জিজ্ঞেস করলে, 'তামাকের পয়সা এনেছিস?'…'আজ্ঞে, আজ সুবিধে হ'ল না।'…'সুবিধে হ'ল না? বটে! আচ্ছা ব'স্।'…মাদুর বিছিয়ে ব'সে ধারাপাত খুলতেই—'আঠার উনিশং?'…ঘাগী লোক, ঠিক যেটি বলতে পারব না, সেইটি এমন তাক ক'রে ধরত! কখনও ভুল হ'তে দেখিনি। …তারপর উঠে মার।…তার এক ঘা খেলে এদের কেউ উঠে জল খেতে পারবে? তারপর দু'হাতে ইঁট নিয়ে চেয়ার হয়ে বসা। গায়ের টাটানিতে সমস্ত দিনে একবার ভুলতে পারতাম যে, সকালে পাঠশালায় গেছলাম?…এরা কী পড়বে?…কই, হ'ল তোর দুর্লভ? হাটে যাচ্ছিলি বুঝি? তা যা, হাট উঠে গেলে গিয়ে আর কি হবে? তামাক যদি পেয়েছিস তো আর কিছুতেই উঠবি নি!'

দুর্লভ চলিয়া গেলে অবিনাশ ঠাকুর নামাবলীর খুঁটে বাঁধা একটা স্ট্যাম্প-মারা কাগজ খুলিয়া আমার টেবিলে বিছাইয়া দিল, বলিল, 'দেখ তো মাস্টার, সুদটা দাঁড়াল কত? চক্রবৃদ্ধি হারে, সেটা মনে রেখ।…তোরা সব পড়না রে, বাপু, মাস্টারকে সর্বদা ছড়ি হাতে ব'সে থাকতে হবে নাকি? তার আর সামাজিক কাজ নেই? আরে গেল!'

ভুবন কর্মকার উপস্থিত হইল। হাতে একখানি নূতন দা, আমার ডাক্তারির ফী।

টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া পাশে উবু হইয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আছে কেমন ছেলেটি, ভুবন?'

ভুবন মটকার দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'তা হ্যাঁ, বারো আনা আন্দাজ কমেছে বইকি।' অবিনাশ পুরোহিতের দিকে চাহিয়া বলিল, 'ধন্বন্তরি আর কারে কয়, ঠাকুর? আমাশায় ক'দিন থেকে ভুগছিল, হাতে জল শুকোয় না, তিনটা খোরাকে বারো আনা—'

অবিনাশ ঠাকুর দা হাতে তুলিয়া লইয়া ধার পরখ করিতে করিতে বলিল, 'ও বাকিটকও সেরে যাবে'খন: সন্দেবেলা আসিস্ আমার বাড়িতে; একটু

রাধারমণের চন্নামৃত নিয়ে যাস।···একখানা এইরকম দায় কথা কদ্দিন থেকে ভাবছিলাম; অনেকেই গড়ছে, কিন্তু তোর মতো হাত তো হ'ল না গাঁয়ে কারও—একথা আমি জোর গলায় বলব; আসুক না হারানে কামার, আসুক না য'তে, তোর খুড়ো নিবারণই আসুক না, লেহ্য কথা বলব, তাতে ভয়টা কি? আচ্ছা, মাস্টারের মতো লোহা চিনতে তো গ্রামে কেউ নেই?···কি হে মাস্টার, এ লোহা, এ গড়ন আর কারুর হাত থেকে বেরুবে? তুমিই বল না!'

আমি কাটারিটা বাঁ হাতে ধরিয়া খুব আলগা ভাবে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা তার ধারের উপর দুইবার বুলাইয়া লইলাম, তাহার পর নখ দিয়া ধারটা খুঁটিয়া একটা আওয়াজ বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম এবং সেই আওয়াজটা ধরিবার জন্য ডান কানটা আগাইয়া লইয়া গেলাম। বলিলাম, 'নাঃ, সরেস জিনিস হয়েছে, এর কাছে অন্য লোহা যে শীগ্‌গির এগুতে পারবে, মনে তো হয় না।'

হারানকেও ঐ কথা বলি, নিবারণকেও বলি। কাহাকেও নিরাশ করিয়া বিশেষজ্ঞ হওয়ার যশ অক্ষুন্ন রাখা চলে না।

নিবারণ কাছে থাকিলে বলিতে হয়, 'নিবারণেরই ভাইপো তো!'

দুর্লভের নিকট তামাকের আর ভুবনের নিকট কাটারির বন্দোবস্ত করিয়া অবিনাশ উঠিয়া গেল। হোমিওপ্যাথির বাক্সটা বাহির করিয়া ভুবনকে ঔষধ দিলাম। সে চলিয়া গেলে টেবিলে বেতটা আছড়াইয়া একটা হুঙ্কার করিলাম, 'তোরা কি ভেবেছিস বল্‌ দিকিন? অন্য দিকে এক মুহূর্ত চোখ ফেরাবার জো নেই দেখছি যে! অন্তা, তোর কড়াকে লেখা শেষ হ'ল? নিয়ে আয় স্লেট, আয় নিয়ে?'

অন্তার স্লেটের মাঝখানে একটা লম্বা দাঁড়ি, তাহার নীচের প্রান্তে দুইটা ছোট ছোট দাঁড়ি দুই দিকে একটু তেরছা হইয়া নামিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রান্তদেশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র বৃত্ত, তাহার মুখে পাঁচটি করিয়া ক্ষুদ্র রেখা। বড় দাঁড়ির উপরের প্রান্তে একটি মাঝারি গোছের বৃত্ত, তাহার ভিতর আবার তিনটি ছোট ছোট বৃত্ত। দাঁড়ির মাঝখান থেকে আবার দুইটি ছোট ছোট দাঁড়ি উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। একটির প্রান্তে সংলগ্ন আবার আর একটি দাঁড়ি, এরও দুই প্রান্তে দুইটি ছোট-বড় বৃত্ত।

অর্থাৎ একটি লোক তামাক খাইতেছে। লোকটা অবিনাশ পুরুতও হইতে

পারে, আমিও হইতে পারি, দুর্লভও হইতে পারে; শির-পোড়ো পুঁটেরও হইতে বাধা নাই। কাহারও চেহারার সঙ্গে যেমন পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, তেমনই পূর্ণ বৈসাদৃশ্যও লক্ষিত হয় না।

বেতটা তুলিয়া তাহার চিত্রবিদ্যার যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে যাইতেছিলাম, শঙ্কর পানের বুড়ী মা কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে হুড়মুড় করিয়া সামনে আসিয়া পড়িল—

'বাবা, রক্ষে কর, আর বুঝি বাঁচতে দিলেনা বউটাকে—'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার কি হ'ল ?'

'মেরে ফেললে বাবা, কি গোঙানি! কি মাথা-চালা! একবার চল বাবা শীগ্‌গির, তুমি না গেলে হবে না, রামধন ওঝার মন্তরে এ যাবার নয়।'

শঙ্করের বউকে ভূতে পাইয়াছে। গুরুমশাই শৈল ঠাকুর না হইলে ছাড়িবে না। বলিলাম, 'নাঃ, তোরা দেখছি—আচ্ছা, যা, আসছি। খানিকটা সরষে, একটা পিঁড়ে, একটা ঝাঁটা, একটা ভরা কলসী ঠিক ক'রে রাখগে। হ্যাঁ, আর একটা বেলপাতায় খানিকটা মঙ্গলচণ্ডীর সিঁদুর যোগাড় ক'রে রাখিস,—বিধবা ভূত হ'লে আবার সিঁদুর ছোঁয়াবার ভয় না দেখালে ছাড়বে না।'

এই সুদ-কষা থেকে ভূত-ছাড়ানো পর্যন্ত তাবৎ বিদ্যার জোরে দীর্ঘ ছয়টি বৎসর প্রবল প্রতিপত্তিতে কাটাইয়া দিলাম। ছয়টি বৎসর, ঝাড়া অর্ধযুগ। পাঠশালার নমুনা দিয়াছি, সকালে আশু মোক্তারের পুকুরঘাটের দৃশ্যও অনুরূপ; সন্ধ্যায় ষষ্ঠীতলার বটগাছের বাঁধা চত্বরে দৈনন্দিন গ্রাম্য সম্মেলনে শৈল ঠাকুর তো একেবারে সার্বভৌম।

চমৎকার কাটিতেছিল। শাহানশা শাজাহান যদি যুগ ডিঙাইয়া স্বয়ং আসিয়া বলিতেন, 'হে সার্বভৌম, তখ্‌ত্‌-তাউস—সে তোমারই যোগ্য আসন, আমি খালি ক'রে এসেছি; চল, অলঙ্কৃত কর'……শৈল ঠাকুরকে নড়াইতে পারিতেন না।

কিন্তু এ আসন আমায় নিজেই ছাড়িতে হইল, স্ব-ইচ্ছায় এবং স-ভয়ে।

দুঃখের কাহিনীটা সংক্ষেপেই সারিব।

সেদিন সকাল থেকেই প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। পুকুরঘাট মোটেই জমে নাই। স্কুলেও দুইজন মাস্টারই ছুটি লইয়াছেন। দুই-একটা ক্লাসে

দুই-একজন ছেলে আসিয়াছে, শির-পোড়ো পুঁটেকে ধরিয়া; সে মহাদেব মাস্টারের ঘরে গিয়া তামাক সাজিতেছে, প্রায় পনের মিনিট হইল।

আমি প্রসাদের অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দুইটি যুবক সামনে উপস্থিত হইল এবং একবার আমার স্কুলের সাইন-বোর্ডটার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া ছাতা মুড়িয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল।

এ-প্রান্তে এধরনের ছেলে দেখি নাই বড় একটা। একজনের মাথায় বাবরী চুল, শীর্ণ গালে নরুনের মতো গালপাট্টা, গায়ে খাটো পাঞ্জাবী, মোগলাই পায়জামা ধরনের কাপড় পরা। অপরটির প্রজাপতি-কাটের নবোদ্ভিন্ন গোঁফ, মাথায় ছাঁটা চুল, গায়ে ওল্টানো-গলা কামিজের উপর কোট, কাপড় সঙ্গীরই মতো।

জামা-কাপড় প্রায় সমস্তই ভিজিয়া গিয়াছে। নিংড়াইতে নিংড়াইতে বাবরীওয়ালা ছোকরাটি প্রশ্ন করিল, 'আপনারই নাম নিশ্চয় শৈল পণ্ডিত ?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ, আপনারা যে ভিজে নেয়ে গেছেন! কোথা থেকে ?'

'অনেক দূর থেকে আসছি, জগদীশপুর এখান থেকে—তা কোশ দুয়েক হবে, কিন্তু কাজের সামনে দূরের কথা কি বৃষ্টির কথা ভাবতে গেলে তো চলে না, মশাই। দুদিন থেকে যা কাটছে আমাদের; তাব সামনে একটু ঝড় কি বৃষ্টি, সে তো—'

দ্বিতীয় যুবকটি আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'সে তো অতি তুচ্ছ। তাই আমি বললাম, গলাবাজি ক'রে মরছিস কেন? এ তল্লাটে একথার মীমাংসা যদি কেউ করতে পারে তো মণ্ডলহাটীর শৈল পণ্ডিত, চল, তিনি যা বলবেন তাই মাথা পেতে—'

প্রথম ছোকরা হঠাৎ বাধা দিয়া বলিল, 'মশাই তো ব্রাহ্মণ? প্রণাম হই।'

দ্বিতীয় ছোকরা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া একেবারে আমার পদস্পর্শ করিয়া মাথায় হাত ঠেকাইল, বলিল, 'ভুলটা দেখুন একবার! মনেই ছিল না। —মাথার কি আর ঠিক আছে?'

আমি তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হইয়া গিয়াছিলাম। কী এমন সমস্যা, যাহার জন্য এই নিদারুণ অভিযান? কিসের সালিসী যাহার জন্য এই ভক্তির কাড়াকাড়ি? বলিলাম, 'আচ্ছা, আগে আপনারা কাপড় ছাড়ুন।...'

'পুঁটে, তামাক সাজা রেখে দু'খানা শুকনো কাপড় নিয়ে আয় তো!'

স্কুলের প্রায় সংলগ্নই আমার বাসা, পুঁটে আগন্তুকদের একবার দেখিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় ছোকরা কোটের বোতাম খুলিল, কামিজের বোতাম খুলিল, তাহার পর গেঞ্জির ভিতর হাত দিয়া বুকের কাছ থেকে কাগজে জড়ান একটি বেশ মাঝারি গোছের পুলিন্দা বাহির করিয়া খুব সন্তর্পণে খুলিতে লাগিল। বেশ একটু পিঁয়াজ-ছাড়ান করার পর একখানি মোটা ভাঁজ করা কাগজে মোড়া দুইটি কার্ড সাইজের ফটোগ্রাফ্ ছবি বাহির হইল।

কাপড় আসিল। ছোকরা ছবি দুইটি আমার টেবিলে পাশাপাশি সযত্নে রাখিয়া দিয়া বলিল, 'দেখুন ততক্ষণ, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে ভিজে কাপড়চোপড়গুলো নিংড়ে নিই।'

আলেখ্য দুইটি দুইজন সিনেমা-জ্যোতিষ্কের। পূর্বে যেন দেখিয়া থাকিব, এখন একাদিক্রমে পাঁচ-ছয় বৎসর কলিকাতার বাহিরে থাকায় এবং সিনেমা-জগৎ হইতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন থাকায় নামধাম মনে নাই। অবশ্য স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি। যুবতী তো নিশ্চয়ই।

কিন্তু এখানে এভাবে এ দুর্যোগের মধ্যে ইঁহাদের সমাবেশ কেন? আমি নানা সমস্যার সমাধান করিতে পারি; কিন্তু সে সব ক্ষুদ্র কৃষকপল্লীর অনাড়ম্বর নিত্যজীবনের সরল সমস্যা, দুইটি আধুনিক যুবক আর অতি-আধুনিক যুবতীর সমস্যার মধ্যে আমার দৃষ্টির প্রবেশ কোথায়? ভূত ঝাড়াইতেও জানি, কিন্তু এর ওঝাগিরি কি করিব আমি?

গলদ্‌ঘর্ম হইতেছি,—দুইজনে বাহির হইয়া আসিল, প্রায় একসঙ্গেই প্রশ্ন করিল, 'দেখলেন? কি রকম দেখলেন?'

একেবারে স্কুল-ঘর! আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, 'ইয়ে—মানে —মন্দ কি?'

জড়াজড়ি করিয়া দুই জনেই বলিয়া উঠিল, 'মন্দ কি' কি বলছেন মশাই? ওঁরা আজকাল কলিকাতার সিনেমায় যাকে বলে—মানে হচ্ছে, ওঁদের সামনে দাঁড়ায় কে?—চেহারায় বলুন, হাবভাবে বলুন, অ্যাক্‌টিঙে বলুন। এঁর নাম সরযূ, এঁর নাম বনলতা; আজ এঁরা মডার্ণ থিয়েটার্স ছেড়ে চলে আসুন, কাল কোম্পানি ব'সে যাবে।...আপনি কি বলছেন মশাই!'

আমি চক্ষে অকৃত্রিম বিস্ময় এবং যতটা সম্ভব শ্রদ্ধা মিশাইয়া আলেখ্য

দুইটির পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রথম যুবক কোমরে দুইটা হাত দিয়া বলিল, 'এখন কথা হচ্ছে, এ-দুজনের মধ্যে আবার কে সবচেয়ে ভাল ?'

দুইজনেই আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একটু পরে দ্বিতীয় যুবক টেবিলে একটা মুঠি চাপিয়া বলিল, 'ও বলছে—বনলতা, আমি বলছি—সরযূ দেবী। আজ তিনদিন থেকে আমাদের তর্ক চলছে, ওর দিকেও অনেক হয়েছে; আমাব দিকেও কম ভোট নয়। কিন্তু বেশির ভাগই তো চাষাভুষো, গায়েরই নয় জোর আছে, কিন্তু সরযূ-বনলতার তারা কতই বা বোঝে বলুন, তাই আপনার কাছে আসা।'

সর্বনাশ! আমি চোখ তুলিয়া একবার চকিতে দেখিয়া লইলাম, দ্বিতীয় যুবক বেশ মোটাসোটা এবং প্রথমটি হাড বাহির কবা হইলেও বেশ কসরৎ-করা শরীর। আমি পুঁটের সাড়া লইবার জন্য বলিলাম, 'হ'ল তোর পুটে ?'

পুঁটেও চেঁচাইয়া বলিল, 'আজ্ঞে না, এখনও ধরাতে পাবি নি টিকে, স্যাঁত-সেঁতিয়ে গেছে, যা বৃষ্টি!'—বলিয়া গলায় ধোঁয়া আটকাইয়া যাওয়ায় প্রবল বেগে কাশিতে লাগিল।

সাহস পাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের বলিলাম, 'তা নয় হ'ল, কিন্তু এঁদের অ্যাকৃটিং সম্বন্ধে আমার তো জানা নেই কিছু।'

আশা ছিল ঐতেই রেহাই পাইব, কিন্তু দুরাশা। প্রথম যুবক বলিল, 'চেহারা সম্বন্ধেই বলুন।'

দ্বিতীয় যুবক একটু সবিযা আসিয়া বলিল, 'আব ফটোর পোজ দেখে হাবভাব সম্বন্ধে যতটা আন্দাজ করতে পারেন। ওপিনিয়ন কিন্তু আপনাকে একটা দিতেই হবে। পাড়াগাঁয়ে এসে প'ড়ে গেছি একটা সমস্যায়। আমরা তো কলকাতাতেই বেশির ভাগ থাকি কিনা, ভেবেছিলাম গরমেব ছুটিটা ভিলেজ আপ্‌লিফ্‌ট (গ্রাম সংস্কাব) নিয়ে থাকব, রোগে—কুশিক্ষায় গ্রাম তো উজোড় হয়ে যাচ্ছে; তা এখন দুটো দল খাড়া হয়ে গেছে এই সমস্যা নিয়ে—হারজিতের মানসম্ভ্রমের ব্যাপার!'

আমার যে জীবন মরণের ব্যাপার! পাপ ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য ছবি দুইটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম, 'আপনার সরযূদেবী খুবই সুন্দর, তবে বড্ড রোগা নয় কি ?'

একটু যেন রুক্ষ স্বরেই উত্তর হইল, 'আপনি নিশ্চয় বলতে চান—তন্বী ?'

তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, বড্ড তন্বী একটু…… আর বনলতার মত সুন্দরী বড় একটা দেখি নি, খালি নাকটা যেন একটু বেশি—'

লম্বা বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস হইতেছিল না। প্রথম যুবক বলিল, 'গ্রীসিয়ান ছাঁচের……এই তো?'

হাঁপ ছাড়িয়া বলিলাম, 'ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।'

অল্প একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর প্রশ্ন হইল, 'তা হ'লে?'

এত অল্পে ছাড়িবে না; তবুও একবার চেষ্টা করিলাম, বলিলাম, 'একজন হ'ল উর্বশী,—তন্বী, গৌরী, সঞ্চরিতা লতার মত; একজন ভেনাস—শিল্পীর পাষাণের মধ্যেও যে হয়ে ওঠে কুসুমের মত পেলব, প্রভাতের চেয়েও।'—

প্রথম যুবক অধৈর্যভাবে একরকম ধমক দিয়াই বলিয়া উঠিল, 'থাক থাক, আপনার ভাষার চটক শুনতে বৃষ্টি মাথায় ক'রে দু'কোশ পথ আসিনি মশায়, ফাঁকিতে চলবে না। বেশ, মিস্ বনলতা ভেনাসই হোল; এখন ভেনাস উর্বশীর চেয়ে বড় কিনা বলুন, চুকে যাক লেঠা।'

দ্বিতীয় যুবক একটু চতুর। সঙ্গী সালিসকে চটাইয়াছে, এ সুবিধাটা ছাড়িল না, বেশ শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'না না, আপনার যেমন ক'রে সুবিধে হয় বলুন। ওই নিন, আগে তামাক খান মশাই। যতরকম ভাবে দেখা যায় দুজনকে দেখুন। ধরুন বনলতা থেকে খানিকটা মাংস সরযুর শরীরে চারিয়ে দেওয়া হ'ল, আর সরযুর নাকটা—মানে, সরযুর মত নাক বনলতার ক'রে দেওয়া হ'ল। দুজনেই নির্দোষ হয়ে গেল তো? এখন বলুন, কে সুন্দর? তারপর আবার খুঁত দু'টো আলাদা আলাদা বিচার ক'রে, যার খুঁত তার শরীরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে—'

কি মারাত্মক রকম মেথডিক্যাল!

প্রথম যুবক একেবারে খিঁচাইয়া উঠিল, 'মাংস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ বনলতার নাকটাও তোর ওই তন্বী খেঁদীর মুখে বসিয়ে দে না!'

দ্বিতীয় যুবক হুংকার করিয়া উঠিল, 'মুখ সামলে!'

'আলবৎ বলব।—খ্যাঁদেশ্বরী!'

'তোরও তা হ'লে নাকেশ্বরী, বকেশ্বরী, ঢাকেশ—'

'এই তা হ'লে তোর নিজের নাক সামলা!'

আমি তাড়াতাড়ি নাক এবং উদ্যত ঘুষির মাঝখানে দাঁড়াইয়া দুইজনকে থামাইয়া দিলাম।

লক্ষ্য করি নাই, বৃষ্টি কমিয়াছে, মেঘেও মাঝে মাঝে ফাটল ধরিয়াছে। বাচনিক তর্কের এই হাত বাহিয়া ঘুষিতে অবতরণ একটা সুবিধাও। বলিলাম, 'সমস্যাটা খুবই শক্ত—বুঝতেই পারছেন, রামী-বামীর ব্যাপার তো নয় যে, এক কথায় সেরে দিলাম। উনি যে রকম বলছেন, ঐ রকম একটা লজিক্যাল মেথড ধ'রেই এগুতে হবে। আমায় পাঁচদিন সময় দিন, ঠিক ক'রে আপনাদের ওখানে নিজেই ব'লে আসব'খন। সমাধান ক'রে উঠতে পারি, আগেই ব'লে আসব। এমন গুরুতর সমস্যা মাথায় ক'রে আপনাদের কি ভাবে কাটচে দিনগুলো বুঝছি তো।......বৃষ্টিটা এবার বেশ ধ'রে এসেছে।'

ঠিক ঠাণ্ডা না হ'লেও দুজনে কতকটা সংযত হইয়াছে ; নিজের নিজের ছবির উপব দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া আছে।

আমার কথা শেষ হইলে প্রথম যুবক মুখ তুলিয়া বলিল, 'নাঃ, আপনি যাবেন কেন, আমরাই পরশু থেকে রোজ একবার ক'রে এসে জেনে যাব'খন।'

দ্বিতীয় ছোকরা বলিল, 'আমাদের নিজের নিজের সমর্থকদের নিয়ে আসব'খন সঙ্গে ক'রে ; গোপাল মণ্ডলের ছেলে রসিকের দেখবেন, কি শরীর আর কি উৎসাহ!'

প্রথম ছোকরা বলিল, 'মানে, যতদিন না একটা হেস্তনেস্ত হচ্ছে, আমাদের আসল কাজে—মানে, ভিলেজ আপ্‌লিফ্‌টের কাজে মন দিতে পারছি না কিনা......তা হ'লে মনে রাখবেন—পরশু।'

* * * *

পরশুর আগের দিনই চলিয়া আসিয়াছি, আপাততঃ ছুটি লইয়া ; কিন্তু আবার যাইব কিনা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। অস্বীকার করি না, প্রতিপত্তির নেশা এখনও লাগিয়া আছে একটু। নেশাই তো! তবুও খুব সতর্কভাবে খোঁজ লইতেছি, ভিলেজ আপ্‌লিফ্‌টের জন্য ওপ্রান্তে আরও সব চারিদিকে কি রকম সেবক সমাগম হইতেছে।

ফীট্‌-অফ্‌-প্রিসেপ্‌টার

রাত্রি প্রায় দেড়টা ; বিছানায় প্রবেশ করিয়া মশারি ফেলিতেছি, বাহিরে ত্রস্ত কড়া নাড়ার শব্দ হইল। মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া নামিয়া গেলাম, দুয়ার খুলিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'আরে ফিট্‌-অফ্‌-প্রিসেপ্‌টার যে! এত রাত্রে অতদূর থেকে!'

গুরুচরণের এ-নামটা তাহার নিজের গ্রহণ করা, আমি দিই নাই।···কোনও কারণে মুখে খুব একটা বিপন্ন ভাব, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'আজ রাতটা এখানেই একটু মাথা গুঁজে থাকতে হবে মশাই, কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা করা···'

আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম, 'কালীঘাটের বাড়ি কি হ'ল?'

গুরুচরণ একবার পিছন দিকে চাহিয়া আমায় অল্প একটু ঠেলিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, 'মা বিরূপ হলেন; আর কালীঘাটের ত্রিসীমানার মধ্যে থাকা চলবে না;—লড়াই পর্যন্ত তো নয়ই···ভেতরে আসুন সব বলছি—দোরটা বন্ধ করে দিন···'

গুরুচরণ যাহা বলিল, সেটা বুঝিতে হইলে তাহার পূর্ব পরিচয় একটু জানিয়া রাখা ভাল। সেটা সবিস্তারে বলিবার চেষ্টা না করিয়া একটা সংক্ষিপ্তসার দিতেছি। আমার সঙ্গে পরিচয়ের ইতিহাসটাও বারান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম।

গুরুচরণ অম্বিকাচরণের পুত্র। জীবিতাবস্থায় কালীঘাটের অম্বিকাচরণের যতটা নামডাক ছিল, এখন অবশ্য ততটা নাই।—নশ্বর জগতে কাহারই বা থাকে? তবুও অনেকেরই কিছু কিছু জানা থাকা সম্ভব বলিয়া, আর তাহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিলাম না। বাপের মৃত্যুর পর ছেলে অর্ডার-সাপ্লাই, ইন্সিওরেন্স, দৈব মাদুলি, হোমিওপ্যাথি, ম্যারেজ-বাই-পোষ্ট প্রভৃতি পাঁচরকম লইয়া ফলাও ব্যবসায়ের মালিক হইয়া বসিল। ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় অঙ্গ ছিল, কালীঘাটের যাত্রী ধরা। গুরুচরণের নিজের মুখের কথা,—'মায়ের দয়ায় একটা দলকে একবার যদি হোটেলটায় টেনে তুলতে পারি মশায়

তো, কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্দি—ছেলে বুড়ো, নেড়ি-গেঁড়ি নিয়ে আসে সব, ধান চাল বিক্রী ক'রে হাতে কিছু পয়সা নিয়ে। মা সেগুলি তাঁর সেবকের বাক্সয় তুলিয়ে দেন—মায়ের নিজের পূজো আছে;···তারপর বাচ্চাগুলোর মধ্যে দুচারটেকে বোধহয় অসুখেই পড়িয়ে দিলেন—হোমিওপ্যাথি চালালাম, কিছু এসে গেল; বৌয়ের ছেলে হয় না, দৈব মাদুলি গছিয়ে দিলাম,—দু' টাকা, আড়াই টাকা, চার টাকা, ছ'টাকা—যেমন পার্টি। কিছু ইনসিওরেন্সের কেসও করেছি ওদেরই জপিয়ে।'

যদি প্রশ্ন করিলাম—দৈব মাদুলিতে হয় ফল?—গুরুচরণ ডান চোখের কোণটা বুজিয়া ঠোঁটের বাঁ দিক কুঁচকাইয়া এক অদ্ভুত ধরণের হাসির সহিত বলে, 'হোল, ভালো, না হোলে 'ম্যারেজ-বাই-পোষ্ট' রয়েছে কি করতে? দোসরা বৌয়ের ব্যবস্থা করে দিই। আরও কিছু হাতে আসে জগন্মাতার দয়ায়।'

চোখ আর ঠোঁটের কোণ আরও চাপিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসে।

এসব ওদিককার কথা। তাহার পর লড়াই বাধিল; গোরা পল্টনে কলিকাতা ছাইয়া গেল। প্রথমে ইংরেজ টমি, তাহার পর অ্যামেরিকানরা আসিয়া তাহাদের জায়গা লইল। প্রথমে আসিয়া দিনকতক ঘরের কোণেই কাটাইল; তাহার পর ট্রামে, বাসে, রিক্সায়—চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলার ধরিল শিকারের নেশা,—অন্য শিকার নয়—ক্যামেরা শূটিং; আজব দেশ ইণ্ডিয়া—ইহার কোথায় কি বৈচিত্র্য আছে, ফটোগ্রাফির ফাঁদে ধরিয়া ফেলিতে হইবে······বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো ছেলের মতো ক্যামেরা হাতে টো-টো করিয়া ঘুড়িয়া বেড়ায়—কোথায় পোড়ো মন্দির, কোথায় একটা টিপি, কোথায় সাপুড়ে সাপ খেলাইতেছে······ক্যামেরাটা পেটের উপর ধরিয়া দাঁড়াইল, টিক্ করিয়া একটা শব্দ;—আবার অন্য শিকারের খোঁজে চলিল।—

ইণ্ডিয়াতেও যে আবার শিকার ধরিবার জন্য তা-বড়, তা-বড় শিকারীরা ওত পাতিয়া আছে, অতটা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না।······ইংরেজ নয় কি না—তাহারা বরং ঘা খাইয়া খাইয়া অনেক দোরস্ত হইয়া উঠিয়াছে, নিজের গণ্ডি ছাড়িয়া সহজে বাহিরে পা বাড়াইতে চায় না।

যখন এইরকম অবস্থা, একদিন কালীঘাটের দিকে গিয়া দেখিলাম গুরুচরণ সাইনবোর্ডে নিজের নামের পাশে একটা ড্যাস দিয়া বেশ গোটা গোটা

ঝক্‌ঝকে শাদা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে—Feet of Preceptor. অন্য কাজেই যাইতেছিলাম, কিন্তু বিশেষ কৌতূহল হওয়ায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া দুয়ারের কড়া নাড়িলাম। গুরুচরণ বাহির হইয়া বিস্মিতভাবে হাসিয়া বলিল, 'আরে আপনি! আমি ভাবলাম, বেটা স্টুয়ার্ট বুঝি জ্বালাতে......'

কথাটুকু যেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে এইভাবে থামিয়া গিয়া বলিল—'আসুন ভেতরে।'

বলিলাম, 'বসতে পারব না বেশিক্ষণ—লম্বা ইংরেজি টাইটেল দেখলাম—বাইপোষ্ট আনালে নাকি?'

গুরুচরণ ঠোঁটের কোণটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'ধোকা খেয়ে গেলেন আপনিও? আমারই নামের ট্রানশ্লেসান্ যে!—গুরুস্য চরণ ইতি গুরুচরণ—Feet of Preceptor.

সত্যই তো;—অতটা ভাবিয়া দেখি নাই হঠাৎ বিস্ময়ের ঝোঁকে। বিস্ময়টা কিন্তু লাগিয়াই রহিল, এবং উগ্রতর হইয়াই; প্রশ্ন করিলাম, 'তা হঠাৎ নামের অনুবাদ?'

গুরুচরণ চোখের কোণে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'অ্যামেরিকানরা এসে গেল যে!......'

তবু কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, 'আসুক, তার সঙ্গে Feet of Preceptor-এর কি সম্বন্ধ?'

হাসিটার মধ্যে ব্যঙ্গের অংশ বাড়াইয়া দিয়া গুরুচরণ বলিল, 'মাস্টারি করতেন কি না, এসব তত্ত্ব বুঝতে দেরী হবে। ব্যাটারা বিবেকানন্দের শিষ্য যে সব!—বেলুড়ে অতবড় মন্দির হাঁকড়িয়ে দিলে গুরুর—গুরু রামকৃষ্ণের পাথরের মূর্তি বসিয়ে। কেন, বিবেকানন্দের মূর্তি বসাতে পারত না?......জানে ইণ্ডিয়া গুরু পূজোর দেশ; শিষ্য গুরুর পায়ের তলায়।......মা-ই-বুদ্ধিটা বাতলে দিলে—চুরি নয়, চামারি নয়; নিজের নামের ইংরেজিটুকু ক'রে চোখের সামনে একটু ধরা। যেদিন বুদ্ধিটুকু হ'ল তার পরদিন নয়; তারপর দিন থেকে শুরু হয়ে গেল ব্যাটাদের আনাগোনা; দেখেন না সারাদিন কি রকম ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়? সব অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটির ছেলে—ইণ্ডিয়াকে জানতে চায়, দেখতে চায়, ইণ্ডিয়ার বই পড়তে চায়......'মিস্টার ফীট-অফ-প্রিসেপ্টার, তুমি রামকৃষ্ণ-ভিভেকানণ্ডা সম্বন্ধে কি জান? তোমাদের শাস্ট্রাজ্ পড়তে চাই'...

…সে এক এলাহি কাণ্ড—নাইবার খাবার ফুরসত পাওয়া যায় না।……পেটের ধান্দা করে ফুরসত নেই,—কে অত রামকৃষ্ণের খবর রাখে মশাই? ছিল একটা লোক এই পর্যন্ত জানি। চিৎপুরের গতি মণ্ডলকে গিয়ে ধরলাম—প্রেস আছে একটা, কিছু বই-টই ছাপায়। বললে—'কোথায় আছ? গোটাকতক কলেজের ছেলে ছটকে-ভটকে এসে পড়েছে—বাকি সব আমারই মতন অঘামারা; রামকেষ্ট-কথামৃত পড়বে না হাতি! খরচ ক'রে বই ছাপাই, তারপর উইয়ের পেটে যাক্।'

'গতি মণ্ডলের পরামর্শেই একটা স্কুলের ছেলেকে কিছু দিয়ে বিদ্যেসুন্দরের মতো খানকতক নামকরা বই ট্রানস্লেসান করিয়ে গতি মণ্ডলের প্রেস থেকে ছাপিয়ে ঘরে তুললাম; শাস্ত্র শাস্ত্র করছে, গতি মণ্ডল 'বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র' বলে একটা বইও দিলে ঢুকিয়ে। বই পড়ে কয়েক ব্যাটা গেল ভড়কে; আসা বন্ধ ক'রে দিলে। কিন্তু সে মাত্র কয়েকজন; তারা যেমন গেল, অন্য সবাই গাঁদি বেঁধে আসতে লাগল—'মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার, তোমাদের শাস্ট্রাজ দাও, আরও ট্রানস্লেসান ক'রে দাও'—সে এক এলাহি কাণ্ড, বইয়ের জোগান দিয়ে উঠতে পারি না।'

বলা বৃথা জানিয়াও বলিলাম, 'ঐ সব বই পড়ে আমাদের সম্বন্ধে কি একটা নিচু ধারণা হ'য়ে যাচ্ছে সেটা একবার ভেবে……'

বাধা দিয়া গুরুচরণ চোখের কোণে একটু হাসিয়া বলিল, 'ওদের সম্বন্ধেই বা আমাদের ধারণাটা কি উঁচু হচ্ছে মশাই? ব্যাটারা বিবেকানন্দের নাম ক'রে এসে বিদ্যেসুন্দর নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিচ্ছে।'

খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া একটু বক্র দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া আবার শুরু করিল, 'এই গেল শাস্ত্রের কথা। আসছে দুটো পয়সা ঘরে; মিছে কথা বলব না। তা ভিন্ন ফটো তোলার বাই আছে ব্যাটাদের।…আদি গঙ্গার ঘাটের জগন্নাথ, মহাবীর—হনুমান, মা-কালী, এই রকম কড়া কড়া দেবতাদের ফটো;—সেবায়েতদের সঙ্গে খাতির আছে, ব'লে ক'য়ে সুবিধে ক'রে দিই, তাতেও জগন্মাতার দয়ায় আসছে দু'পয়সা। দুকূলে অধর্ম হবে……'

ক্ষুব্ধভাবে বলিলাম, 'অন্ততঃ এইখানটায় বড়ই অন্যায় ক'রছ গুরুচরণ। আমাদের মূর্তিরহস্য ওরা জানে না, বোঝবার ক্ষমতা নেই; আমরা ভগবানের

রূপের দিকে কখনও ঝোঁক দিই না, সবই তাঁর রূপ—তাই ভগবান ব'লে যখন একটা এবড়োখেবড়ো পাথরকেও আশ্রয় করি—তখনও আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি আন্তরিকতা সমানভাবেই তার উপর গিয়ে পড়ে। ওরা সেটা তো মোটেই বোঝে না; আমাদের কালী, আমাদের জগন্নাথ, আমাদের হনুমানের ফটো নিয়ে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপে, এমন কি গালাগালিতে ওদের দেশের কাগজ ভরিয়ে······'

গুরুচরণের ডান চোখটা কোঁচকানই ছিল, হঠাৎ বাঁ ঠোঁট দুইটাও সঙ্গে সঙ্গে কোঁচকাইয়া লইয়া খিক্ খিক্ করিয়া একটু হাসিয়া লইল, বলিল,—'একবার দেখুকই না চটিয়ে; তাই জন্যেই তো দিচ্ছি সামনে ঠেলে—খিক্-খিক্-খিক্··· ···ওর মধ্যে একজন আবার কাঁচাখেকো দেবতা!'

—ওর সেই শয়তানি হাসি মুখে লইয়া চোখটা কুঞ্চিত করিয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

এ সবই পূর্বেকার ইতিহাস, পরিচয় হিসাবে দিলাম। এদিনে রাত দুপুরে আসিয়া কড়ানাড়ার কারণটাও গুরুচরণের নিজের ভাষাতে প্রকাশ করি।—

চেয়ারে বসিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, কোর্টমার্শেল হ'লে ব্যাটাদের কি করে বলতে পারেন?—ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কোর্টমার্শেল মানেই দাঁড় করিয়ে বুকে গুলি দেগে দেওয়া, এখন বুঝি আর······?'

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম—'কেন?'

'শুনলাম স্টুয়ার্ট ব্যাটার কোর্টমার্শেল হবে।······খতম ক'রে দিলে নিশ্চিন্দি হওয়া যেত আর কি।······সমস্ত পথ যে কি ধুক্‌পুকুনিতেই কেটেছে—কেবলই ভয় ঐ বুঝি ব্যাটা পড়ল এসে।···বাইরের দোরে কি খটখট আওয়াজ হ'ল একটা?'

বলিলাম—'না তো।'

গুরুচরণ নিশ্চিন্ত হইয়া শুরু করিল, 'গোড়া থেকেই সব বলি; সেই তো অ্যামেরিকান টমিদের কথা বলেইছিলাম আপনাকে,—বেশ দু'পয়সা আসতে লাগল। ফটোগ্রাফ তোলার দিক থেকে তো আসছেই, এদিকে বইয়ের কাটতিও চলেছে বেড়ে;—আজ দপ্তরি বেঁধে দিয়ে গেল; কাল নেই, সে এক এলাহি কাণ্ড! ওরই মধ্যে আবার একটু হোম-টোমও করি—ওরা হাঁ করে দেখে, ফটো নেয়;—মানে সবরকম টোপই ফেলে রাখলাম—যার যেটা

রোচে।……এর মধ্যে গতি মণ্ডলের পরামর্শে একটা মারণ বশীকরণের বইও ট্রানস্লেসান ক'রে বের করে দিই।……একদিন হোমের ব্যবস্থা ক'রছি—ঘরেই ক'রতাম—স্টুয়ার্ট ব্যাটা এসে ঘরে ঢুকল, হাতে ঐ বশীকরণের বইটা। চেয়ারে ব'সে বললে—'মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার, তোমাদের এই শাস্ট্রাজে যে বলেছে মানুষকে বশ ক'রে ফেলতে পারা যায়—এটা কি সত্যি ?'

কতই না প্রাণে লেগেছে এইভাবে বললাম—'আমাদের শাস্ট্রাজকে সন্দেহ ক'রছ সাহেব ? ওসব কি মানুষের লেখা যে মিথ্যে হবে ?……একথা শুনলেও যে আমাদের কান অপবিত্র হয়।'

'দুহাতে দুটো কান একটু চেপে ধ'রে, দুটো হাত কপালে ঠেকালাম—একটু ভড়ং চাইতো ? ছোঁড়াটা ভালো—একটু নিরীহ গোছের ; খুব 'কিন্তু' হয়ে বললে—'না, না, মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার—তুমি অফেন্স্ নিও না—তোমাদের শাস্ট্রাজ্ খুবই বড় আর বিশ্বাসযোগ্য—আমরা যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরছি, তোমরা তখন কত উন্নত!……আচ্ছা, একটা কথা—ঐ যে বলছ বশীকরণ, ওর আসল মানেটা কি? ধর, আমার যে গের্ল্—সে আর আমেরিকা থেকে চিঠি দিচ্ছে না—রাগ করেই হোক বা যে জন্যেই হোক ; তোমার ঐ বশীকরণে চিঠি এসে পৌঁছুতে পারে আমার কাছে ?'

একটু সাহস করে লেগে পড়তে হয়, বুঝলেন তো ? বললাম—'আলবত পারে। কি রকম একটা টান ধরবে!' বললে—'সে আমি খুব বিশ্বাস করি, মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার, ইণ্ডিয়ায় সব সম্ভব ; কি করতে হবে আমায় তা হলে ?'

বললাম—'দূরে রয়েছে—এক্ষেত্রে তোমার একটা মাদুলি ধারণ ক'রতে হবে।'

লাগে তুক্ না লাগে তাক্,—কে জানে সে বেটি বিয়ে থা ক'রে ব'সে আছে কিনা, একটু সন্দেহের রাস্তাও ছেড়ে রাখলাম, বললাম—'কাছে থাকলে কপালে মন্ত্রপূত সিঁদুর ছুঁইয়ে দিলে আর কোন কথাই থাকে না, তবু মাদুলিতে বারো আনা চান্স্ আছে।'

'নিশ্চয় তোমায় দিতে হবে মাদুলিটা, মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার!'—বলে একেবারে হামড়ে প'ড়ল।

হোমটা ওরই সামনে ঘটা ক'রে সেরে, খানিকটা ছাই একটা মাদুলিতে

পুরে দিয়ে দিলাম। বলতেও হোলনা—তু'খানি দশ টাকার নোট সামনে রেখে দিলে।······তা দেয় ভালো ওরা!

জগন্মাতার দয়া—তু'পুরুষ ধ'রে সেবা করছি তো কায়মনোবাক্যে?—ঠিক তিনদিন পরে—হোমিওপ্যাথিক ব্যাগটা নিয়ে বেরুচ্ছি—হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।—'মিস্টার ফীট্‌-অফ্‌-প্রিসেপ্‌টার, ওয়াণ্ডারফুল—ওয়াণ্ডারফুল তোমাদের শাস্ট্রাজ্‌! আজ সকালে প্রথম ডেলিভারিতেই আমার গের্‌লের চিঠি!—ওয়াণ্ডারফুল তোমাদেব কাণ্ড! ওয়াণ্ডারফুল তোমাদের ট্যালিস্‌ম্যান!'

সে-যে কি ক'বে প্রশংসা ক'রবে, তা যেন ভেবে পায় না; অথচ ব্যাটা ভেবে দেখলে না যে মাতুলি ধারণ কববাব অন্তত হপ্তাখানেক আগেই সেখান থেকে তাব চিঠি রওয়ানা হ'য়ে গেছে!······লবে পড়লে তো আর বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে না কিছু ব্যাটাদের······আরও দশটা টাকা বকশিশ দিলে!

অনেকক্ষণ ধ'রে নানা রকম কথা হ'ল—শাস্ত্রে আরও সব কি কি আছে, কোন্‌ শাস্ত্র কত পুরনো, কাবা সব লিখেছে—বিবেকানন্দ কোনো 'শাস্ট্রাজ্‌' লিখে গেছেন কিনা—নানান কথা। শেষকালে ওঠা-ওঠার সময় একটু কাঁচু-মাচু ক'রে বললে—'মিস্টার ফীট্‌-অফ্‌-প্রিসেপ্‌টার, একটা কথা বলতে চাই, যদি পারমিশান্‌ দাও······'

পাবমিশান্‌ মানেই তো কিছু আমদানি, কেন দোব না, বলুন না?······ বললাম—'স্বচ্ছন্দে বল।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—'ওয়াকাইয়েব এনটারটেনমেণ্ট গের্‌ল্‌ মিস্‌ ইলিয়টকে আমি মরিয়া হ'য়ে ভালোবেসে ফেলেছি, মিস্টার ফীট্‌-অফ্‌-প্রিসেপ্‌টার, আমাদের কোম্পানির ডানকান আর গীল্ড্‌ও তাকে চায়, কিন্তু আমি বেশ জানি তাদের ভালবাসা লড়াই পর্যন্ত। আমি ওয়ার থামলেই তাকে বিয়ে ক'রে অ্যামেরিকায় নিয়ে যাব; কিংবা সে যদি ইণ্ডিয়াতেই থাকতে চায়, আমিও এখানেই থেকে যাব—ওয়াণ্ডারফুল জায়গা হচ্ছে ইণ্ডিয়া। এখন কথা হচ্ছে, কি ক'রে বেচারিকে ঐ ডেভিল তুটোর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায়······তোমাদের বশীকরণ এতে সাহায্য ক'রতে পারে?'

গুরুচরণ তাহার সেই হাসি লইয়া আমার দিকে একটু চাহিয়া রহিল, বলিল—'বুঝুন শয়তানিটা—আমেরিকা থেকে গের্‌লের চিঠি আসা চাই,

আবার মিস্ ইলিয়টকেও পাওয়া চাই!……মনে মনে বললাম—'মরগে যা বেটারা, তোদের হালই ঐ, আমার দুটো পয়সা এলেই হ'ল!'

তবু একটু হাতে রাখলাম—জুয়া খেলাই হচ্ছে তো মশাই? স্টুয়ার্টকে বললাম—'পারবে না কেন?—পারে সাহায্য ক'রতে, তবে ব্যাপারটা একটু বেশি জটিল; গেবুলের চিঠি পাওয়া নয় তো, যে এক কথায় হয়ে যাবে!…'

বলা শেষও হয়নি, মনিব্যাগটা বের করে দশ টাকার পাঁচটা নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে দিলে। বললে—'তোমার শাস্ট্রাজ্ সব পারে মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার; যতই দেখছি, ততই আমার বিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে। তুমি ঠিক ক'রে দাও, আরও বকশিশ দোব তোমায়।'

জুয়াঁ খেলাই তো? একটু সন্দেহের রাস্তা রেখে দিলাম তবুও; বললাম—'মন্ত্রপূত সিঁদুর কপালে ছুঁইয়ে দিলে কোন সন্দেহই থাকত না; কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়; আমি তোয়ের করে দিচ্ছি, কোনরকমে একটু মিস্ ইলিয়টের রুমালে লাগিয়ে দিতে পার যদি—একটুও, তো আশা হয়। মানে, মিস্ ইলিয়ট যখন রুমালে মুখ মুছবে, একটু না একটু ছুঁয়ে যাবে কপালে, ষোল আনা না হোক, বার আনা চান্স্ থাকে।'

একেবারে উলসে উঠল—'মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার, যেমন তোমাদের শাস্ট্রাজ্ ওয়াণ্ডারফুল, তেমনি তুমিও একটা জীনিয়াস; অ্যামেরিকায় থাকলে প্রেসিডেন্ট হ'তে পারতে! এ যা রাস্তা বাতলালে এক বড় বড় নভেলিস্টদেরই মাথায় আসে……

সে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।……হোমিওপ্যাথিক বাক্স রেখে দিয়ে ব'সে গেলাম হোমে……'

গুরুচরণ হঠাৎ জিভটা কামড়াইয়া, মাথাটা একটু দুলাইয়া নিজের হইতেই বলিল—'রামঃ, তা কি পারি—জগন্মাতার সিঁদুর দিতে? কি একটা গো-পার্বণ ছিল, বৌ গরুটার ক্ষুরে তেল-সিঁদুর লাগিয়ে দিয়েছিল, তারই খানিকটা, একটা কচুপাতায় মুছে এনে, হোমের পাশে রাখলাম; শেষ হ'লে জল ছিটিয়ে স্টুয়ার্টের হাতে দিয়ে দিলাম। ওঠবার সময় আরও একখানি দশ টাকার নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে বললে—তোমাদের শাস্ট্রাজ্ যদি মনস্কামনা পূর্ণ করে তো আরও বকশিশ দোব; মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার। ভয়ঙ্কর ভালোবাসি আমি মিস্ ইলিয়টকে।'

এবারেও তুক্‌টা লেগে গেল,—ত্রু-পুরুষ ধ'রে কায়মনোবাক্যে জগন্মাতার সেবা ক'রছি তো?......দিন সাতেক আর স্টুয়ার্টের দেখা নেই, ভাবলাম দিলে বুঝি ব্যাটাকে আসামে ঠেলে; একটা ভালো খদ্দের হাতছাড়া হ'ল! এমন সময় হঠাৎ একদিন স্টুয়ার্ট এসে হাজির।......'কি সাহেব, ব্যাপার কি?' —'না, সব ঠিক হয়ে গেছে মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার। ডানকানটাকে আসামে পাঠিয়ে দিয়েছে; বাকী ছিল গীল্ড, তার সঙ্গে মিস ইলিয়টের হঠাৎ চটাচটি হ'য়ে গেল একদিন—হাউ ওয়াণ্ডারফুল তোমাদের শাস্ট্রাজ্, মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার!—এদেশে যে ভিভেকানণ্ডার মতন লোক জন্মাবে—আমি মোটেই আশ্চর্য হচ্ছিনা।......অবশ্যি বিয়ে এখন সম্ভব নয়, তবে আমার আংটি-বদল হ'য়ে গেছে।'

ছোঁড়াটা বড় ঘরের ছেলে, হাতে একটা হীরের আংটি ছিল, তার জায়গায় একটা ম্যাকমেকে পাত্‌লা মামুলি সোনার আংটি।—ছুঁড়িটা গছিয়েছে আর কি!......মনে মনে বললাম। তোমায় গেরোয় ধ'রেছে আমি কি করব? আংটিটা আগে দিয়ে দিলে আব সিঁদুরের হাঙ্গাম ক'রতে হ'ত না।......যাই হোক, সব ব'লে ক'য়ে—'হিয়ার ইউ আর'—বলে পাঁচখানি পাঁচ টাকার নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে দিলে।

ভাবটা কিন্তু কেমন যেন চনম'নে—যেন কি একটা ব'লতে চায়, জুত ক'রে উঠতে পারছে না। তারপর খানিকক্ষণ একথা সেকথা বলার পর ব'লেই ফেললে। বলে—'মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার, এই যে বশীকরণ ব'লে ব্যাপারটা তোমাদের শাস্ট্রাজে রয়েছে, এটা কতদূর পর্যন্ত লাগসই হয়? ধরো—এই ধরো—কোন ফেরোশাস্ জানোয়ার—যেমন ধরো একটা টাইগার—তাকেও কি বশ ক'রে ফেলা যায়?'

ঘরে একটা সিংহবাহিনী ছবি টাঙান ছিল, বললাম—'তোমার সন্দেহ হচ্ছে? না হ'লে, ওটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল, সাহেব? তবে সিঁদুরটা আগে ছোঁয়াতে হবে তো?'

বললে—'না, একেবারেই সন্দেহ নেই মিস্টার ফীট্-অফ্-প্রিসেপ্টার; তোমাদের শাস্ট্রাজ্ সব পারে—ওয়াণ্ডারফুল ক্ষমতা!'

ব'লে একটু চুপ ক'রে ভাবলে, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে ব'ললে—'তাহলে তোমায় আসল কথাটা বলি—আমাদের কোম্পানির অফিসার, ব্যাটা উডল্যাণ্ড

অত্যন্ত হারামজাদা, একটা ম্যান-ইটার টাইগারও তার কাছে ভেড়া, মিস্টার ফীট্‌-অফ্‌-প্রিসেপ্‌টার! উঠতে বসতে আমাদের যে কি নাকালটাই করে! বিশেষ ক'রে নজর হাজরির ওপর; একটু যদি এদিক-ওদিক হ'ল তো আর রক্ষে থাকে না। তবুও চালিয়ে যাচ্ছিলাম কোন রকমে, কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রাজের জোরে এখন মিস ইলিয়টের মনটা একটু আমার দিকে ঢলেছে—এই সময় অত কড়াকড়ির মধ্যে থাকলে সব ভেস্তে যেতে পারে; তাই বলছিলাম—ও ব্যাটাকেও একটু হাত করবার যদি ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারতে……'

একটু লোভে পড়ে গেলাম মশাই—ব্যাটার দেওয়ার হাতটা খুব দরাজ কিনা। ব'ললাম, 'হবে না কেন?—হবে; তবে ব্যাপারটা বড়ই জটিল—মিস্ ইলিয়টের মতন মেয়েছেলে নয় তো যে……'

দশ টাকার দশখানি আনকোরা নোট চৌকির ওপর বিছিয়ে দিয়ে ব'ললে—'জটিল তোমার সোজা ক'রে দিতেই হবে, মিস্টার ফীট্‌-অফ্‌-প্রিসেপ্‌টার, তুমি টাকার জন্যে ভেব না; মিস্ ইলিয়টকে ভালোভাবে পাবার জন্যে আমি সমস্ত অ্যামেরিকাটা দিয়ে দিতে পারি।'……

সে বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা।

গুরুচরণ একটা বিড়ি ধরাইয়া কয়েকটা টান দিল, তাহার পর আবার বলিতে লাগিল—'মিস ইলিয়ট একটা মেয়েছেলে, তায় সর্বদা মেলামেশা আছে, তার রুমালে একটু সিঁদুর লাগিয়ে দেওয়া শক্ত নয়; কিন্তু এ একটা অফিসার।—কি হয়, কি হয় একটা ধুক্‌পুকুনি লেগে রইল সমস্ত দিন। এসব কাজ তো একলা হয় না—একেবারে গোরা পল্টন নিয়ে ব্যাপার!—য'তে বাগদীকে হাত করেছিলাম। সে ওদের ক্যাম্পে কাজ করে, খবরটা আসটা দেয় মাঝে মাঝে। একটা বিয়ের কথাবার্তা ঠিক করেছিলাম, বিছানায় বসে কুষ্টি দুটো মিলোচ্ছি, এমন সময় য'তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। 'কিরে ব্যাপারখানা কি?' ……বললে—'পালাও গোসাঁইঠাকুর, এদেশ ছেড়ে পালাও; একটু ছাড়া পেলেই আগে তোমার ঘাড় মটকাবে!'

তার মুখেই সব শুনলাম। বলে—'কত অফিসার এল গেল, গোসাঁইঠাকুর—ব্যাটা উডল্যাণ্ডের মতন এমনটা আর চোখে প'ড়ল না! হাঁড়ির মতন এই এতখানি রাঙা টকটকে মুখ, নাকের নীচে এক খাবলা গোঁফ, চোখ দুটি

বাঘের মতন সর্বদাই জ্বলছে!—আর বউ-কাঁটকী শাউড়ির মতন অষ্টপ্রহর টমি-গুলোকে দাঁতে পিষছে। অনেক তো দেখলুম—কিন্তু অমন দুশমন অফিসার দেখিনি!

স্টুয়ার্ট তোমার কাছ থেকে সিঁদুর তো নিয়ে গেল; ছোঁক্-ছোঁক্ করে, কিন্তু দেবার সুবিধেই পায় না। শেষে রাত্তিরে একটু সুবিধে ক'রে দিলেন মা-কালী। খোলা তাঁবুর নিচে উডল্যাণ্ড সাহেব ঘুমুচ্ছে—নাক ডাকছে, যেন আকাশের বাজ খসে পোলো; স্টুয়ার্ট সাহেব আমায় ডেকে বললে—'এই অবসর! য'তে, যা গিয়ে সিঁদুরটা ছুঁইয়ে আয়।......শোন কথা! আমি ঐ বুনো বাঘের মাথায় সিঁদুর ছোঁয়াই গে! বললাম—'কাজটা কিছু শক্ত নয় সাহেব, এক্ষুণি যেতে পারি; কেননা, যেই ছোঁয়াবো, তেক্ষুণি তো বশে এসে যাবে কিনা; তবে কথা হচ্ছে, তাতে তোমার তো কোন লাভ হবে না।'

শুনে কি ভাবলে রগ দুটো চেপে। তারপর বললে—'আচ্ছা, তুই দেখ, কেউ আসে কিনা।'

'অফিসারগুলো নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোয় ব'লে বড় সাহেব এদিকে পাহারা একটু ঢিলে করিয়ে দিয়েছিল। ফাঁক বুঝে স্টুয়ার্ট তো খুট ক'রে তাঁবুর ভেতর ঢুকে পড়ল। একটা বড় দেবদারু কাঠের বাক্সের পাশে আড়াল হ'য়ে আমি দেখতে লাগলুম!......গুটি গুটি ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের পাশে মাথার পেছনটিতে গিয়ে বসল, দুবার হাতটা ঘুমন্ত অফিসারের কপালের কাছে নিয়ে গিয়ে টেনে আনলে, তারপর দুগ্গা-সিহরি ব'লে দিলে আঙুলটা ঘ'সে—লাগা-মাত্তরই বশ হয়ে যাবে কিনা!

'মনে হ'ল যেন জাপানী বোমা খসে পড়ল, গোসাঁইঠাকুর! 'হুজ্যাট্?' বলে কঁ্যাক ক'রে স্টুয়ার্টের হাতটা ধ'রে চরখির মতন ঘুরে বসল সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে বাতিটা দিলে জ্বেলে।—সতীলক্ষ্মী ঘোষাল গিন্নীর মতন এক গাদা সিঁদুর সেই প্রকাণ্ড কপালে রগ্-রগ্ ক'রছে!'

য'তে বাগ্দি এই পর্যন্ত দেখেছিল, তারপর প্রাণ নিয়ে সটকে পড়ে। তার পরেই বলে সে কী হৈ চৈ!—সমস্ত ক্যাম্প্টা যেন ওলটপালট হ'য়ে গেল।

কোর্টমার্শাল হবে স্টুয়ার্টের, তবে কি সাজাটা হবে বলতে পারলে না য'তে; বললে—'ফুরসত পাওয়া মাত্তরই খবরটা দিতে ছুটে এলাম গোসাঁই-

ঠাকুর। যদি ছাড়া পায়, তো তোমায় ধনে-প্রাণে মারবে ব্যাটা স্টুয়ার্ট ; যা চাউনি দেখলাম চোখে !'

শেষ করিয়া গুরুচরণ বলিল—'এই অবস্থা, এখন ভাবছি—দিল্লী পালাই কি বম্বে ?—এ তল্লাটে তো আর থাকা চলবে না।' বললাম—'দিল্লীই বোধহয় তোমার সুবিধে হবে, কালীবাড়ি আছে একটা।'

গুরুচরণ তাড়াতাড়ি হাত দুইটা যুক্ত করিয়া ঠেকাইল, বলিল—'আবার কালীবাড়ি !—দু-পুরুষ ধ'রে কায়মনোবাক্যে সেবা করলুম—এই তার পুরস্কার হ'ল মশায় ?—একেবারে ভিটে থেকে উজোড় করে দেওয়া !'

গড়ের বাদ্যি

একটি প্রায় সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা দোরগোড়ায় বসিয়াছিল, আমি সামনে গিয়া পড়িতেই অর্ধেক ঘোমটা টানিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। স্বরূপ মণ্ডল আমাকে দেখিতে পাইয়া চরকার হাতটা থামাইয়া অভ্যর্থনা করিল—'আসুন দাদাঠাকুর, পাতঃপেন্নাম হই। এবারে অনেক দিন বাদ দিয়ে এলেন মস্‌নেতে।'

বলিলাম—'সে ছিল বোমার ভয় স্বরূপ, পালিয়ে পালিয়ে আসতে হোত। নৈলে কলকাতার লোকের বাইরে আসা যে কি শক্ত বুঝবে না তো। আমরা এক আলাদা জীবই হয়ে দাঁড়াই যে।'

মোড়ার উপর গিয়া বসিলাম, স্বরূপ নাতিকে তামাক আনিতে বলিয়া আলাদা জীবের কথায় একটু হাসিয়া হাতটা চালাইতে চালাইতে বলিল—'তারপর খবর কি কন শুনি!'

বলিলাম—'খবর তো দেখতেই পাচ্ছ? যারা ম'ল এখন তাদের কথা ভেবে হিংসে হচ্ছে, তবু কোমরে একখানা করে কাপড় সুদ্ধ্যু মানে মানে সড়ে পড়েছে, এখন চালের এক রকম ব্যবস্থা হয়েছে, বাঁচতেই হবে, কিন্তু......'

স্বরূপ 'কিন্তু'র পরের অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়া একটু হাসিয়া আবার হাতটা থামাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—'গদার মাকে তো এতক্ষণ সেই কথা বলছিলুম দাদাঠাকুর, বলি দেখে রাখ্—এতবড় কারবারটা চালাচ্ছে তার ভোজবাজিটা একবার দেখে রাখ্—গোড়ায় চরকা, তাঁতীর তাঁত; তারপর দিনকতক বিলিতী কলের কাপড়, এলাহি কাণ্ড, কে কত পরবি পর; তারপর ধো উঠলো আগুনে দে ওগুলোকে; তারপর স্বদেশী কল; আবার নেও কত কাপড় নেবে; তারপর এখন এক কথায় বাজার ফরসা; আবার ডাক্ তাঁতীকে, নে আয় চরকা।......চারকুড়ি বয়েস হতে চলল, অনেক......'

এমন সময় খানিকটা দূরে কোথায় ঝম্‌ঝম্ করিয়া ব্যাণ্ডের আওয়াজ উঠিল। স্বরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল; ও প্রসঙ্গটাই ছাড়িয়া দিয়া স্বরটা খাদে নামাইয়া বলিল 'গড়ের বাদ্যি!'

একটু যেন ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া আবার চরকা চালাইতে সুরু করিয়া দিল।

স্বরূপের এইসব অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, হাসির টুকরা প্রভৃতির অন্তরালে বড় বড় গল্প লুকাইয়া থাকে, প্রশ্ন করিলাম—'হাসলে যে মোড়লের পো ?'

স্বরূপ বলিল—'এই চারকুড়ি বয়সের মধ্যে মসনেতে শুদু একটিবার বাদ্যি শুনেছিনু দাদাঠাকুর, হ্যাঁ, যাকে গড়ের বাদ্যি বলতে হয়! আর একি ছেলেখেলা! মেয়েরা ওদিকে উলু দিচ্ছে আর ঢাক আর দুটো পেতলের বাঁশি নিয়ে—ভ্যাপ্পো ভ্যাপো, ভ্যাপ্পো ভ্যাপো ; কী না মিত্তিরদের মেয়ের বিয়েতে গড়ের বাদ্যি হচ্ছে! বাজনাটার জাত মেরে দিলে বেটারা দাদাঠাকুর, হাসি কি সাদে আসে ? অনেক দুঃখে।'

স্বরূপের নাতি তামাক লইয়া আসিল। হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলাম, 'একটু অন্য জায়গায় বরাত ছিল, তা একটু বসে শুনেই যাই খাঁটি গড়ের বাদ্যির ব্যাপারখানা কী। নাও, শুরু করো।'

স্বরূপ বলিল, 'তা বৈকি দাদাঠাকুর, গড়ের বাদ্যি একবার শুনে যদি জীবনভোর না মনে গেঁতে বসে রইল তো আবার গড়ের বাদ্যি বলতে হবে তাকে ?...তাহলে দিন একটু পেসাদ পেয়ে নি।'

বাঁ হাত দিয়া ডান হাতটা স্পর্শ করিয়া স্বরূপ কলিকাটা তুলিয়া লইল, কয়েক টান দিয়া আবার সেইভাবে বসাইয়া বলিল, 'আমার বয়স তখন কতই বা হবে,—এই ধরুণ দশ, তার বেশি নয় ; সেই সময়কার কথা। চৌধুরী-বাড়ির কত্তা ত্যাখন দামোদর চৌধুরী। মানুষটো যে কেমন ছেল তা কি করে বোঝাই আপুনিকে ? সে ধরনের মানুষই যে নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে। ইয়া গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা, এই টানা চোখ, এই টানা ভুরু ; এদিকে যেমনি লম্বা তেমনি আড়ে। গলার আওয়াজ ছিল তেমনি, একটা যদি হাঁক দিলেন তো সদর থেকে অন্দর পর্যন্ত ঐ অতবড় দেউড়িখানা যেন গমগম করতে থাকত। ঐ যে বল্লু দাদাঠাকুর, সে ধরনের মানুষ নোপাট হয়ে গেল ধরাতল থেকে তো আপুনিকে বোঝাই কি করে ?'

দোষ কি ছেল না ? ছেল। অব্বিশ্যি এখনকার হিসাবে বলছি, ত্যাখন-কার দিনে জমিদারের মধ্যে সেগুলো দোষের মধ্যে ধরবার রেওয়াজ ছেল না। তা, না ধরলেই যে দোষের হবেনা এমন কথা তো নয়, দাদাঠাকুর। চৌধুরীদের বংশটাই একটু কি-যে বলে, ইয়ে ছিল ; তার মধ্যে আবার দামোদর চৌধুরীর

দাপট পূর্বের সবাইকেই গেছল ছাড়িয়ে। ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, কি মানুষকে মানুষ গুম করে ফেলা এগুলো তো ধর্তব্যের মধ্যেই ছেল না, ডাকাতি করে গাঁ-কে-গাঁ লুটে নিয়ে আসা পর্যন্ত নিত্যিকার ব্যাপার ছেল। তবে নিজের জমিদারিতে নয়। তুমি পাশের জমিদার, মাথা তোলবার চেষ্টা করচ, সমস্ত জমিদারি তচনচ করে এমন ঠাণ্ডা করে দিলে যে আর দু'পুরুষ ধরে মাথা তোলবার জো রইল না। তা, একেবারে ঠাণ্ডা তো করা যেত না, কেননা সবারই নিজের নিজের নেটেড়ার দল ছেল, তাই অষ্টপহরই দাঙ্গা-ফেসাদ লেগে থাকত, দাদাঠাকুর—দেশটা এমন জুড়িয়ে যায়নি। আজ দামোদর চৌধুরীর দল কার্তিকপুরের রায়েদের জমিদারিতে পড়ল তো, কাল রায়েদের দল মসনের আশেপাশে এসে হানা দিলে; কিছু মাথা নিয়ে গেল, কিছু মাথা রেখে গেল, এই রকম। আপুনি আমি রেয়ৎ, কিছু খোয়ালুম, না হয় দু'একজন জানই দিলুম, কিন্তু সমস্ত ধকলটা তো ওনাদেরই সামলাতে হ'ত, দাদাঠাকুর। তা, ঠাণ্ডা মেজাজে তো সে হবার জো নেই, তাই একটু একটু করে নেশাপত্তর এসে পড়তই, দামোদর চৌধুরীর উপর ধকলটা ছেল বেশি, তাই নেশারও একটু বাড়াবাড়ি ছেল; শাদা চোখে তানাকে বড় কম দেখেছি, দাদাঠাকুর। ঐ-যে পদ্মপলাশ-লোচনের মতো দুটি চোখ, সব্বদাই রক্তজবার মতন রাঙা টকটক করতো। শুধু দুটি মাস ছেল শাদা; একদিন দু'দিন করে গোনা-গুনতি দুটি মাস, তাইতেই চারিদিকে সামাল সামাল রব উঠে গেছল।'

মন্তব্যটা একটু নূতন ধরনের হওয়ায় হুঁকা থেকে মুখ সরাইয়া বলিলাম, 'বুঝলাম না, স্বরূপ।'

স্বরূপ বলিল, 'সবটা না শুনলে বুঝবেন না।'

তুলা ফুরাইয়া গিয়াছিল, নূতন খানিকটা লইয়া আবার সূতা কাটা চালু করিয়া বলিতে লাগিল—'ময়নাগাছির চিন্তামণি ঠাকুর ছিলেন দামোদর চৌধুরীর বোনাই। ওনাদের পছুবি রায়-রায়াণ। নবাবী আমলে মস্তবড় তালুক ছেল, এদিকে এসে মাত্তোর কয়েকখানা গ্রামে ঠেকেছিল। তা, বিষয় তো পদ্মপত্রের জল দাদাঠাকুর, সব সময় সমান থাকে না; তবে চিন্তামণি ঠাকুর নিজে বড় ধড়িবাজ লোক ছিলেন, আর সমুন্দির ওপর তাঁর দাবটা ছিল খুব বেশিরকম। লোকে বলত দামোদর চৌধুরীর মাথায় যতরকম কুমতলব খেলত, তার বারো আনা চিন্তামণি ঠাকুরের। মসনে থেকে ময়নাগাছি

বেশি দূরও নয়, যাওয়া-আসাটা নেগেই ছেল। নেশার দোষটা ওনার আবার একটু বেশি ছেল, বোনাই সুমুন্দি একত্তর হলে বেশ একটু বাড়াবাড়ি হ'ত।

'একদিন পালকি থেকে নেবে চিন্তামণি ঠাকুর বললেন, 'দামোদর, ভেবে দেখলুম সংসারটা কিছুই নয়, আমরা হীরে ফেলে কাচে গেবো দিয়েছি। বড়ই অনুতাপ হচ্ছে মনে।'

'অন্য এক পালকিতে একজন বোষ্টমবাবাজী বসে ছেল। দামোদর চৌধুরীব দাপটের কথা শুনে নামতে হেম্মৎ পাচ্ছেল না; চিন্তামণি ঠাকুর নিজে গিয়ে তেনাকে ডেকে নিয়ে এলেন। তিনজনে গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন।'

'কি মন্তর ঝাড়লে নারায়ণ জানেন, দাদাঠাকুর, তারপর দিন থেকেই দামোদর চৌধুবী একেবারে অন্য মানুষ। আমার বাবা ছেল চৌধুবী-মশায়ের খানসামা, হুকুম হ'ল নেশাপত্তোরের যা কিছু সবঞ্জাম সব বড়পুকুরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। দলেব যেসব নেটেড়া ছেল সবার লাঠি একত্তর করে দেউড়ির সামনে খোলকত্তাল বাজিয়ে জ্বালানো হ'ল; কালীমন্দিবে রোজ জোড়া পাঁটা পড়ত, তাব জায়গায় চারটে করে চালকুমড়োর ব্যবস্থা হ'ল। হপ্তাখানেক থেকে, বেশ মোটারকম বিদেয় নিয়ে বোষ্টম-বাবাজী বিন্দাবন চলে গেল; চিন্তামণি ঠাকুব সঙ্গে রইল, তেনা আবার আরও বেশি করে ভিড়ে গেছল কিনা, সংসার একরকম ত্যাগ করেই ল্যাঠা চুকিয়ে এসেছিল।'

'পাঁটার জায়গায় কুমড়ো বলি হোক, তাতে এমন কিছু যায় আসে না, দাদাঠাকুর; কাল হ'ল, এর সঙ্গে ঝোঁক চাপল লোকের ভালো করবার। রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে এসে ভালো করবার ঘটায় লোকের পথচলা দায় হয়ে উঠল, দাদাঠাকুর। দান, ধ্যান, পুকুর খোঁড়ানো, ঘটা করে মন্তর দেওয়ানো —এইসব নানান কাণ্ডয় হুহু করে টাকা বেরিয়ে যেতে লাগল। আগে লুটতরাজে মা-লক্ষ্মীর কিরপেয় একটা নিত্যিকার আয় ছেল, এখন সুদুই খরচের পালা—দিন কতকের মধ্যেই ত'বিল ফাঁক হয়ে এল। ওদিকে রানীমা, এদিকে দাওয়ানজী বুঝুতে লাগলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে? মাথায় সেঁধে বসে গেছে—চিরকাল পাপ করে এলুম, এবারে নুন আদা খেয়ে পুণ্যি

করতে হবে। আর বিষয়-সম্পত্তি নিয়েই তো যত পাপ? ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে হাঁপিয়ে উঠলেন দামোদর চৌধুরী। বোষ্টম বাবাজী একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল আর কি!'

'কেরমে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল: দামোদর চৌধুরী মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইয়ের হাতে বিষয়-সম্পত্তি সঁপে বিন্দাবনে গিয়ে বাস করবেন। এতবড় জমিদারি, এমন সম্পত্তি, আর ওয়ারিশ মাত্র ঐ মেয়ে, অনেকের নোলাতেই জল এল, চারিদিক থেকে ঘটকের আমদানি হতে লাগল। আর সব সম্বন্ধ যা এল তা এল, একটা সম্বন্ধ এল কুসমির জমিদারের বাড়ি থেকে। সবার ধড়ে যেন প্রাণ এল।'

প্রশ্ন করিলাম, 'খুব ভালো বংশ বুঝি?'

'অতবড় পাজি জমিদার বংশ এ তল্লাটের মধ্যে আর ছেল না, দাদাঠাকুর; তার ওপর মসনের এনাদের সঙ্গে সাতপুরুষের আড়াআড়ি। মসনের এনারা যদি উত্তুর দিকে যায়, কুসমির ওনারা যাবে দক্ষিণ দিকে; কুসমি যদি মসনের সং বের করে তো মসনে কুসমির বাবুদের নিয়ে যাত্রার পালাকে পালা বেঁধে ফেলে; এর ওপর দাঙ্গা-ফ্যাসাদ তো বছরে দু'তিনটে নেগেই আছে। তবে যে বল্লু ধড়ে প্রাণ এল, তার হেতু হচ্ছে—সবাই ভাবলে কুসমির ওখান থেকে বিয়ের সম্বন্ধ, দামোদর চৌধুরী গালমন্দ করে জবাব দেবে, ওদিক থেকেও ওতোর গাইবে, আবার রক্ত গরম হয়ে উঠবে দামোদর চৌধুরীর, আবার আগেকার দিন ফিরে আসবে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়েই যত সব অনথ্থ হতে নেগেছে তো? কিন্তু বোষ্টম বাবাজী দামোদর চৌধুরীর আর কিছু বস্তু রেখে যায়নি, দাদাঠাকুর। ঘটক এল সকালে, দাওয়ানজী নিজে গিয়ে এস্তালা দিলেন, কিছু কিছু কান-ভাঙানিও যে না দিলেন এমন নয়; তখুনি তখুনি উত্তর না দেওয়ায় সবাই আশা করলে দিন বুঝি ফিরল, বাগদীপাড়ায় দলের যারা কত্তার হুকুমে লাটি ছেড়ে খোল-কত্তালে হাত পাকাচ্ছেল, তারা পর্যন্ত নোতুন লাটির যোগাড়ে বেরুল, বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল ভেতরে ভেতরে; এমন কি এও আশা করলে অনেকে যে বউনিটা বুঝি ঘটকের ওপর দিয়েই হবে, তানাকে আর আস্ত ফিরতে হবে না মসনে থেকে।'

'বিকেলবেলায় বৈঠকখানায় ঘটকের ডাক পড়ল। দামোদর চৌধুরী নিজে উঠে তানাকে খাতির করে বসালেন। বোষ্টমদের আবার একটা আইন

আছে না, দাদাঠাকুর, যে ঘাসের চেয়েও নিচু হয়ে থাকতে হবে লোকের কাছে সেই ভাবে কত নিচু হয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে বললে, "কুসমির সঙ্গে সম্বন্ধ সে তো আমার পরম সৌভাগ্যি, আমার বংশের সৌভাগ্যি, আমার মেয়ের কী এত কপালের জোর যে কুসমির দেউড়ির এক কোণে তার ঠাঁই হবে?"... মানে, সত্যিকথাটা বলব না মনে মনে পাকা করে নিলে লোকে যত বাড়িয়ে বলতে পারে আর কি। আসল কথা, ভালো হবার বাই চেগেছে কিনা, তা যে যত বড় শত্রু, তার সঙ্গে তত বেশি আত্তি না দেখালে তো ভালো হওয়া হবে না, তাই সমস্ত দিন ভেবেচিন্তে ঐ সাব্যস্ত হয়েছে, মানষের সঙ্গে বৈরী ভাব একেবারে মিটিয়ে ফেলতে হবে কিনা, বোষ্টম বাবাজী যে কানে মন্তোর ফুঁকে দিয়ে গেছে। ঘটক একখানা রূপোর থালা, একটা রূপোর বাটি আর একটা রূপোর গেলাস বিদেয় নিয়ে ফিরে গেল। একেবারে অনেক আশা করেছেল, ব্যাপার দেখে মসনের লোক যেন একেবারে মুষড়ে পড়ল। ঠিক একমাস তেরদিন পরে বিয়ের দিন ধায্য হ'ল। ...পেসাদ আর আছে, দাদাঠাকুর?'

হুঁকাটা বাড়াইয়া ধরিতে, কলিকাটা তুলিয়া লইয়া স্বরূপ বেশ সযত্নে কয়েকটি টান দিল, তাহাতে সব সত্ত্বটুকু নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায় নাতিকে ডাকিয়া আবার নূতন করিয়া কলিকাটা সাজিয়া আনিতে বলিয়া আবার চরকার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটা আরম্ভ করিল—'একমাস তেরদিন পরে বিয়ের দিন ধায্য হ'ল। দেউড়িতে তো হাহাকার পড়ে গেল, দাদাঠাকুর। চৌধুরী মশাইয়ের মেয়ের নাম ছেল দুর্গা। তা অমন চেহারা মিলিয়ে নাম এপয্যন্ত কেউ রাখতে পারেনি, ঠিক যেন সেরা কুমোরের হাতে গড়া প্রিতিমাটি: যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি কপাল, তেমনি মুখের আদল, আর তেমনি চুলের ঢাল। স্বভাবটিও কি সেই রকম?—মুখে একটি উঁচু কথা নেই, আর সেই এতটুকু থেকে নিয়ে এতবড় পয্যন্ত সব্বার উপর সমদৃষ্টি; কে বলবে ঐ বাপের ঐ মেয়ে! তার সম্বন্ধ ঠিক হ'ল এক জরদ্গবের সঙ্গে, দাদাঠাকুর! যেমন মোটা, তেমনি খাড়াই, তেমনি কুচ্ছিত, তেমনি কালো, বয়েস য্যাখনকার কথা বলচি ত্যাখন তার প্রায় তিরিশ হবে। এক ছেলে, একটি পরিবার হজম করে বেলল্লা হয়ে বেড়াচ্ছে। হেন কুকাজ নেই যা কুসমির কুমার করেনি বা করতে পারে না। বিয়ে করতে চায় না; বলে, একেবারে ডানাকাটা পরী না

হ'লে বিয়ে করব না। এদিকে নিজে তো ময়ূর-ছাড়া কার্ত্তিক, কোনও মেয়ের বাপই ঘেঁষতে চায় না।'

'বলবেন তবে চৌধুরীমশাই ঝপ করে রাজী হ'লেন কেন? সেখানেও ঐ সব্বনেশে ভালো হওয়ার নেশা, দাদাঠাকুর। ভালো হওয়া মানে দাঁড়িয়ে গেল তো, নিজের ভালো না করা ; তা য্যাতো বেশি মন্দ হয় নিজের ত্যাতোই ওদিকে ভালোর পাল্লা ঝুঁকবে না?—ত্যাতোই বেশি পাপ ক্ষ্যায় হবে না? যাদের সঙ্গে সাতপুরুষের আড়াআড়ি, তাদের পায়ে যদি মাথা পেতে দিতে না পারলুম, একেবারে একটা ডাহা অখণ্ডের হাতে যদি সোনার কমল না ভাসিয়ে দিতে পারলুম তো, আর ভালো হলাম কৈ?…কথাটা এইদিক থেকে দেখতে হবে দাদাঠাকুর, তবে এর মর্মগেরণ হবে।'

'দেউড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। নিজে হার মেনে রানীমা আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল চুপি-চুপি চিঠি লিখিয়ে সবাইকে ডাকিয়ে আনালে—দুই ননদ, এক খুড়-শাশুড়ী, দুই পিস-শাশুড়ী—সবাই এসে যথাসাধ্যি বোঝালে, কান্নাকাটি করলে, অন্নজল বন্ধ করলে ; উহুঁ, সেই যে কোট ধ'রে ব'সে রইলেন, নড়ায় কার সাধ্যি।'

বলিলাম, 'কিন্তু এই বলছ, এত ভালোমানুষ হয়ে গেছেন, এত দয়া সবার উপর, অত লোকের অত কান্নাকাটিতেও মন টলল না? তা ভিন্ন গুরুজনরাও এসে ধরে পড়লেন বলছ…'

স্বরূপ হাত থামাইয়া আমার পানে চাহিল, একটু হাসিয়া বলিল, 'এ সামান্যি কথাটা আর বুঝলেন না, দাদাঠাকুর? দয়া, য্যাতক্ষণ পরের ওপর, নিজের পরিবার, ছেলেমেয়ে—তাদের ওপর দয়া তো আর দয়া হ'ল না। তেমনি ভক্তি,—য্যাতক্ষণ সে পরের ওপর, নিজের বাপ-মা, খুড়ি-পিসি—এদের ওপর ভক্তি, এদের বাধ্য হওয়া—সে তো ঘরোয়া ব্যাপার, তার মধ্যে আর মর্য্যেদাই বা কোথায়, পুণ্যিই বা কোথায়? বাইরে দয়া, ধম্ম, নিচু ভাব—যাই বলুন, তা ব'লে মেয়ের মুখ চাইতে হবে, পরিবারের বুক চাপড়ানি গেরাহ্যি করতে হবে, খুড়ি-পিসির কথায় কান দিতে হবে—তাহলেই তো ধম্ম করা হয়েছে মানুষের, কথাটা বুঝলেন না?'

বলিলাম, 'তারপর কি হ'ল বল।'

'বিয়ের জন্যে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। এই শেষ কাজ, এর পরেই বিন্দাবন

যাবেন, আয়োজনের আর কোন হিসাব রইল না। যেখানকার যা নাম-করা সেরা জিনিস—বাইজী থেকে নিয়ে রংতামাসা, বাজনা-বাদ্যি—সব যোগাড় করবার জন্যে চারিদিকে লোক ছুটল—কোথায় কাশী, কোথায় ঢাকা, কোথায় মুর্শিদাবাদ, কোথায় কলকেতা—ত্যাখন রেল হয়নি, ডাকের ব্যাপার—একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল।'

'দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল রানীমা ততই যেন পাগলের মতন হয়ে উঠতে লাগল; পেটে ধরেচে তো?—তার ওপর ঐরকম মেয়ে, দেবকন্যে বললেই হয়। শেষে যখন কুল্যে তিনটি দিন বাকি, আর কোন রাস্তা না দেখে আমার বাবাকে ডেকে পাঠালেন। কর্তা নেশা-ভাঙ ছেড়ে দেওয়ায় বাবার সন্ধ্যেবেলায় আর এদানি কোন কাজ ছেল না; মনমরা হয়ে বসে থাকত, বেশ মনে পড়ে রানীমার খাস দাসী সৈরভী এসে বাবাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে গেল।'

'সামনে বেরুত না, দোরে আড়ালে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে সামনে এগিয়ে দিয়ে রানীমা চোখের জল মুছতে মুছতে অনেক কথা বললে বাবাকে— "শিবদাস"—বাবার নাম ছেল শিবদাস,—বললে, "শিবদাস আপ্তহত্যে মহাপাপ, নৈলে মেয়েটাকে বুকে করে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তুম। আর তো কোন উপায় নেই, তুমি পুরনো চাকর—শুধু পুরনোই নয়, বংশগত চাকর—কত পুরুষ ধরে তোমাদের বংশে এ-বাড়ির অন্নজল খেয়েছে—আর কোন উপায় না দেখে মেয়েটাকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম। তুমি মসনের চৌধুরী বংশের নাম ডুবতে দিও না। কিছু একটা উপায় করো, না পারো বিয়ের দিন সন্দের সময় আমার কাছে এসে বলো—পারলুম না, রানীমা—আমি মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব, নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিও। আমি কোথায় রাজাপুরের মুকুজ্জেদের ছেলেটিকে মনে মনে এঁচে রেখেছিলুম—যেমন নিকষ কুলীনের বংশ, তেমনি কাছে-পিঠেও হ'ত।...তা, ভাসিয়ে দিয়ে এসো পোড়াকপালীকে—"

'কম কথা তো নয়, দাদাঠাকুর। কিই বা খ্যামতা বাবার? অথচ স্বয়ং রানীমা নিজে ডেকে বললেন অমন কাতরে কাতরে। পরের দিন আর বাবাকে কেউ দাঁতে কুটোটি কাটাতে পারলে না, যখনই দেখ নিঝুম হয়ে বসে ভাবচেই—ভাবচেই—ভাবচেই। সন্দের সময় গিয়ে হঠাৎ ঝেড়েঝুড়ে উঠল,

মাকে বললে, "রূপোর-মা"—বাবা আমায় রূপো বলে ডাকতো—বললে, "রূপোর মা, বেশ একটু তোয়াজ করে রান্নাটা কর্ দিকিন, জাল ফেলে একটা মাছও তুলে দিচ্ছি।" মা বললে, "সমস্ত দিন উপোসের পর হঠাৎ রান্নার আদর, বলি ব্যাপারখানা কি?" বাবা বললে, "তুই কর্ তো যোগাড়, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে।"···মা সুদোলে, "বলি ব্যাপারখানা কী আগে তাই কও,—অমন অমঙ্গুলে কথা!"···বাবা বললে, "ঐ তো বললুম, আজ ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে, কাল এসপার কি ওসপার; তোর সিঁদুরের জোর থাকে ফিরে পাবি, নৈলে থান কাপড় বরাদ্দ।"···এর বেশি আর ভাঙলে না।'

সুতোয় কিরকম একটু জোট পাকাইয়া গেছে; স্বরূপ সেটা ঠিক করিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল—'মসনের ঠিক বাইরে সরস্বতীর ধারে তাঁবু ফেলে বরযাত্রীরা এসে উঠল। এমন প্রায় পাঁচশো লোক হবে। মসনেতে বিয়ের এমন আয়োজন এব আগে কেউ দেখেনি দাদাঠাকুর, যেমন এদিকে ঘটা তেমনি ওদিকে ঘটা! হাতী, ঘোড়া, পালকি, তাঞ্জাম; গাড়ি, জুড়ি, বাজনা-বাদ্যি। একটা গুজব উঠল, কুসমির ওনারা নাকি আবার গড়ের বাদ্যির ব্যবস্থা করচে, কোলকাতার কেল্লা থেকে নাকি গোরার দল এসে সেই বাজনা বাজাবে। ত্যামন গড়ের-বাদ্যি—এমন হ্যালা-ফ্যালার জিনিস হয় নি দাদাঠাকুর, গোরাও একরকম বাঁশতলায়, ডোবার ধারে হ্যাংলার মতন ঘুরে বেড়াত না; আমরা সবাই দেখতে ছুটলুম। ভেতরের তাঁবুগুলোর দিকে যাওয়া গেল না, কাজেই চোখে দেখাটা আর হয়ে উঠল না কারুর। নানারকম গুজোব উঠল; কেউ বললে বাবুদের তাঁবুর পাশেই তাদের আস্তানা; কেউ বললে এখনও পোঁচোয়নি, সন্দের সময় ঠিক মোয়াড়ায় এসে হাজির হবে; কেউ বললে গোরা নয়, গোরার সাজপরা মোছলমান বাজনদারের দল। হাজার রকমের গুজব। ব্যবস্থা হ'ল, বরযাত্রীর দল মসনেয় ঢুকে আদ্দেকটা পথ নিজেরা আসবে—রতনদীঘির জোড়ামন্দির পয্যন্ত, সেখান থেকে কন্যেযাত্রীর দল তানাদের অভ্যত্থনা করে নিয়ে আসবে, কত্তা একটু এগিয়ে দেউড়ির সামনেতে গিয়ে অভ্যত্থনা করবেন।···দামোদর চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে নিয়ে অনেক গল্প চলিত আচে মসনেয়, দাদাঠাকুর। ওরকম আয়োজন আর তার পূর্বে এখানে হয়নি কিনা; একটা শুনবেন—বরযাত্রীদের জন্যে রতনদীঘি

থেকে সারা পথটা মখমল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অতটা বিশ্বাস করবেন না, তবে হ্যাঁ, যা হয়েছিল তা এ-তল্লাটে কোনখানেই কোনওকালে হয়নি—এক রামায়ণ-মহাভারতেই শোনা যায়।

'সন্দের আগে তিনবার ডেকে পাঠালেন রানীমা। প্রথম প্রহরেই লগ্ন, শেষবার ডেকে আর কাকুতি-মিনুতি নয়, একেবারে শাপমন্যি—"তোমরা পুরুষানুক্রমে এঁদের নেমক খেয়ে এসেচ, লক্ষ্মীপ্রিতিমে চোখের সামনে ভেসে যেতে দেখেও কিছু করলে না, নিব্বংশ হবে, সমস্ত মসনে শ্মশান হয়ে যাবে, এই আমি পাতব্বাক্যে বলচি"—এইরকম কত কথা, একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছেন কিনা। বাবা মুখটি বুজে শুনে গেল, একটা মতলব ঠাউরেচে, কিন্তু লাগবে কি না-লাগবে তার তো ঠিক নেই। শুধু বললে, "মা, চেষ্টার কসুর করচি না, তবে সবই তো মা জগদম্বার হাতে। কাল হয়েচে, তিনি অসি ছেড়ে বাঁশি ধরেচে, নৈলে মস্‌নের লক্ষ্মী-প্রিতিমের দিকে কিনা কুসমির কালপেঁচায় নজর দেয়? তবু করচি চেষ্টা, আপুনি রাজাপুরের ওনাদের আনিয়ে রাখো চুপি চুপি; না পারি আশীব্বাদ করো তোমার শাপমন্যিগুলো আমার বরে দাঁড়ায়, এ অঘটন চোখে দেখবার আগেই যেন শিবুকে চোখ বুজতে হয়।'

'সেইরকম ব্যবস্থা করেছেল কিনা বাবা, দাদাঠাকুর। ঐ যে আগের রাত্তিরে মাকে বললে—এসপার কি ওসপার হবে, ফাঁসির খাওয়া খাচ্চি—তার অর্থটা কি? কুমড়ো বলি দিয়ে যখন মার পূজো হচ্চে, চুপি চুপি পুরুতমশাইয়ের হাতে একটি একনম্বর খাঁটি বোতল তুলে দিয়ে বললে, "পুরুতঠাকুর, কত্তার হুকুমে এসব তো ছেড়ে দিয়েচি, তবে আজ নাকি বড় সুখের দিন; সুদু এক রাত্তিরের জন্যে লঙ্ঘন করব কত্তার হুকুম। আপুনি বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আগমে যত মন্ত্র আছে, সব এই বোতলটির মধ্যে ঠেসে খুব কড়া গোছের 'কারণ' করে দাও, যেন এক চুমুকেই জন্ম পালটে যায়।"

'তাই গেলোও, দাদাঠাকুর। সে-কথা পরে বলচি।'

'সন্দের একটু আগে তোড়জোড় করে বরযাত্রী বেরিয়ে পড়ল। মিনিটে মিনিটে কত্তার কাচে লোক পৌঁচুতে লাগল—কতদূর এগুল, কি কি বিত্তান্ত এইসব খবর নিয়ে। সন্দের একটু পরে গা-ঢাকা হতে বরযাত্রীরা রতনদীঘির জোড়ামন্দিরের সামনে এসে পৌঁচুল। এখান থেকে এনাদের এলাকা;

দু'দলের বাজনা-বাদ্যি লোক-লস্কর গুছিয়ে একত্তর করে নিয়ে আবার এগুবে। কি ভেবে বাবা আমায় সমস্ত দিন দেউড়িতে নিজের কাচে আটকে রেখেছে। কান পেতে রয়েছি গড়ের বাদ্যি বাজবে কখন, ও জিনিস তো শুনিনি আগে কখনও। বাবাকে একবার সুদোলাম, বাবা বললে "সময় হ'লেই বাজবে, তুই ঠাণ্ডা হয়ে বোস তো।'

'একটা কথা বলতে ভুলে গেচি, দাদাঠাকুর, আসল কথাটাই। দামোদর চৌধুরীর বোনাইয়ের কথা বলেচি না?—সেই-যে গোড়াতেই যিনি বোষ্টম বাবাজীকে ডেকে এনে অনিষ্ট ঘটিয়ে বিন্দাবনে চলে গেছল। আজ বিয়ে; আগের দিন বৈকালে তিনি হঠাৎ এসে হাজির। চেহারার সে জলুস্ নেই, কেমন একটা যেন মনমরা ভাব; কিছু অব্বিশ্যি ভেঙে বললে না নিজের মুখে, তবে আমার মন বললে যেন ওসব বোষ্টম বাবাজী-টাবাজী কিছু নয়, কোন এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছেল—ফোঁপরা করে ছেড়ে দিয়েচে। যাই হোক, তিনিও হাজির ছেল, ওদিক থেকে বরযাত্রী দেউড়িতে এসে পৌঁচুবে আর শালা-ভগ্নীপতিতে নেমে গিয়ে অভ্যত্থনা করবে।'

'সন্দে উৎরে গিয়ে বেশ গা-ঢাকা গোছের হয়েছে, দলটা এইবার জোড়া-মন্দির ছাড়বে, হৈচৈ-টা বেড়ে উঠেচে, এমন সময় বাবা যথাপদ্ধতি গলায় গামছা জড়িয়ে এসে সুদোলে "হুজুরের সরবৎটা কি এখনই খেয়ে নেবেন আজ? এর পরে আর ফুরসত থাকবে না কিনা—তাই জেনে নিচ্চি।"

'আহারের পূর্বে যে সময়টা আগে নেশার ব্যাপার চলত, সে সময় এখন শ্বেতপাথরের জয়পুরী গেলাসে করে এক গেলাস সরবৎ খাওয়ার রেওয়াজ করেছিলেন চৌধুরীমশাই; বাবাই তোয়ের করত, বাবাই এনে দিত। চৌধুরীমশাই বললে "তা তুই মন্দ বলিস নি, দোরে বরযাত্রী এসে গেল; আর কি ফুরসত পাব?—যোগাড় করগে।"

'এক গেলাসের বেশি খেতেন না, মাল-টানা মুখে মিছরির সরবৎ ভালো লাগবে কেন? নেহাত মনকে চোখঠারা বৈ তো নয়। বেশি খেতেন না, কিন্তু তোয়াজ ছেল, সেইরকম শ্বেতপাথরের গোলটেবিলের সামনে কৌচে বসে, একটু একটু করে চাখতে চাখতে, গল্প করতে করতে চলত। বাবা তোয়ের করতে গেল।'

স্বরূপ সতৃষ্ণনয়নে বারদুয়েক কলিকাটার পানে চাহিল, হুঁকাটা বাড়াইয়া বলিলাম 'নাও, দুটো টান দিয়ে নাও, স্বরূপ।'

একটু দম করিয়া লইয়া কলিকাটি হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিয়া স্বরূপ বলিতে লাগিল, 'সরবৎ দিয়েই দোরের আড়াল হয়ে বাবা তো কাঁপতে কাঁপতে ইষ্টিমন্ত্র জপ শুরু করে দিলে। সরবৎটা কি বুঝলেন তো দাদাঠাকুর? সেই কারণ-করা একনম্বর বিলিতী মাল, নিজ্জলা খাঁটি একেবারে। তায় ইদিকে দু'মাসের উপোসী, একটা চুমুক দিলেই একেবারে বেম্মতলে গিয়ে উঠবে।...বাবা তো বাঁশপাতার মতন কাঁপতে লাগল, দাদাঠাকুর। তারপরেই সেই সিঙ্গির ডাক—"শিবে!!"...বাবা তো দুগ্‌গা নাম স্মরণ করে গলায় গামছা দিয়ে সামনে এসে হাজির হ'ল। চিন্তামণি ঠাকুর ত্যাখনও চুমুক দিচ্চে, চৌধুরীমশাইয়ের গেলাস খালি। বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, চোখ রাঙা হয়ে রয়েচে, গা ঈষৎ দুলচে; জিজ্ঞেস করলে, "সরবৎ তুই নিজের হাতে তোয়ের করেচিস্?" বাবা হাতজোড় করে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"..."খাসা বানিয়েচিস্ তো; আর আচে?" বাবা বললে, "আজ মেহনত পড়বে হুজুরের, তাই একটু বেশি করেই বানিয়েছি।"..."লে আও। রায়মশাই, আপনারও চাই তো?" রায়মশাই বললে, "তা দিক, বিন্দাবন ছেড়ে ইস্তক এরকম সরবৎ কৈ দেখিনি তো?" তারপরেই স্রেফ "লে আও" আর "লে আও"...বাবা সব ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন, দেখতে দেখতে চারটি বোতল খালি হয়ে গেল। এমন সময় গড়ের বাদ্যি বেজে উঠল, মানে, উদিকে জোড়ামন্দির-তলা থেকে বরযাত্রী-কনেযাত্রী মিলে আবার এগুতে শুরু করলে আর কি। চৌধুরীমশাই জবার মতন টকটকে চোখদুটো তুলে সুদোলে, "বাজনা কিসের?"

'ওই জন্তেই ব্যবস্থাটা করা কিনা বাবার, মানে, পেটে একটু পড়লে চৌধুরী-মশাইয়ের আর আগেকার কথা কিছু মনে থাকত না; বাবা ভাবলে, বিয়ে রদ করতে হলে সেই সাবেকের চৌধুরীমশাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে, আর সাবেকের চৌধুরীমশাইকে ফেরাবার ঐ একটি মাত্র মন্তর আচে। বাবার শুধু ভয় ছেল উল্টো না হয়ে যায়, এমন ব্যাপারটা তো হয়নি দু'মাসের মধ্যে।...বললে, "আজ্ঞে, দুগ্‌গা-মাকে বিয়ে করে নিতে এসেচে—কুসমি থেকে।"...চৌধুরীমশাই টলতে টলতে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল; এক চুমুকেই

জ্ঞান থাকে না, আর এ প্রায় তু'পাঁট সাফ হয়ে গেছে; রাগটাকে যেন চাপবার চেষ্টা করে সুদোলে, "কার হুকুমে? রায়মশাই, আপনি হুকুম দিয়েছেন?"...রায়মশাই বললে, "আমি! কুসমিকে? তা ভিন্ন এ তো বিয়ের সানাই নয়, গড়ের বাগ্যি, মেয়েকে লুটে নিয়ে যাবার ব্যাপার দেখছি যে।..." আর যাবে কোথায়? দেউড়ি কাঁপিয়ে সেই পুরনো গলা বরযাত্রীর বাজনার ওপর গিয়ে উঠল—"কোই হ্যায়? কুসমির শালারা এসে আমার ঘর থেকে আমার মেয়ে লুটে নিয়ে যাবে? গড়ের বাগ্যি বাজিয়ে? বাগদীপাড়ার বেটারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্চে? লে আও আমার বন্দুক, একাই লড়েঙ্গা!!"

'আর বলতে আচে? বাবা আন্দাজে আন্দাজে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছেল, লুটে বাগদীর দল রে-রে করে গিয়ে একেবারে বরযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরে সে যুদ্ধু! কথাটা বুঝলেন না, দাদাঠাকুর? কুসমির বাবুরাও একটু ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে ভেতরে ভেতরে তোয়ের হয়ে এসেছিল কতকটা—ভাবলে, ভালো রে ভালো এক কথাতেই মেয়ে দিতে রাজী হয়ে গেল,—মসনের দামোদর চৌধুরী; ব্যাপারখানা কি!...মোছলমানও না, অন্য জাতও নয়; গোরার দলই গড়ের বাগ্যি বাজাচ্ছেল, দাদাঠাকুর। কুসমির বাবুদের সরকারে খুব খাতির ছেল তো? —বলে ক'য়ে কি করে যোগাড় করেছেল। চৌধুরীমশাইয়ের হুকুমে তাদের ঘেরে-ঘুরে এনে দেউড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারা ভাবলে, এ শ্রাদ্ধের বুঝি এই রীত—তায় আকণ্ঠ মদ গিলে আছে—গলা ফাটিয়ে লড়াইয়ের বাগ্যি শুরু করে দিলে।

'লড়াই আর কি হবে, দাদাঠাকুর? একদিকে সমস্ত গ্রাম আর একদিকে গোটাকতক বরযাত্রী—সমস্ত রাত শুধু খোঁজ-খোঁজ, মার-মার শব্দ, আর তার সঙ্গে গড়ের বাগ্যি! বরযাত্রীদের কত লোক খানায় পড়ল, কত লোক ডোবায় নেবে হাঁড়ি মাথায় নিয়ে কাটালে, আবার কত লোক সরস্বতী পেরিয়ে পালাতে গিয়ে একেবারে বৈতরিণীর পারে ঠেলে উঠল। শেষ রাত্তির পয্যন্ত শব্দ যদি কমল, সে বাগ্যি আর থামে না। গোরা, রক্ত গরম হয়ে গেছে কিনা, দাদাঠাকুর। বাজিয়ে চলেচে তো বাজিয়েই চলেচে—ঝমোর ঝমোর-ঝম্—ঝমোর ঝমোর-ঝম্...'

'তাই বলছিলুম—গড়ের বাগ্যি শুনেছিলুম সেই একবার। আজকালকার তো হুট বলতে গড়ের বাগ্যি, জাতই মেরে দিলে জিনিসটার!'

এর মধ্যে গদাধরেব দোষ কতটুকু আপনারাই বিচার কবিবেন, আমি কাহিনীটুকু বিবৃত করিয়াই খালাস।

গদাধবের বাপ নিরুপম পাল একজন পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন। একেবারে গোড়ায় একটা আড়তে খাতা লিখিতেন, আর বাজাইয়া বাজাইয়া টাকা গুণিতেন। টাকা চেনা থেকে একটু একটু কবিয়া বাজার চিনিতে লাগিলেন, তাহার পর অল্পে অল্পে নিজের ফলাও ব্যবসা ফাঁদিয়া বিষয়-সম্পত্তি যাহা করিবার সবই করিলেন। কিন্তু একটা দুঃখ বহিয়া গেল, গদাধবকে টাকার মতো করিয়াই কয়েকবার গভীর অভিনিবেশের সহিত বাজাইয়া বাজাইয়া বুঝিলেন, তেজারতেব বাজারে এ-ছেলে অচল। বুদ্ধিটা বেশ একটু মোটা।

তবে ধর্মের দিকে মতিগতি আছে, টাকা উড়াইবে এমন ভয় নাই। মৃত্যুব কিছুদিন পূর্বে নিরুপম ব্যবসা ধীবে ধীরে সম্পূর্ণভাবে গুটাইয়া লইলেন এবং টাকা যাহা হইল সেটা গোটা দুই ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ব্যবসার দিকে তুমি হঠাৎ যেতে চেওনা বাবা, ব্যাঙ্ক থেকে মোটা সুদ পাবে, তাব যতটুকু দরকার হয় ততটুকু নিয়ে বাকিটা আবাব জমা দিয়ে যাবে মাসে মাসে। পুকুর, বাগান, ধান-জমি সব রইল, অভাব হবে না। বাড়িতে বিগ্রহ রয়েছেন, তাঁর সেবাতেই কাটিয়ে দিও, তিনিই রক্ষা করবেন যা-সব রেখে গেলাম।'

একটু থামিয়া বলিলেন, 'তোমার ছেলের মধ্যে যদি আসে তার ঠাকুরদাব বুদ্ধি—এমন হয় তো অনেক সময়—সে তখন আবাব ফেঁদে নেবে নিজের কাজ।'

শেষের এই কথাগুলির মধ্যে বেশ একটু খোঁচা ছিল, কতকটা সেই অভিমানেও, কতকটা প্রকৃত অপটুতা আর আলস্যের জন্যও গদাধর গেল না ব্যবসার দিকে। রাধারমণের সেবাতেই নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে

নিয়োজিত করিয়া দিল, ফলে, জাতব্যবসায়ী হিসাবে মস্তিষ্কের কোনখানে যদি হয়তো কোথাও ছিল একটু বুদ্ধি, সেটুকুও অপহৃত হইয়া সমস্ত দেহ মন নিটোলভাবে ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সংসারটি ছোট; স্ত্রী সরোজিনী, দুটি কন্যা—সরযূ আর যমুনা, আর একটি ছেলে, কেশব। ছোট হইলেও কিন্তু দুর্বহ গদাধরের পক্ষে। সরোজিনীকে ঘরে আনিবার সময় তাঁহার রাশিচক্রের খোঁজ লওয়া হইয়াছিল কিন্তু মেজাজের খোঁজ লওয়া হয় নাই; অত্যন্ত মুখরা, নিত্যই কলহ হইবার কথা, শুধু গদাধর নির্বিবাদে সব কথা মানিয়া লইয়া রাধারমণের কাছে ধরণা দিয়া পড়ে বলিয়া বিনা গোলযোগে কাটিয়া যাইতেছে। বড় মেয়ে সরযূটি একেবারেই বোবা: বিবাহ হইবে না। রাধারমণের পায়ে সমর্পণ করিয়া যতটা সম্ভব মনের বোঝা হালকা করিয়াছে গদাধর। ছোট মেয়েটি তেমনি বাচাল, এককালে মাকে ছাড়াইয়া যাইবে। আপাতত বিবাহ দেওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এক কথায় পাঁচ কথা বলিয়া জবাব দেয়। তিনবার তিন জায়গা হইতে দেখিতে আসিয়াছে, ফিরিয়া গিয়া আর উচ্চবাচ্য করে নাই। এ মেয়েটিকেও রাধারমণের পায়ে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছা ছিল, স্বপ্ন পেলে তিনি জটিলা-কুটিলাকে লইয়া হিমসিম খাইতেছেন, আর ভেজাল বাড়াইবার উৎসাহ বা অভিরুচি নাই। বাকি থাকে কেশব। ছেলেটি ছোটদিদির মতো কথা কহিতে কহিতে এক এক সময় বড়দিদির মতো হঠাৎ মৌন্ আর গম্ভীর হইয়া যায়। ফলে তাহাকে অত্যন্ত রহস্যময় বলিয়া মনে হয়; ও যেন বাপের মূঢ়তার জন্য ঠাকুরদাদার বিশেষ আশীর্বাদ লইয়া তাঁহার ব্যবসা আবার ফলাও করিয়া ফাঁদিবার উদ্দেশ্যে জন্ম লইয়াছে; কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয় গদাধরের। বড় মনোকষ্টে কাটিতেছে এবং সেইজন্য সমস্ত মনটাকে রাধারমণের পায়ে ঢালিয়া কোনমতে কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

অর্ধেক জীবন প্রায় কাটিয়াও আসিয়াছে এমন সময় লড়াই আসিয়া পড়িল এবং মিলিটারিতে কতকগুলা কাঁচামাল সরবরাহ করিবার ঠিকা লইয়া, বৈঁচির কাশীনাথ একজন ভালো মূলধনীর সন্ধানে বাহির হইয়া বেহালায় আমাদের গদাধরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লোকটার মানুষ পটাইবার অসাধারণ ক্ষমতা। মন্দির থেকে টানিয়া গদাধরকে বাহির করিতে যা-একটু বেগ পাইতে হইল, তাহার পর কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে ভিজাইয়া ফেলিল। গদাধরের কোথায় 'কে আছে সব জানে, টাকা না খাটাইবার কারণও অবগত আছে, আসিয়াছেও একটা সম্পর্ক দাঁড় করাইয়া। বলিল, 'আপনি আমায় বলবেন কি? আমি আপনাকে টাকা বের করতে মানা করতাম, নিরুপম কাকা কি যা-তা লোক ছিলেন একটা, যে মিছিমিছি বারণ করে যাবেন? আর ব্যবসাতে কি ছিল শুনি? টাকায় আধ পয়সাও টানতে পারছিল না। আপনি দেখতেন না, ওদিকে খেয়াল ছিল না; কিন্তু এতবড় একটা আড়তদারের ছেলে এটুকু ওয়াকিবহাল তো ছিলেনই? "না" বললে শুনব কেন, মশাই? লোক দেখে তার নজর কতদূর যায় তা টের পাব না?'

এ ধরনের তারিফ গদাধরের কানে এই প্রথম গেল, অল্প একটু হাসিয়া বলিল, 'দেখতাম না তো সেইজন্যই, মশাই। ফলটা কি দেখে বলুন?'

'ঐ দেখুন, আমি বলব কি, নিজের মুখেই প্রকাশ করতে হ'ল আপনাকে। টাকায় যখন আধলাও অর্জন করতে পারছে না তখন সে টাকা বাজারে ছড়িয়ে লাভ কি মশাই? না-হক হায়রানি বইত নয়!'

গদাধরের আত্মপ্রসাদ জমিয়া উঠিয়াছে, একটু ব্যঙ্গহাসির সহিত বলিল, 'তাই গুটিয়েও নিতে হ'ল শেষ পর্যন্ত বাবাকে।'

কাশীনাথও একটু মৃদু হাসিয়া মুখটা নিচু করিল। তাহার পর বলিল, 'আপনিও তো ঐ একই কারণে বের করেননি টাকাটা? তাহলে তাঁতে আপনাতে তফাতটা হ'ল কোথায়? যাক্, ধরে নিচ্ছি তিনি বারণ করে গেছেন বলেই খাটান্‌নি টাকাটা এতদিন, এযুগে বাপের কথাই বা রাখছে ক'টা লোক, মশাই? যেদিক দিয়ে যান, যশটা গদাধর পালেরই। আমিও আসতাম কি?—আসতাম না, যদি আমি যে-ব্যাপার নিয়ে এসেছি সেটাকে ব্যবসা বলা যেত।'

গদাধর একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিতে বলিল, 'না, একে ব্যবসা বলব না,—টাকায় এক আনা—দু'আনা—চার আনা—আট আনা, এমন কি, টাকায় টাকা হ'লেও তাকে ব্যবসাই বলব না আমি।'

শুনিতে শুনিতে গধাধরের মুখটা হাঁ হইয়া গিয়াছিল, দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া

সেইভাবেই চাহিয়া রহিল। কাশীনাথ একটু অপাঙ্গে চাহিয়া লইয়া বলিল, 'কিন্তু যখন দেখছি টাকায় দু'টাকা লাভ—একটা টাকা সঙ্গে সঙ্গে তিন টাকা হয়ে যাচ্ছে…'

গদাধরের হাঁ-টা একেবারে দ্বিগুণ হইয়া গেল, চক্ষু দুইটাও যেন ঠেলিয়া আসিল, কাশীনাথ একটু হাসিয়া বলিল, 'আপনি এইতেই চমকালেন! আরও যে-সব রহস্য আছে তা শুনলে তো তাক লেগে যাবে আপনার। লড়াইয়ের বাজার যে মশাই, সেকথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? একে তিন, এ তো হেসে খেলে আসবে মশাই, যাকে বলে জুতো মেরে। এক হাজার ঢালুন—সঙ্গে সঙ্গে তিন হাজার, তিন হাজার ঢালুন—ন'হাজার, ন'হাজার ঢালুন একেবারে তিন-ন'য় সাতাশ। এর জন্যে কারুর কাছে খোসামোদ করতে হবে নাকি? তারপর—অ্যাডভান্স।…'

কথাটা বলিয়া একটু আড়চোখে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল; গদাধর প্রশ্ন করিল, 'সেটা কিরকম?'

কাশীনাথ ভ্রূ কুঁচকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'বাঃ, তোমরা প্রকাণ্ড এক লড়াই ফেঁদে বসেছ সাহেব, তোমাদের এখন লাখ লাখ টাকার মাল চাই, আমি গরীব কন্‌ট্রাকটার, অত টাকা হঠাৎ বের করি কোথা থেকে? হদ্দ কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার কতক হতে পারে বাড়ি বাঁধা দিয়ে, বৌয়ের গহনা বেচে।… হুকুম হল—বেশ লেগে যাও…। একবার আরম্ভ করে দিলেন, তারপর বিশ্বাস যেই জমে গেল, আগাম টেনে যাননা কত টানতে পারেন, দশ হাজার টাকা যদি বের করতে পারলেন, আপনি লাখখানেকের লেন-দেন লাগিয়ে দিন না। কে মানা করছে? তবে সে কি আর যার-তার কর্ম? আমি একেবারে গোড়ায় তিন বেটাকে হাত করেছি কি-না!'

গদাধর প্রশ্ন করিল, 'কত টাকার কাজ ধরেছেন?'

'সব বলছি আপনাকে। ধরা যেত অনেক, কিন্তু অত লোভ করলাম না একেবারে। দু'হাজার টিন ঘিয়ের দরকার ওদের, আমি ধরলাম পাঁচশো টিন। প্রতি টিনে গড়ে আঠারো সের, দাম বত্রিশ, এই ষোল হাজার টাকা বের করতে হচ্ছে আমায়। পাচ্ছি প্রতি টিনে একশো, মোট পঞ্চাশ হাজার। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যদি ত্রিশ হাজারও না হাতে আসে তো এমন ঠিকে নিতে যাই কেন মশাই এই লড়াইয়ের বাজারে? বুঝুন। দেখতে দেখতে এই যে

লাল হয়ে যাচ্ছে—আপনি আমি একটুকরো লোহা দেখতে পাই না চোখে, আর সব চারতলা পাঁচতলা বাড়ি হাঁকাচ্ছে, সে কি এমনি ?···মাড়োয়ারীরা তো গোরাদের সামনে এগুতে পারে না, টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি, মনে মনে বললাম, রোসো, আগে দেখি, স্বজাতি কেউ রাজী না হয়, তখন তোমরা।··· তারপর হঠাৎ আপনার নামটা মনে পড়ে গেল।'

গদাধর যতটা লুব্ধ এবং বিস্মিত হইল, ততটা তাড়াতাড়ি কিন্তু রাজী হইল না ; ক্রমাগতই সুদের টাকা জমা দিয়া আসল না ভাঙিবার একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেছে, বলিল—ভাবিয়া দেখিবে। কাশীনাথ লাভের সবচেয়ে বড় রহস্যটা ভাবিয়াছিল নিজের হাতে রাখিবে, দুই দিন চেষ্টা করিয়াও যখন দেখিল মন ভঁরিয়া আসিলেও টাকাটা বাহির করিতে চাহিতেছেন না, তখন সেটাও প্রকাশ করিয়া দিল। বলিল, 'এখনও কিন্তু আপনাকে আসল কথাটা বলিনি। অবিশ্যি না বলবার হেতু সাহেব-বেটাকে বাগাতে পারছিলাম না এতদিন, কাল ঠিক করেছি, সে শুনলে এক টাকায় দু'টাকা লাভ নেহাত ছেলেখেলা বলে মনে হবে। সে কথা কিন্তু··· '

গদাধর একটু সরিয়া আসিয়া বসিলে, আরও কাছে ঘেঁষিয়া, গলা আরও খাটো করিয়া বলিল, 'কিন্তু ঘি বেটাদের দিচ্ছে কে, মশাই ? ও প্রায় যা পাচ্ছেন তার সমস্তটাই লাভ।'

নিত্য নূতন ধরনের কথা শুনিয়া গদাধর একেবারে অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, সেসবের উপর আরও কিছু যে থাকিতে পারে যেন ধারণা করিতেই পারিতেছে না ; প্রশ্ন করিল, 'তার মানে ?'

'তার মানে টিনের মুখের কাছটায় ইঞ্চি দুয়েক করে ঘি, খুরজার এক নম্বর; বাকি সব···আরও স্পষ্ট করে বলতে হবে নাকি ? ভি-ই-জি-ই-টি-এ-বি-এল্-ই !!'

ঠোঁটের কোণটা কামড়াইয়া একটা চোখ বুজিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

২

কিন্তু এ কাহিনীটা ব্যবসা-সম্পর্কীয় নয়, বিবাহের। এইবার সেই কথাতেই আসা যাক।

তৃতীয় দিনের কথা। টাকা গদাধর বাহির করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

কথাটা একবার স্ত্রী সরোজিনীর নিকট পাড়িতে হইবে, মেজাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবসর খুঁজিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যা ঠিক উতরাইয়া যাইবার পর হঠাৎ বিধু ঘটক আসিয়া উপস্থিত হইল; বলিল, 'দাদা, মেয়েটার বিয়ে দেবে তো বলো, ভালো সম্বন্ধ হাতে এসেছে একটা। নিজে হতে সেধে এসেছে, লেগে যেতে পারে।'

গদাধর প্রশ্ন করিল, 'লোকটা কে?'

'চেনা লোক আপনার। বৈঁচিতে বাড়ি, নাম কাশীনাথ কুণ্ডু; আপনার কাছে নাকি কি-একটা কাজ নিয়ে যাওয়া-আসাও করছে শুনছি। বললে—বিয়ের কথাটা আপনিই পাড়ুন ঘটকঠাকুর, উনি রাজী হন তখন আবার আমাদের দুজনের মধ্যে সাক্ষাৎ কথাবার্তা হবে। আপনি মুখপাতটা ধরিয়ে দিন।'

'তা রাজী হব না কেন? এ তো ওঁর দয়া। ছেলেটি?'

'ছেলেটি খুবই বাঞ্ছনীয়, যেমন উনি বললেন। ডাক্তারি পাস করেছে এবছর মেডিক্যাল কলেজ থেকে, আপাতত গ্রামেই বসবে, তারপর লড়াই শেষ হলেই বিলেত পাঠাবেন। দেখতে-শুনতে ভালো—বাপের চেহারা দেখছেনই আপনি। বিলেত পাঠাবার কথাটা না হয় বাদই দেওয়া যায় আপাতত; বাকি তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। নিজেরও ভালো রকমই সম্পত্তি আছে বলে মনে হ'ল, কলকাতাতে একখানা বাড়ি তুলছেন বললেন, সেও খোঁজ নিলেই টের পাওয়া যাবে…'

'খাঁই?—দিয়েছেন কিছু আন্দাজ?'

'খাঁই আছে। সেটা এ-বাজারে এমন কিছু বেশিও নয় যে তোমার দিতে কষ্ট হবে, তবে…'

'তবে?'

'তবে যেভাবে চাইছেন উনি, সেভাবে দিতে তুমি রাজী হবে কি না তুমিই জানো, যদিও আমি তো ক্ষতি দেখি না। উনি চাইছেন সতের হাজার টাকা—তা দেওয়া যায়, ছেলে যেমন বলছেন যদি সেইরকম হয়—তবে উনি সবটা নগদ চান; বলছেন গয়নাগাঁটি যা গড়াবার উনি নিজেই গড়িয়ে দেবেন।…

…তা তোমার কী আপত্তি থাকতে পারে? ওসব হাঙ্গাম যত পরের ঘাড় দিয়ে যায় ততোই ভালো নয় কি?…সোনার খাদ বেশি—প্যাটার্ন তেমন

পছন্দসই নয়...কাজ কি বাবা ?—তোমাদেরই জিনিস তোমরাই দেখেশুনে গড়িয়ে নাও।...আমি যা বুঝি।'

ঘটক আরও যা-যা বোঝে বোঝাইয়া দিয়া বিদায় লইল। বলিল, পরদিন আবার আসিবে।

বিবাহের কথাটা স্ত্রীর কাছে পাড়িতে গদাধরের তত ভাবিতে হইল না, বাপের চেয়ে মায়েই এ বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন থাকে। ঘটকের কথাগুলা বেশ গুছাইয়া লইয়া প্রায় তখনি সরোজিনীকে গিয়া সব জানাইল। সরোজিনী মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল, 'আমি অমন চসমখোর মানুষের বাড়িতে মেয়ে দোব না।'

'কেন ?'

সরোজিনী রাগটা হদ্দ একবার কোনরকমে সামলাইয়া রাখিতে পারে, বেশ জোর গলাতেই একটু হাত নাড়িয়া বলিল, 'সে বোঝবার ক্ষমতা যদি তোমাব থাকত তাহলে দু-দুটো ধুমড়ো মেয়ে এরকম আইবুড়ো হয়ে ঘরে পড়ে থাকত না। মেয়েকে আমার গয়না দিয়ে কাজ নেই, সব টাকা ওর ছিচরণে ঢালি, উনি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে ওড়ান। গয়নাই হ'ল মেয়ের স্ত্রীধন, নিজের বলতে যা-কিছু।...মিনসেকে একবার আমার সামনে এনে হাজির করতে পার ?'

গতিক দেখিয়া গদাধর নিজেই সামনে থেকে সরিয়া পড়িত, কিন্তু সম্বন্ধটা কেমন বড় পছন্দ হইয়া গেছে, একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, 'স্ত্রীধন নিয়ে যা বললে তুমি, সেটা ঠিকই, তবে লোকটা যে পায়ের ওপর পা দিয়ে টাকা ওড়াবার মানুষ নয় এটা আমি জানি।'

'কি করে জানলে ?'

গদাধর কাশীনাথের ব্যবসা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটা বলিল, শুধু টিনে ঘি ভরতি করিবার রহস্যটা বাদ দিয়া।

সরোজিনী একেবারে নির্বাক হইয়া খানিকক্ষণ এমনভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিল যে, গদাধরেরও প্রায় বাক্‌রোধ হইবার মতো অবস্থা হইয়া পড়িল। সরোজিনী কোমরে দুইটা হাত দিয়া ঘাড়টা সামনে একটু আগাইয়া প্রশ্ন করিল, 'টাকা বের করে দিয়েছ তুমি ? তোমায় না বাবা পইপই করে মানা ক'রে গেছেন ? লোকটা যে জোচ্চোর নয়, কি করে জানলে ?'

গদাধরের সব গোলমাল হইয়া গেল, বলিল, 'টাকা কখনও বের করে দিই ? আর তা হলে তোমায় জিগ্যেস করতাম না ? ব্যবসার কথাতে তো ভাগিয়েই দিয়েছিলাম। এটা ভাবলাম বিয়ের কথা বলছে—বিয়ে তো আর ব্যবসা নয়, তাই…'

'এর মধ্যে কত বড় ব্যবসাদারী মতলব আছে, সেটা ঢুকেছে তোমার মাথায় ? অবশ্য নেহাত উড়িয়ে না দিয়ে যদি খাটায়ই ব্যবসাতে।'

গদাধর বিহ্বলভাবে মুখের পানে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

'তা হলে আমার কাছে শোন ; আমি কেন, রাস্তার মুটেটাকেও ডেকে জিগ্যেস করলে সে বলে দেবে, তুমি টাকা দিলে মুনাফার অর্ধেক বখরা দিতে হবে তো তোমায় ?—দিত কচু, তবু আইনের একটা ভয় থাকত তো ?—কথাবার্তায় দেখেছে দিব্যি গোবরগণেশ লোকটা, ছেলের বিয়ে দিয়ে সমস্ত টাকাটা বের করে নিয়ে খাটাই—তখন মুনাফার ষোল আনাই আমার—কেউ আর চাইবার থাকবে না। দেখতে পাচ্ছনা ? যত ক'টি টাকা ওদিকে চেয়েছিল ঠিক তত ক'টি টাকা চাইছে বিয়েতে। জোচ্চারের কি একটা করে ল্যাজ হয় ?'

গদাধর ঘামিয়া উঠিতেছিল, তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে যে টিনে ঘি ভরতির কথাটা বলিয়া ফেলে নাই। এমন কী ছুতা করিয়া এখান থেকে সরিয়া পড়া যায় ভাবিতেছিল, স্ত্রী বলিল, 'ওসব লোকের কি ওষুধ জান ?'

'কি ?'

'কি তা তোমায় বলে কোনও ফল আছে ?—তোমার মতন মেনিমুখো পুরুষকে ?—আমি হলে জপিয়ে জাপিয়ে ওর কাছ থেকেই সমস্ত আঁতঘাত বুঝে নিয়ে ওকে বিল্বিপত্র শুঁকিয়ে দিতাম। তারপর নিজের কারবার নিজে ফাঁদতাম—ওসব লোকের ওই ব্যবস্থা। আমি আমার গাঁটের টাকা বের করে দোব, অন্যে তার মুনাফা তুলবে! কি বলে বলতে এলে তুমি কথাটা আমার কাছে ? লোভ কি হয় না মানুষের ? হয়, লড়াইয়ের বাজার ধুলোমুঠো ধরতে সোনামুঠো ধরছে লোকে—বসে বসে দেখছি তো ? লোভ হয় বইকি, লোভ হয়ে আর কি অন্যায় হয়েছে—কিন্তু…'

গদাধরেরও একটা প্রবল লোভ হইতেছিল, একটু বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত হইবার, জীবনে অন্তত একবার ; বলিল, 'তা আমিই কি বসে আছি নাকি ?

কিন্তু টাকা বের করতে গেলেই তুমি তো হৈ-হৈ লাগিয়ে দেবে। সব বুদ্ধির গোড়াতেই তো টাকা। হদিস জেনে নিয়েছি অনেক—এক একটা শুনলে তাক লেগে যাবে। কিন্তু টাকার বেলায়ই যে ঠুঁটো হয়ে বসে থাকতে হয়েছে, বাবা করে গেলেন বারণ, এদিকে তুমি…'

সরোজিনী ঘাড়টা একটু ফিরাইয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'বলে যাও।…বারণ করে লোকে সাধ করে? মাথায় যে ওদিকে……বেশ, কি কি হদিস আদায় করেছ, দুটো শোনাও দিকিন।'

'কেন, এই ধরো, আগামের কথাটা, যদি দশ হাজারের কাজ করি, এক লাখ …বেশ, এক লাখ না হোক, বিশ হাজারও তো…'

সরোজিনী ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, 'মস্ত বড় হদিস আদায় করে নিয়েছ তো! ওগো, এও তোমার অপরের কাছে জেনে নিতে হ'ল? পাটের চাষীও তো দাদন পায়—বিচি না ছড়াবার আগে!…মরিঃ! মনে করলাম না জানি কি এক হদিস শিখে এলেন মদ্দ আমার!…যাও, ঘরে গিয়ে বোসো তো!' অবজ্ঞাভরে চলিয়া যাইতে যাইতে ঘুরিয়া বলিল, 'হদিস বরং ঐ সাহেবদের গিয়ে ধরা, তা পারবে? যাও না কেন, পারা তো উচিত, পেটে বিদ্যে তো রয়েছে, মাথায় বুদ্ধি না থাক।'

গদাধরের মনের ভিতরটা তোলপাড় করিতেছিল,—আর নিজেকে চাপিতে পারিল না। টিনের রহস্যটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া না পড়ায় এতক্ষণ নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়াই মনে হইতেছিল, এবার স্ত্রীর বিদ্রূপ আর নিজের লোভের মাঝে পড়িয়া—সেটা নিজে হইতেই প্রকাশ করিয়া দিল,—একবার বুঝুক ব্যবসার রহস্য কাহাকে বলে!—কত গভীর তত্ত্বই না টানিয়া বাহির করিতে পারে সে!

সরোজিনী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'কী! টিনের সমস্তটায় ভেজিটেবল দিয়ে ভ'রে মুখে দু'ইঞ্চি খুরজার এক নম্বর ঘি দিয়ে—ব্যবসা করবে? এই বুদ্ধি দিয়েছে, আর সেই বুদ্ধি নিয়ে তুমি লাফালাফি করছ?—রাধারমণের মন্দির আর ভালো লাগছে না, না?—জেলে গিয়ে উঠবার জন্যে পা চুলকুচ্ছে।…কি জোচ্চোর রে বাবা!—কখন আসবে সে-মিনসে বলো দিকিন আমায়।…ভেতরে সবটা মেকী, বাইরে একেবারে এক নম্বর!…এই মানুষের সঙ্গে ব্যবসা করবে!—শুধু তাই নয়, এই মানুষের

ঘরে মেয়ে দেবে।...নিজের মেয়ে দেবে—বোঝ একবার!—যে লোক সলা দিচ্ছে যে শুধু বাইরের চেহারাটা দেখিয়ে, ভেতরে ভুষিমাল...'

কথাগুলা বলিতে বলিতে সরোজিনী আবার ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘরের চৌকাঠের ভিতর একটা পা দিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল, একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ফিরিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, দেখে তাহার পিছন ফেরার সুযোগে স্বামী ইতিমধ্যেই অন্তর্ধান হইয়াছে।

গিয়া বারান্দায় একটা থাম ধরিয়া সামনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। বেশ খানিকক্ষণ গেল।

এত গুরুতর ব্যাপার সরোজিনীর কাছে এত শীঘ্র শেষ হয় না। গদাধর রাধারমণেরই শরণ লইতে যাইতেছিল, একেবারে এরকম নিস্তব্ধতা দেখিয়া খুব পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার কাছে আসিতেই একেবারে সামনে পড়িয়া গেল।

সরোজিনী বলিল, 'তোমায়ই খুঁজছিলাম।'

গদাধর বলিল, 'মনে হ'ল যেন ডাকছ, তাই মন্দিরের দিক থেকে ফিরে এলাম। কি?'

'দোব মেয়ের বিয়ে আমি, ঠিক করো।'

গদাধর আগাইয়া অসিতেছিল, বিমূঢ়ভাবে উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল, 'কোথায়?'

'বৈঁচিতে। যেখান থেকে সম্বন্ধ এনেছ।'

গদাধর নিজের চক্ষুকর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, আমতা-আমতা করিয়া প্রশ্ন করিল, 'খাঁই মিটোবে?'

'মিটোব।'

'যেমন ভাবে চাইছে—গয়নার টাকা-সুদ্ধ নগদে মিলিয়ে সতের হাজার?'

'এর ওপরও যদি গয়নার জন্যে আলাদা চায় তো দোব।'

কিছুক্ষণ বাক্স্ফূর্তি হইল না গদাধরের, তাহার পর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, 'তোমার মাথা-খারাপ হয়েছে?'

'এত পরিষ্কার মাথা আমার কোন দিনই ছিল না, তা না হলে এমন পরিষ্কার মাথাওয়ালা বেহাই চাইছি?—লোকে সমান-সমানই চায় তো?...অবশ্য

তোমার মাথাটা নিশ্চয় এতটা খারাপ হবে না যে, গয়নার কথাটা গিয়ে তুলবে। তবে, ঐ নগদের ওপর কিছু গয়না দোব আমি মেয়েকে।…ওপর ঘরে চলো, সব কথা এখানে হয় না।'

৩

পরামর্শটাই আসল; স্বামী-স্ত্রীর প্রায় সমস্ত রাতই অনিদ্রায় কাটিল—বিবাহের ব্যবস্থাটা কি হইবে, দেওয়া-থোওয়া গয়না-গাঁটি—ভোজ—তাহার পর মেয়ে পাঠানো—তাহার পর—তাহার পর…

সময়ও তো হাতে নাই একেবারে।

আসল বিবাহের মধ্যে আর নূতন কথা কি থাকিবে যে আলাদা করিয়া বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন তাহার?—সেই মেয়ে-দেখা, সেই আসর, সেই ভোজ, সেই বাসর, সেই বিদায়।

যমুনা মেয়েটি বড় বেশি সপ্রতিভ, যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় দুই-তিন বার প্রশ্নের পর মাথাটি নিচু করিয়া যেমন বলা উচিত সেভাবে তো বলেই না, বরং একটু বাগ্‌বিস্তার করিয়া বসে।…'অ্যাঁ নাম আমার? আমার নাম শ্রীমতী যমুনা দাসী…মা বলেন। স্কুলে দিদিমণি বলেন, দাসী না লিখে পাল লিখো…'

এই করিয়া তিনটি সম্বন্ধ নষ্ট করিয়াছে। সরোজিনী সামনে ঝিকে রাখিয়া দোরের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিলেন। দেখিতে আসিয়াছেন মাত্র বরকর্তা, ঘটককে সঙ্গে লইয়া,—দেখা শেষ হইলে ঝিয়ের মধ্যস্থতায় পর্দা-রক্ষা করিয়া বলিলেন, 'ঝি, বল্, বাড়িতে দুটো বেশি কথা বলে ব'লে উনি না মনে করেন, মেয়ে আমার বাচাল। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখবেন, সাত চড়েও কথা কইবে না, বিশ্বাস না হয় বরং লিখিয়ে নিন আমার কাছে।'

আর সব দিক দিয়া দিব্যি মেয়ে, সর্বোপরি নগদ সতের হাজার টাকা, আর তত্ত্ব-তাবাসে দোহন করিবার এত বড় সম্ভাবনা। মনের আনন্দে কাশীনাথ একটু রহস্যই আরম্ভ করিয়া দিল; একটু হাসিয়া বলিল, 'বেয়ানকে অবিশ্বাস ক'রে কি পাপের ভাগী হব?'

হইতে হইল না পাপের ভাগী।

নগদ সতের হাজার টাকার উপর এক-গা গয়না লইয়া বৌ পালকি হইতে নামিল। বৈঁচিতে বেশ সাড়াই পড়িয়া গেল।

সত্যই কিন্তু 'সাত্-চড়েও' কথা কয় না।

সরোজিনী উপরে দু'ইঞ্চি খুরজার একনম্বর ঘি দেখাইয়া টিন-ভরতি ভেজিটেবল গছাইয়া দিয়াছে।

মেয়েটি যমুনা নয়, বড় মেয়ে সরযূ।

গোবিন্দ-মাসী

আমি যখন পোঁছুলাম তখন গোবিন্দ-মাসী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া রহিয়াছেন। পরনে একটা ছোট ভিজে ডুরে-শাড়ি; গায়ে একটা ভিজে গামছা, সামনে আর পিছনে কোমরের কাপড়ে গোঁজা; মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা চুলের উপর কোন আচ্ছাদন নাই। রোয়াকে দাঁড়াইয়া একটু কুঁজো হইয়া গলা ছাড়িয়া দিয়াছেন, দুটি হাত আর দশটি আঙুল নানা ভঙ্গী সহকারে বক্তব্য-গুলিকে রূপায়িত করিতেছেন।

—'সইবে না—সইবে না, যাবি! আমি এই শিবরাত্তিরের উপোস করে, পাতোব্বাক্যে বলছি—যাবি…'

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম অপর পক্ষ খিড়কির পুকুরের ওদিককার ঘাটে। মূল গায়েন রসময়-কাকার পরিবার—আমাদের বিন্দু-খুড়ি, সঙ্গে দুটি মেয়ে দোয়ার দিতেছে। খুব পাকা ওস্তাদ গানের মধ্যেও যেমন প্রয়োজন হইলে এক-আধটা অবান্তর কথা বলিয়া লয়, আবার তালও ঠিক রাখিয়া যায়, সেইভাবে আমায় দেখিয়াই মাসী একবার বলিলেন, 'ঘরে গিয়ে বোস, শৈল, এলুম ব'লে'—তারপর আবার সেইরূপ পূর্ণোদ্যমে লাগাইয়া দিলেন—'সইবে না—সইবে না, আগে একটি একটি করে সবগুনো খাবি, তারপর নিজে যাবি—তার পর, তার আগে নয়—সোয়ামীর গুমুরে, বেটার গুমুরে মটমট করছিস—দেখবি আমি যদি সতী হই, থাকবে না গুমোর; ভালো-খাকী-ই-ই-ই…, শতেক-খোয়ারী-ই-ই-ই…'

নমুনা মাত্র দিলাম। নিজের কেহ নয়, গ্রাম সম্পর্কে মাসী; বিধবা, তাহার উপর একরকম নিঃসঙ্গ, আসিলে দেখাটা করি। প্রায় মিনিট কুড়ি ধরিয়া অসহায়ভাবে এই ধরনের মন্তব্য সব শুনিতে লাগিলাম। বসিতেও পারি না, যাইতেও পারি না। মাসীর ভাবাবেশ খুব বেশি হইলে, খুব লাগসই একটা নূতন কথা যোগাইল 'শৈল বোস্, এলুম এই'—বলিয়া তরতর করিয়া উঠান পর্যন্ত নামিয়া যান, আবার ফিরিয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়ান—উঠানটা যেমন কাছে পড়ে, রোয়োকটা তেমনি আবার উঁচু, সুবিধা অনেক—গালাগালি অনর্গল

চলিতে থাকে, ওরা তিনজনে পাল্লা দিয়া উঠিতে পারে না। এক এক বার যেন অল্প একটু ধরনের মতো হয়, মাসী ঘুরিয়া ঘরের পানে পা বাড়ান, আমি প্রণামটা সারিয়া লইতে উঠি, তাহার পর আবার কি মনে পড়িয়া যায়, মাসী গলা ফাটাইয়া একেবারে উঠানের ও-কোণ পর্যন্ত হনহন করিয়া নামিয়া যান, মনের বোঝা নামাইয়া আবার রোয়াকের উপর আসিয়া নূতন সূত্র ধরেন—'ঐ যে সোয়ামীর দশটা টাকা মাইনে বেড়েছে, ঠ্যাকারে পা পড়ছে না মাটিতে, ও টাকা আর আফিস থেকে হাতে করে নিয়ে আসতে হবে না, দেখিস; আমি যদি কায়মনোবাকে বুড়ো-শিবের মাথায় বিল্বিপত্র চড়িয়ে থাকি, আমি যদি…'

একবার টুকিতে হইল; প্রশ্ন করিলাম, 'মাসীর কি সেরে নিতে এখনও দেরি হবে? তাহলে আমি একবার ওপাড়া থেকে হয়ে আসি।'

মাসী মন্তব্যগুলাকে খুব দ্রুত চরমে লইয়া আসিয়া হঠাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘরে আসিয়া আত্মগত ভাবে শুধু একবার—'মরণ, শতেকখোয়ারী!' —বলিয়া একেবারে নিতান্ত সহজ আলাপের স্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'তারপর, কবে এলি, শৈল? মাসীকে মনে পড়ল এতদিন পরে? আচে সব কেমন বাড়িতে? আর, কার মুখে যেন শুনলুম ভালো একটি চাকরি হয়েছে,—বেশ —বেশ—তা হবে না?…'

'এলুম এই আজ সকালে, ভাবলাম, যাই মাসীমার সঙ্গে…'

প্রশ্নে একটু বিরতি পাইয়া উত্তর দিতে যাইতেছিলাম; মাসী হঠাৎ ঘুরিয়া চিৎকার করিতে করিতে উঠানে নামিয়া চলিলেন—'বেটার চাকরির আশা, হয় নি এখনও, তাইতেই এত গো, তাইতেই এতো। হবে নাকি ও চাকরি? শিবরাত্তিরের উপোস করে এখনও বাসী মুখে আছি, এই পাতোব্বাক্যে বলছি…'

দেখিলাম ঘাটে কেহই নাই, আমার চাকরির কথায় ঐটুকু মনে পড়িয়া যাওয়ায় অন্ধ আবেগেই মাসী একটানা নামিয়া গেছেন। যাই হোক, কেহ না থাকিলেও মন্তব্যটা পুরোপুরিই সমাপ্ত করিয়া আবার উঠিয়া আসিলেন, একটু গলা নামাইয়া আক্রোশের কণ্ঠেই বলিলেন, 'ছেলেটা মাসী বলে এসেছে, থির হয়ে যে দুটো কথা কইব, তা দেবে কইতে? থেকে থেকে গা জ্বলে ওঠে—থেকে থেকে গা জ্বলে ওঠে।'

তাহার পরই পূর্ব মূর্তি, স্নেহকণ্ঠে প্রশ্ন। ঠিক যেন এখনই যে ব্যাপারটা হইল সেটা কপাট আঁটিয়া আলাদা করিয়া দিলেন।

পূজার যোগাড় করিতে করিতে মাঝপথেই রসময়-গৃহিণীর মোহড়া লইতে উঠিয়াছিলেন, আবার চন্দন ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। গল্প আবার চলিতে লাগিল, অবশ্য একতরফা, আমি একরকম শ্রোতা মাত্র।

গোবিন্দ-মাসীর গল্প প্রায় একতরফাই হয়, নিতান্ত তেমন প্রতিপক্ষ না পাইলে কলহও ওঁর একতরফা। আহারের জন্য জিদ ধরিয়া বসিলেন—'ও মা, না খেয়ে মাসীর এখানে থেকে যাবি—কেমন করে কথাটা মুখ দিয়ে বের করলি, শৈল ?" খেয়ে যাবি একমুটো ভাতে-ভাত—মাসীর তো আর কিছু খাওয়াবার সাণ্ডি নেই, তার ওপর আজ আমার মাছের হাঙ্গামও করতে নেই ; তা হোক, মাছের দাগাটাই তো বড় নয়—বড় হচ্ছে মা-মাসীর হাতের রান্না— "না" বল্ একবার, চুপ করে রইলি যে ! বড়ঠাকুরকে...'

'সে তো ভাগ্যি...' বলিয়া আরম্ভ করিতে যাইতেছিলাম, মাসী হঠাৎ হন্তদন্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। আবার গলার আওয়াজটা বাড়িয়া গেল, 'দেখেছ ? বলে, কেন বলো ! আবাগী কিছু মনে থাকতে দেবে ? ভাগ্যিস শৈলর সঙ্গে কথায় কথায় নামটা মুখে এসে গেল, নইলে হয়েছিল তো এক্ষুণি ? বলে, কেন বলো ?...শৈল, বোস্ একটু, বাবা...'

গরগর করিতে করিতে পাশের ঘরে গিয়া মাসী একটা মোটা গরদের কাপড় পরিয়া আসিলেন। একটা পাথরের বাটিতে মিছরি ভিজিতেছিল, সরবৎ করিয়া একটা শ্বেতপাথরের গেলাসে ঢালিয়া খানিকটা নেবুর রস মিশ্রিত করিয়া দিলেন। মুগের ডাল ভিজিতেছিল, যত্নসহকারে বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া একটা রেকাবিতে রাখিলেন, কয়েক রকম ফল কাটা ছিল, খানিকটা শাঁকালু কাটিয়া সবগুলো গুছাইয়া একপাশে রাখিলেন, মাঝখানে খানিকটা ছানা, চিনি, আর তাহার পাশে গোটা চারেক সন্দেশ রাখিলেন...বাক্যস্রোত সঙ্গে বহিয়াই চলিয়াছে—'মাথার ঠিক থাকে কখনও এতে মানুষের—মুয়ে আগুন— ঠ্যাকার দেখাতে এসেছেন—নুড়ো জ্বেলে দিই অমন ঠ্যাকারে...একটা লোককে বামুন হতে বলেছি, তার যে ব্যবস্থা করতে হবে—মনের ঠিক থাকতে দেবে তবে তো মনে থাকবে মানুষের...'

এক হাতে রেকাবি আর এক হাতে সরবতের গেলাসটা লইয়া মাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'এই এলুম বলে, একটু বোস্, শৈল, বড়ঠাকুরকে ছানা আর সরবৎটুকু দিয়ে আসি।'

নিতান্ত কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করিলাম, 'কাকে মাসীমা? কতদূর যাবে?'

'কতদূর আবার?—ঐ আবাগীর বাড়ি। বড়ঠাকুরকে খেতে বললুম না? …দেখ, হাঁ করে রইল।……নাম কি করে কবব রে, হাবা।…সুধীর বাপ—ঐ আবাগীর বর।—এইবার মাথায় ঢুকল?…দেখ, তবু হাঁদার মতো হাঁ করে রয়েছে!'

মাসী আমার মূঢ়তায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলাম, 'সে কি, মাসী, তুমি যে এক্ষুণি কোন গালই বাকি রাখলে না তাঁকে দিতে! ঐ রসময়-কাকাই তো?'

মাসী বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, এত বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন যে, সে বিস্ময়ের কাছে আমার বিস্ময় কিছুই নয়, হাতের রেকাবিটা পাশেই চৌকির উপর রাখিয়া চারটি আঙুল দিয়া নিজের গাল চাপিয়া চক্ষু বড় করিয়া বলিলেন, 'তুই যে অবাক করলি আমায়, আমি ওঁকে গাল দোব? সুধীর বাপ হলেন আমার ভাসুর। সুধীর পিসি বেলপুকুরের সম্পর্কে আমার ননদ, তার দাদা আমার ভাসুর হ'ল না? তাঁর নাম আমার মুখে আনতে নেই, আর তাঁকে গাল দোব?…তিন-তিনটে পাস দিলি, তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে রে, শৈল?'

বিস্মিত হইলেও হাসিয়াই বলিলাম, 'এতক্ষণ তবে কি শুনলুম, মাসীমা?'

'ও সে-সব ঐ আবাগীকে, ঐ উনুন-মুখীকে। দোব না গাল? সোয়ামী-পুত কি কারুর করেনা রোজগার? তাই অত ঠ্যাকার ক'রে…'

হাসিয়াই বলিলাম, 'এর সবগুলোই যে রসময়-কাকা আর ওঁদের ছেলেকে…'

বিস্ময়ের চোটে মাসী সরবতের গেলাসটাও নামাইয়া রাখিলেন, বলিলেন, 'তুই বলিস কিরে শৈল, গুরুজন, নাম পর্যন্ত মুখে আনতে নেই, তাঁকে গালাগাল দোব আমি? আবার অমন সোনারচাঁদ ছেলেকেও? ষাট ষাট,

বেঁচে থাক্, বাড়বাড়ন্ত হোক, আমার মাথার যত চুল তত পরমায়ু হোক্…আমি গাল দিলুম ঐ উনুন-মুখীকে…তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে রে, শৈল?…'

শৈলর বুদ্ধির অবস্থায় নিরতিশয় নৈরাশ্য এবং বিস্ময়ে একটু অন্যমনস্ক হইয়াই রেকাবি আর গেলাস তুলিয়া লইয়া গোবিন্দ-মাসী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

জালিয়াত

হায়, পল্লীর দুলালী, সে আজ কলিকাতার বধূ। বোধ হয় ভাবে—

"হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।
বিরাট মুঠিতলে চাপিতে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া!"

প্রাণ তাহার কাঁদে—

"কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া।"

কিন্তু ঐ পর্যন্ত, ইহার বেশি আর কবিবরের মানসী-প্রতিমার সঙ্গে এই মেয়েটির কিছু মেলে না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই ইহার নিজস্ব মতামত খুব দৃঢ় এবং স্পষ্ট। যাহা ভালো লাগে, তাহা চাই-ই; যাহা লাগে না, তাহা চাই না। সিঁদুরে-আমের লোভে যেদিন গাছের মগডালে উঠিয়া জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিল, সেদিনও ছিল এই কথা, আর আজ, ভালো না লাগার দরুণ, কলিকাতা ছাড়া চাই বলিয়া যেসব ফন্দি-ফিকির মনে মনে আঁটিতেছে, তাহারও মূলে সেই একই কথা।

মেয়েটির নাম চপলা। নাম যখন রাখা হইয়াছিল, সে সময় সকলের দৃষ্টি ছিল ওর মায়ের কাঁচা-সোনার-মতো রঙটির দিকে, এবং কাহারও আর সন্দেহ ছিল না যে, এমন মায়ের মেয়ের দেহলতাটির মধ্যে একদিন বিদ্যুতের চপলদীপ্তি শান্তশ্রীতে ফুটিয়া উঠিবে। মেয়েটি যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ অবাধ্যতার বশেই সবাইকে এই দিক দিয়া নিরাশ করিয়া দিল। কিন্তু তবু নামটা রহিল সার্থক আকাশের বিদ্যুৎ কেমন করিয়া সত্যই যেন ওর শ্যাম দেহটুকুর মধ্যে আটক পড়িয়া গিয়াছে;—তাই ওর মিহি ভ্রূ-দুইটি কথায় কথায় বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো অত কুঞ্চিত হইয়া ওঠে, কালো চোখের তারা অত চঞ্চল, এবং ঠোঁটের কোণে আচমকা হাসি ফুটিয়া, একটু রেশ না রাখিয়াই অমন হঠাৎ মিলাইয়া যায়।

ক'নে দেখানোর সময় বাপ পরিচয় দিয়াছিলেন, 'বড় শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে

আমার—এ কিছু বড়াই ক'রে বলছি না। বাড়ির বাইরে পা দিতে জানে না, কলকাতায় বিয়ে হবার জন্যে যেন তোয়ের হয়ে জন্মেছে।'

আগাগোড়া বানানো কথা। ওর বাড়ি ছিল সদর-রাস্তা, বন-বাদাড়, দীঘির ধার। এখন সেখান হইতে তাহারা সর্বদাই ওকে যেন কান্নার সুরে ডাকিতে থাকে।

আদুরে দুষ্টু মেয়ের যত অত্যাচারের দাগ স্নেহের পরতে পরতে আঁকা, আসন্ন বিচ্ছেদের সময় সেগুলো রাঙাইয়া উঠে। তবুও মেয়ের বাপ, তাঁহাকে বলিতেই হয়, 'বুঝেছেন কিনা, আমার মার মতন শান্ত মেয়ে দুটি পাবেন না; এ কিছু নিজের মেয়ে বলেই যে বলছি, তা নয়…'

প্রবঞ্চনা ধরা পড়িতে অবশ্য দেরি লাগে নাই। শ্বশুর আপিস হইতে ফিরিয়া বাড়ির চৌকাঠ ডিঙাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই ডাকেন, 'কই গো, আমার শান্তশিষ্ট মা-টি কোথায় গেলে?'

চপলা যেমন ভাবে যেখানেই থাকুক, লঘুগতিতে আসিয়া হাজির হয়। লঘুগতি কথাটা মোলায়েম ভাবেই বলা গেল, আসলে শ্বশুরের এই ডাকটিতে কলিকাতার এই অষ্টাবক্র বাড়িখানি হঠাৎ চপলার পক্ষে ঋজু সরল হইয়া যায়, কঠিন বিলাতী মাটির মেঝে বেলপুকুরের দেশী মাটির মতো পায়ের নিচে পরম স্নিগ্ধ, মিঠা হইয়া ওঠে। সে একরকম গোটাকতক লাফেই শ্বশুরের নিকট আসিয়া পৌঁছায়, আবদারের ভৎর্সনায় চক্ষের তারকা নাচিতে থাকে, চাবির গোছাসুদ্ধ আঁচলটা মাটি হইতে তুলিতে তুলিতে বলে, 'না বাবা, আজ আপনি বড্ড দেরি করেছেন, তা বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ!'

দেরি যে রোজ হয়ই এমন নয়, তবে এই মিলনটুকুর মূল্য অনেক; তাই উৎকণ্ঠার জন্যে পুত্রবধূর রোজই মনে হয়, বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। তারই রোজ অনুযোগ।

শ্বশুর রোয়াকে নির্দিষ্ট ঈজি-চেয়ারটিতে দেহখানা এলাইয়া দেন। বধূ পাখা আনিয়া হাওয়া করে, পায়ের কাছে বসিয়া জুতার ফিতা খুলিয়া পা দুইখানি খড়মের উপর বসাইয়া দেয়, চাদর খুলিয়া, জামা নামাইয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া রাখে। ধীরে ধীরে এইসব চলে আর গল্প হয়, 'ঠিক হ'ল, বাবা? বড্ড যেন দেরি হয়ে যাচ্ছে; আমার আর মোটেই ভালো লাগছে না আপনার এই কলকাতা, হ্যাঁ!'

'আর দেরি নেই মা, একটা বাড়ি ঠিক হয়েছে, খালি হ'লেই আমরা উঠে যাব।'

শ্বশুর-বউয়ের পরামর্শ পাকা হইয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর থাকা হইবে না। কলিকাতার বাহিরে বেশ গাড়াগাঁ দেখিয়া বাড়ি দেখা হইতেছে, ঠিক হইলেই সবাই উঠিয়া যাইবে।

বধূকে শ্বশুর কোলের কাছে টানিয়া লন, মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলান, করতল হইতে স্নিগ্ধ আশীর্বাদ ক্ষরিতে থাকে। বাৎসল্যের প্রবঞ্চনায় মুখে শান্ত হাসি ফোটে; ভাবেন, এই দীর্ঘীকৃত আশার মধ্যে দিয়া পাড়াগাঁয়ের স্বপ্ন কাটিবে, ক্রমে এই বাড়িরই ইটকাঠের সঙ্গে মনটা মায়ায়-মায়ায় গাঁথিয়া যাইবে।

স্বপ্ন কিন্তু কাটে না, বরং মনটা এদিকে বিরূপ হইয়া সেই স্বপ্নকেই মায়ার পাকে পাকে জড়াইয়া ধরে।

—অনামধেয় একটা জায়গা; কিন্তু কেমন করিয়া যেন মনের পটে তাহার একটা স্পষ্ট ছবি আঁকিয়া গিয়াছে। বেলপুকুরেব সঙ্গে অনেকটা মেলে, ভিজে ভিজে কালচে মাটি, এখানে-ওখানে গাছপালার ঘন সবুজ দিয়া ঢাকা, উপরের আকাশের নীল আস্তরণখানি উবুড় হইয়া পড়িয়াছে, পাশাপাশি দুইটি কোঠা-ঘর, সামনে পাকা বোয়াক, বিকালের পড়ন্ত রোদটি সেখানে জলজ্বল করিতে থাকে। ওদিকপানে রান্নাঘর, সকাল-সন্ধ্যায় তাহার গোলপাতার ছাউনি ফুঁড়িয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে। পাকা ঘরের পাশ দিয়া রাস্তা। সেটা সদর-দুয়ারের চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ডাহিনে জামরুলগাছের নিচে দিয়া। বাঁয়ে কাহাদের পুকুর, তাহার পুরনো ঘাটের শেষ রানায় কাহাদের ঘোমটা-টানা বউ বাসন মাজে, তাহার শাড়ির রাঙা পাড় আর ছোট রাঙা ঠোঁটের মাঝখানে নোলকটি দুলদুল করে। কে সমবয়সী আসিল, বউ হাতের উল্টা দিক দিয়া ঘোমটা উঁচু করিয়া হাসিয়া কথা কয়।

আরও কিছু দূরে লতা-জড়ানো পুরনো আমগাছের দুই পাশ দিয়া রাস্তাটা ফিরিয়া দুই দিক দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, আমগাছের শিকড়ের কাছে ইট, নুড়ি, খোলামকুচি,—রাংচিত্রের পাতার ছড়াছড়ি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট পায়ের দাগ। মনটি এইখানে আটকাইয়া যায়, যেন নিজেকেই দেখা যায়, গাছের তলায় লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

অন্যমনস্কতা হইতে হঠাৎ সজাগ হইয়া বধূ হাসিয়া বলে, 'তা ব'লে বলে আপনি যেন ভাববেন না বাবা, আমি কচি মেয়েদের মতো পাড়ায় পাড়ায় খেলাঘর র'চে কাটাব—সে ভয় আপনার একটুও নেই ব'লে দিচ্ছি। কিন্তু দেরি করলে হবে না, হ্যাঁ।'

মন ভুলাইবার দিকে স্বামীর চেষ্টারও ত্রুটি নাই। ছোট বোন ক্ষান্তমনির উপর হঠাৎ অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে। বলে, 'ক্ষেন্তী, চিড়িয়াখানায় একটা নতুন জন্তু এসেছে, যাবি নাকি দেখতে?'

ক্ষান্তমণি উৎসাহের সহিত বলে, 'হ্যাঁ, যাব।' তারপর হঠাৎ একটু সঙ্কুচিত হইয়া মিনতি করে, 'একটা কথা রাখবে, দাদা?'

'কি কথা আবার?'

'বউদিকেও—।' আর শেষ কবিতে সাহস করে না।

'হ্যাঃ, অত লোকের ঝক্কি বওয়া—সে আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি!'

এই করিয়া চিড়িয়াখানা, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হইয়া গিয়াছে। রাত্রে স্বামী উৎসাহভরে বলে, 'এইবার কি দেখবে বল; ডালহৌসি স্কোয়ার, হাওড়া স্টেশন?'

বধূ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলে, 'কিচ্ছু না।'—বলিয়া ফিরিয়া শোয়।

অনেক সাধাসাধি চলে: 'কলকাতায় এত দেখবার জিনিস রয়েছে, দেশবিদেশ থেকে লোক আসছে দেখতে—গড়ের মাঠ, গঙ্গার জাহাজ, কত বড বড় বাড়ি, ওপবে চাইতে গেলে ঘাড় উল্‌টে পড়ে—'

'পড়ুক গিয়ে ঘাড় উল্‌টে যার সাধ আছে, আমার কলকাতার কিছু ভালো লাগে না; আমায় বাড়ি দিয়ে এস।'

'কলকাতার কিছুই ভালো লাগে না? আমরাও তো কলকাতার—আমিও তো—'

ঝাঁঝিয়া উত্তর হয়—'তোমাদের কাউকে ভালো লাগে না; যারা কলকাতা ভালোবাসে, তাদের দুচক্ষে দেখতে পারি না।'

দারুণ নিরাশার কথা।

পরের দিন ভগ্নিস্নেহে আবার জোয়ার আসে। প্রশ্ন হয়—'কই রে ক্ষেন্তী, শিবপুরে রামরাজাতলার মেলা ফুরিয়ে এল, একদিনও তো গেলি নি? দিব্যি পাড়াগেঁয়ে পাড়াগেঁয়ে জায়গাটি, আমার তো বড্ড ভালো লাগে।'

আজ তিন বৎসর দাদার খোসামোদ করিয়া ফল হয় নাই ; বলিলেই, 'অজ পাড়াগাঁ, এঁদো ডোবা' বলিয়া নাক সিঁটকাইয়াছে। আজ বিধি অত অনুকূল!

ক্ষান্তমণি হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া হাজির হয়।—'হ্যাঁ দাদা, যাব। আর একটি কথা দাদা শুনবে? বউদিদিকেও নিয়ে চল দাদা, আমার দিব্যি। আহা, বেচারি গো, পাড়াগাঁয়ের কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে ওঠে!'

দাদা রাগিয়া বলে, 'ওঃ—ই, আপনি পায় না, আবার শঙ্করাকে ডাকে! ওইজন্যে কোথাও তোকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় না।'

২

রামরাজা কি ব্যাতাই-চণ্ডীতলা হইতে ফিরিয়া ফল হয় উল্‌টা। পিঁজরার পাখি একবার ছাড়া পাইয়া আবার পিঁজরায় বন্ধ হইলে যেমন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, মেয়েটির অবস্থা হয় সেই রকম। প্রাণটা আইঢাই করে। প্রতি মুহূর্তে বেলপুকুরের কোন না কোন একটা ছিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে; কথায় কথায় ভুল হয়, ঝিকে ডাকিতে বাপের বাড়ির দাসী পদীপিসির নাম মুখে আসিয়া পড়ে ; ননদকে ডাকিতে বাহির হইয়া পড়ে, সই!

ননদ দুই-একবার ভুলটা ভুলের হিসাবেই ধরে, শেষে 'এই যে আসি, সই!' বলিয়া হাসিতে হাসিতে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'মরণ! বলি, তোমার হয়েছে কি আজ? দাদা এলেই বলব, তোমার বুনো হরিণকে বনে ছেড়ে দিয়ে এস।'

বন্য মৃগ নিজেই সে ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া ওঠে। কলিকাতায় থাকা চলিবে না, কোনমতেই নয়।

শ্বশুরকে বলে, 'আমি বলছিলাম, বাবা—'

'হ্যাঁ মা, বল।'

'এই বলছিলাম, মাস তিনেক পরেই তো আপনি কাজ নিয়ে ক'মাসের জন্যে ঢাকা চলে যাবেন? এর মধ্যে আমাদের আর নতুন বাসা ক'রে কাজ নেই। আপনারও অসুবিধে বাবা, আর বাসা-বদলির একটা হিড়িকও তো কম নয়, খরচও এতগুলি, এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিন—'

শ্বশুর নিজের চিকিৎসার এ-রকম আশু সাফল্যে উল্লসিত হইয়া উঠেন, শুধু পাড়াগাঁয়ের নেশা কাটিয়া যাওয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীপনার গাম্ভীর্য আসিয়া পড়া একেবারে! বধূর মাথাটি বুকে চাপিয়া বলেন, 'ঠিকই তো, মা! দেখ তো, কথাটা আমার মাথায়ই ঢোকে নি। আর, বুড়ো হতে চললাম, এইবার মা-ই আমাদের বুদ্ধি দেবে কিনা! আমি তা হ'লে ওদের খোঁজাখুঁজি করতে বারণ ক'রে দোব। ঢাকা থেকে ফিরে আসি, তখন বরং একটা পাকা রকম ব্যবস্থা করা যাবে, কি বল?'

'হ্যাঁ।'—বলিয়া শ্বশুরের বুকে মাথাটি আরও গুঁজিয়া দেয়। ক্ষণেকের জন্য বোধ হয় একটু দ্বিধা আসে, সেটুকু কাটাইয়া ধীরে ধীরে আরম্ভ করে, 'তাই বলছিলাম বাবা—'

'হ্যাঁ মা, বল, বল।'

'এই বলছিলাম, ততদিন না হয় আমাকে একবার বেলপুকুরেই রেখে আসুন না।'

রোগটা মজ্জাগত; এমনভাবে নিরাশ হইয়া চিকিৎসক হাসিবেন, কি কাঁদিবেন স্থির করিতে পারেন না। চিকিৎসার নূতন নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিতে হয়। এই করিয়া দিন চলে। শ্বশুরের পাঠানোর যে সেরকম গা নাই—এ কথাটা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

শাশুড়ীর কাছে চালাকি করিতে সাহস করে না; কারণ শাশুড়ী বেটাছেলে নয়, এবং সেইজন্য, তাহার মতে, বোকা নয়। সোজাই কথাটা পাড়ে,—বাপ, মা, ভাই, ছোট বোনটি এদের অনেকদিন দেখে নাই, তাই—

শাশুড়ী চোখ কপালে তুলিয়া বলেন, 'ওমা, অমন কথা বলোনা বউমা। এই তো ক'টা মাস এসেছ, আমি সেই মোটে ন'বছরের মেয়েটি শ্বশুরঘর করতে এলাম, আর ঝাড়া তিনটি বছর কাটিয়ে—'

চপলারও আশ্চর্যের সীমা থাকে না। বলে, 'এই কলকাতায়, মা?'

'পোড়া কপাল! কলকাতা কোথায়? তা হ'লে তো বাঁচতাম। শ্বশুর থাকতেন ডাহা পাড়াগাঁয়ে—মাঝের-পাড়া। নাইবে? সেই আধ কোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী। খাবার জল চাই? সেই আধ কোশ ভেঙে ইচ্ছেমতী। গা ধোবে? সেই আধ কোশ—'

বধূ আর প্রাণ ধরিয়া শুনিতে পারে না। 'ওই! বেরালটা বুঝি কি ফেললে গো!'—বলিয়া হয়তো হঠাৎ সে-স্থান ত্যাগ করে।

স্বামীর উপর উপদ্রব হয়। সে বেচারি জর্জরিত হইয়া অভিমান করিয়া বলে, 'বেশ তো, বাবাকে মাকে রাজী করাও, আমার রেখে আসতে কি? আমায় যখন ভালই বাস না, মিছিমিছি এখানে থেকে কষ্ট পাও কেন?'

বধূ অবাধে মিথ্যা বলে, একেবারে নির্জলা মিথ্যা—'বাবা মা তো খুবই রাজী। বাবা বলেন, আমার তো ছুটি নেই; অজিতকে বললেই বলবে, পড়ার ক্ষতি হবে; না-হয় আসুক না রেখে।' মা বলেন, 'আমার আর কি অমত মা, আহা, এতদিন এসেছ, তবে আজকাল হয়েছে ছেলের মত আগে। তা তুমি ঠিক এইরকম ক'রে মাকে বল তো, বল, "মা, অত ঘ্যানঘ্যান করছে যখন, রেখেই আসি না-হয় দিন কতকের জন্যে; বাবাকে ব'লে দিও, আমার কলেজের ক্ষতি হবে না"।'

স্বামী অতটা বোকা নয়, এ ফন্দি খাটে না।

কয়েকদিন আবার মুখ অন্ধকার হইয়া থাকে; কথাবার্তা বন্ধ। যত সব বেয়াড়া আবদার ভাবিয়া স্বামীও কয়েকদিন বেপরোয়া ভাবটা জাগাইয়া রাখে, তাহার পর তাহাকেই মাথা নোয়াইতে হয়। বলে, 'যা হবার নয়, তাই ধ'রে ব'সে থাকলে চলবে কেন? বরং চল, দক্ষিণেশ্বর দেখিয়ে নিয়ে আসি, পাড়াগাঁকে পাড়াগাঁও, কলকাতা থেকে অনেক দূরও; বালি হয়ে গেলে বরং নৌকোও চড়া হবে। রাজী?'

পরামর্শ আঁটা হয়; দুপুরে ক্ষান্ত যখন স্কুলে থাকিবে, চপলা গিয়া শাশুড়ীর আদেশ চাহিয়া লইবে মিউজিয়াম দেখিবার নাম করিয়া।

বধূ জিজ্ঞাসা করে, 'তোমারও তো কলেজ আছে?'

'আমার ঘন্টাখানেক মাথা ধরবে, তারপর ক্ষেন্তী চলে গেলে ভালো হয়ে যাবে।'

কথাটা বুঝিতে একটু দেরি হয়, চপলা স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, শুধু ভ্রূ-জোড়াটি অল্প অল্প স্ফুরিত হইতে থাকে। তাহার পর হঠাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে, বলে, 'ও, বুঝেছি, বাব্বাঃ, তোমার দুষ্টুবুদ্ধি কম নয় তো!'

প্রশস্ত শান্ত গঙ্গায় নৌকা চড়িয়াই চপলার মনটা প্রসারিত হইয়া পড়ে। ওপারে প্রকাণ্ড ঘাটের নিচে গিয়া নৌকা লাগে। নামিয়াই একহাঁটু কাদা, এতবড় বিলাসিতা অনেকদিন তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। পা টানিয়া টানিয়া চলিতে স্বামীর হাতটা চাপিয়া ধরে। বলে, 'উঃ, বড্ড মজা, না ?'

সিঁড়ি বাহিয়া সুবিস্তীর্ণ চত্বর, যে দিকটা ইচ্ছা হনহন করিয়া অনেকটা চলিয়া যায়, পায় পায় কতদিনের শৃঙ্খল যেন খসিয়া পড়িতেছে। মন্দিরে ওঠে, সুগঠিত সৌম্যমূর্তির সামনে মাথা নোয়াইয়া পড়িয়া থাকে অনেকক্ষণ ; কিছুই প্রার্থনা করেনা, পড়িয়া থাকার মুক্ত অবসর, তাই পড়িয়া থাকে। গঙ্গার ধারে ধারে পরিষ্কার চওড়া রাস্তা, ঘন আমগাছের মস্ত বাগান, পাতার গাঢ় সবুজে যেন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, পিছনে আয়ত পুষ্করিণী, বেলপুকুরের দীঘির মতো ; একটু ছোট এই যা। ক্রমাগত ঘোরে, একটি মুক্ত বেগচঞ্চল প্রাণ প্রতি মুহূর্তে দেহতটে আসিয়া উচ্ছলিত হইয়া পড়ে—চপল অঙ্গবিক্ষেপে, প্রগল্ভ হাসিতে, কথার অসংযত স্বরে ; মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠে, 'কই গো ! ওমা, এখনও ওখানে। পুরুষের পা না ?'

পুকুরঘাটে আসিয়া বসিল। পা দুলাইতে দুলাইতে পাশের লতাগুল্মের সঙ্গে স্বামীকে পরিচিত করিয়া দিতে লাগিল, 'ওটা ঘেঁটু, ঘেঁটুফুল মহাদেব খুব ভালোবাসেন, সত্যিকারের মহাদেব নয়, খেলাঘরের মহাদেব। আচ্ছা, এর মধ্যে অমূলতার গাছ কোথায় দেখাও দিকিন, কত বুদ্ধিমান দেখি ! পারলে না তো ? ওই দেখ, কলকে ফুলের গাছটার মাথার ওপর ওই হলদে-হলদে— ভয়ঙ্কর বিষ মশাই ! একটু যদি গেল পেটে তো বাড়তে বাড়তে বাড়তে— ওগো, কুঁচকম্বলের চারা—নিশ্চয়ই একেবারে ! নিয়ে আসি তুলে ?'

উৎসাহের সঙ্গে নামিয়া ক্ষিপ্রগতিতে পুকুরপাড়ের জঙ্গলের দিকে চলিল। ঝিরঝিরে-পাতা ছোট চারাগাছটি, হাওয়ায় নধর ডগাটি একটু একটু দুলিতেছে। কাছে গেল তুলিবার জন্য, ঝুঁকিয়া কি ভাবিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া আবার শানের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া পড়িল।

স্বামী হাসিয়া বলিল, 'কি হল আবার ? খেয়ালী মেয়ে !'

'নাঃ, থাক ; কলকাতায় সেই মাটির টবে তো ? আমার মতন দুর্দশা হবে বেচারির।'

দুইজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে চপলা স্বামীর হাতটা

নিজের কোলে লইয়া বলিল, 'এক কাজ করলে হয় না?...বলছিলাম—বলছিলাম, আমায় এই দিক থেকেই বেলপুকুরে রেখে আসবে?'

অজিত হাসিয়া দুষ্টামির সহিত বলিল, 'বেশ তো। টাকা?'

'আমার দু' হাতের দু' গাছা চুড়ি দিচ্ছি।'

স্বামী কি ভাবিয়া আবার চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, 'সে মন্দ কথা নয়; মাকে কিন্তু কি বলব?'

'সে আমি ভেবে রেখেছি, বলবে, নাইতে গিয়ে ডুবে গিয়েছে।'

আবার একটু চুপচাপ। চপলা তাগাদা দিল, 'কই, কি বলছ?'

স্বামীর হঠাৎ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; কিন্তু মনের ভাবটা গোপন করিয়া হাসিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলিল, 'উঃ, খাসা হয়; কিন্তু তারপর?'

'তারপর অনেক দূর গিয়ে ভেসে উঠব, আমায় একজন মাঝি তুলবে, একটু চোখ খুলে বেলপুকুরের নাম করব—নভেলে যেমন হয় গো—'

'নভেলে মিউজিয়ামের কোঠাবাড়িতে কেউ ডুবে মরে না। চল, ওঠ, বেলা পড়ে এল।'—বলিয়া স্বামী উঠিয়া পড়িল।

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সবাইকেই বোঝা যায়। চপলা মনে মনে বলে, খুব চালাক সব, আচ্ছা, আমিও কম সেয়ানা নয়, দেখি।

বাবার কাছে গোপনে পত্র যায়—কাঁদুনিতে, মিথ্যা কথায় ভরা—এরা সব মারে-ধরে, চাবি দিয়ে রাখে—দু'চক্ষের বিষ হয়ে আছি। কখনও কখনও এমনও থাকে—পাড়ার মেয়েদের কাছে আমার আর মুখ দেখবার জো নেই; যে-ই দেখে, বলে, ওমা, কেমন পাষাণ বাপ-মা গো! ওই দুধের মেয়ে—

চিঠি যা আসে, তাহাতে এ-সবের উত্তর হিসাবে কিছুই থাকে না; একরাশ উপদেশ থাকে মাত্র। চপলা মনে মনে বলে, চপীর ভাগ্যে সব সমান; আচ্ছা, বেশ!

৩

গ্রীষ্মের দুপুরবেলা। শ্বশুর আপিসে, স্বামী কলেজে, ননদ স্কুলে। চপলা শাশুড়ী আর পিসশাশুড়ীকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল, তাঁহারা একে একে ঘুমাইয়া পড়িলেন। একটু পরে সে বই বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল। রামায়ণে তিনজনে আসিয়া পঞ্চবটী বনে বাসা বাঁধিয়াছেন। ঠিক এই জায়গাটিতে

শাশুড়ীরা ঘুমাইয়া পড়িলেও চপলা বিন্ধ্যকাননের সেই অপূর্ব বর্ণনা শেষ না করিয়া উঠিতে পারে নাই। অযোধ্যার রামচন্দ্রের চেয়ে পঞ্চবটীর রামচন্দ্রকে বেশি ভালো লাগে। কাননচারিণী সীতার উপর একটা ঈর্ষামিশ্রিত সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে তৃপ্তি আর অস্বস্তি—দুইয়েই ভরিয়া তোলে।

বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। চাওয়া যায় না। মনে হয়, সারা কলিকাতায় যেন আগুন লাগিয়াছে; উঁচু-নিচু লক্ষ বাড়ির দেওয়াল বাহিয়া ছাত ফুঁড়িয়া শিখা লকলক করিয়া উঠিতেছে—কি একরকম সাদাটে-নীল আগুন, যাহাতে একটু ধোঁয়ার স্নিগ্ধতা নাই। এই সময়ে বেলপুকুরের কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে, দীঘির পাড়ে সেই অন্ধকার সপ্তপর্ণী গাছের তলা, কালো জলের উপর তরতরে ঢেউ—

'চিঠি আছে!'—সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজায় পিয়নের মুঠির ঘা পড়িল। চপলা তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইতে যাইতে দরজার ফাঁক বাহিয়া একখানি পোস্টকার্ড উঠানে আসিয়া পড়িল। বাবার চিঠি—শ্বশুরকে লেখা।

পড়িল। মামুলী চিঠি, তাহার বিশেষ উল্লেখও নাই। 'আশা করি, বাড়ির সর্বাঙ্গীণ কুশল'-এর মধ্যে আর মামুলী আশীর্বাদে সে যতটুকু আসিয়া পড়ে।

স্বামীর পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল। এটা-সেটা লইয়া খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া আবার বাবার চিঠিটা লইয়া পড়িল। বাবার চমৎকার লেখা! এদের বাড়িতে কাহারও লেখা এমন নয়। বলিতে নাই—গুরুজন, কিন্তু শ্বশুরের লেখা তো একেবারে বিশ্রী! স্বামীর লেখাটা অত খারাপ নয় বটে, তবুও বাবার লেখার সামনে ঘেঁষিতে পারে না।

স্বামীর গানের খাতাটা টানিয়া লইয়া তুলনা করিতে লাগিল।—কিসে আর কিসে! ডাগর ডাগর ছাপার মতো অক্ষর, ওপরে ঢেউখেলানো মাত্রা, এ এক জিনিসই! স্বামী বলে, একটু কাঁচা লেখা। কী সব পাকা লেখা রে নিজেদের!

লেখার দিকে বাবার ঝোঁক ছিল বড্ড; চপলাকে লইয়াও অনেকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন। একেবারে বাবার মতো লেখা হওয়া বরাতের কথা, তাহা হইলেও স্বামীকে সে খুবই হারাইয়া দিতে পারে।

লেখার কথাতেও বেলপুকুর আসিয়া পড়ে। বাবা-মায়ের মধ্যে তর্ক

হইতেছে। বাবা বলিতেছেন, 'চপীর লেখা দেখেই তো ওর শ্বশুর পছন্দ করে ফেললে।'

মা বলিতেছেন, 'আর ওর অমন চোখ, মুখ, গড়ন বুঝি কিছুই নয়?'

আজকাল শ্বশুরবাড়িতে নানা মুখে প্রশংসা শুনিয়া মায়ের গুমরের চোখ, মুখ, গড়ন সম্বন্ধে একটু কৌতূহল হইয়াছে, একটা সজ্ঞানতা আসিয়া পড়িয়াছে। টেবিলের উপর হইতে হাত-আরশিটা তুলিয়া লইয়া প্রতিচ্ছায়ার দিকে চাহিল —হাসি-হাসি সলজ্জ, যেন অন্য কাহাব চোখ। বাপের বাড়ির আরশিতে এরকম ছায়া পড়িত না ; যত চায়, চোখ ছুইটা যেন লজ্জায় ভরিয়া আসে।

'ছাই চোখ-মুখ, ছাই গড়ন!'—বলিয়া আরশিটা রাখিয়া দিল। অন্যমনস্ক হইয়া কলমটা লইয়া পোস্টকার্ড দেখিয়া লিখিতে লাগিল—

'অনেকদিন যাবৎ আপনাদের কোন সংবাদ না পাইয়া'—ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া মিলাইতে লাগিল। বেশ একটু আদল আসে বাবার লেখার মতো। তবুও অনেকদিন অভ্যাস ছাড়িয়া গিয়াছে।

কিরকম একটা ঝোঁকের বশে লিখিতে লাগিল, অনেকদিন যাবৎ— অনেকদিন যাবৎ, ছুইবার, চারবার, আটবার দশবারেরটা অনেকটা মেলে। এখনও আছে তফাত, তবে বাপের মেয়ের লেখা বলিয়া দিব্যি চেনা যায় বটে।

হঠাৎ কথাটা যেন মাথায় পাক দিয়া ঘুরিতে লাগিল, বাপের মেয়ের লেখা— বাপের মেয়ের লেখা—

চপলা আস্তে আস্তে কলমটা রাখিয়া দিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া দাঁতে নখ খুঁটিতে লাগিল। দৃষ্টি স্থির, ভ্রূ-ছুইটি কুঞ্চিত হইয়া খয়েরের-টিপটির কাছে একসঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাহাব বুকের টিপটিপানিটা বাড়িয়া গেল, সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং ঠোঁটের কোণে নিতান্ত অল্প একটু হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল। বাপের মেয়ের লেখা, আর যদি ওটুকু তফাতও মিটাইয়া ফেলা যায়!

মাথার মধ্যে একটি মতলব জাঁকিয়া উঠিতেছে, চপলা একমনে সেটিকে বেশ ভালো করিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিল। একবার উঠিয়া একটু ঘুরিয়া আসিল, শাশুড়ীরা অকাতরে ঘুমাইতেছেন। ঘড়িতে মোটে একটা বাজিয়াছে।

স্বামীর কলেজ বোধ হয় আজ চারটা পর্যন্ত, এখনও ঢের সময়। ঘরে আসিয়া পোস্টকার্ডটি সামনে, বইয়ের তাড়ার গায়ে হেলান দিয়া রাখিল, তাহার

পর কতকগুলা কাগজ লইয়া ইস্তক শ্রীশ্রীদুর্গা-সহায় হইতে শ্রীঅখিলচন্দ্র-দেবশর্মণঃ পর্যন্ত সমস্তখানি নকল করিতে লাগিয়া গেল।

দুইটা বাজিয়া গেল, আড়াইটা, তিনটা। কপালের ঘাম মুছিয়া মুছিয়া আঁচলখানি ভিজিয়া গিয়াছে। তা যাক। ওদিকে প্রত্যেক অক্ষরের বাঁক, কোণ-কাণ, মাত্রা একেবারে বাবার লেখার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মেয়ে লিখিয়াছে বলিয়া চিনুক দেখি কে চিনিবে।

তাহার পর আসল কাজ, যাহার জন্য এত মেহনত। বাপের চিঠি হইতে অক্ষর বাছিয়া বাছিয়া একটা আলাদা কাগজে সন্তর্পণে লিখিল—

পুনশ্চ। আর বৈবাহিক মহাশয়, আপনার বেহান কদিন থেকে একেবারে শয্যাধরা। একবার চপুকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীমান অজিত বাবাজীবনের সহিত অতি সত্বর পাঠাইয়া দেন তো ভাল হয়। ইতি—

শ্রীঅখিলচন্দ্র দেবশর্মণঃ

কাগজখানি পোস্টকার্ডের পাশে একেবারে সাঁটিয়া ধরিল। অবিকল বাবার লেখা। চপলা লেখাটুকু আরও আট-দশ বার ভালো করিয়া মক্স করিয়া লইল, তাহার পর সর্বসিদ্ধিদাত্রী দুর্গাকে স্মরণ করিয়া সমস্তটুকু বাবার পোস্টকার্ডে ঠিকানা লেখার দিকে খালি জায়গাটুকুতে সাবধানে লিখিয়া ফেলিল।

লিখিয়াই তাহার মুখটা শুকাইয়া গেল, কলমটা রাখিয়া বলিল, 'ওই যাঃ!'

ঠিকানার কালির সঙ্গে এ কালির মোটেই মিশ খায় না। উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দুই পিঠ তুলনা করিতে লাগিল। না, এ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, আজকের সদ্য লেখা। এ চিঠি দিলেই তো সর্বনাশ, আবার না দেওয়াও বিপজ্জনক। এখন উপায়?

ভাবিতে ভাবিতে সে নিতান্তই বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহার কাজটা ক্রমে একটা অপরাধের আকারেই তাহার মনে প্রতীয়মান হইয়া উঠিতে লাগিল। ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'এ কি করলে মা-দুর্গা? তা হ'লে লেখাতে গেলে কেন অত ক'রে, মা!'

চপলার এখনও বিশ্বাস, মা দুর্গা নিজের অন্যায়টুকু বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ তাহার মাথায় আর একটু বুদ্ধি আনিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া বাক্স খুলিয়া একটি চিঠি বাহির করিল, কাল দুপুরে বসিয়া সইকে

খানিকটা লিখিয়াছিল, এখনও শেষ হয় নাই। কম্পিত বক্ষে চিঠিটার ভাঁজ খুলিয়া পোস্টকার্ডে বাবার লেখার পাশে ধরিল, একেবারে এক কালি।

আশ্বস্ত হইয়া নিজের মনে বলিল, 'মা যে বলেন, ভাল কাজে বিঘ্নি অনেক, তা মিছে নয়; যাক, কেটে গেল।"

বিকেলে আসিয়া শ্বশুর অভ্যাসমতো জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ কোন চিঠি-ফিঠি এসেছিল গা, শান্ত মা?'

চপলা একটুও দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিল, 'কই, না তো বাবা!'

একটু পুরনো হইয়া দুই রকমের কালির গরমিল মিটাইয়া চিঠিটা আসিল তাহার পরদিন, উঠানের একপাশেই পড়িয়া ছিল, শাশুড়ী তোলেন। শ্বশুর বালিশের নিচে আপিসের চাবি রাখিতে গিয়া আপনিই পাইলেন; চপলা সেদিন বাড়িতে ছিল না তখন।

পাশের বাড়ি হইতে বেড়াইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। কেমন যেন শ্বশুরের সামনে আসিতে পা উঠিতেছে না, বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে।

ডাক পড়িল—'কই গো, চঞ্চলা মাকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

যতটা সম্ভব সহজভাবেই আসিয়া দাঁড়াইল। 'কি বাবা?'—বলিয়া মুখ তুলিতেই চোখের পাতা কিন্তু নামিয়া আসিল।

'অমন শুকনো কেন, মা? আজ ঘুমাও নি, না? এঃ-ই, দেখেছ দুষ্টু পাড়া-বেড়ানি মেয়ের কাণ্ড?' কাছে টানিয়া লইলেন, 'অসুখ করবে যে। বাবার চিঠি এসেছে, দেখেছ?'

'কই, না!' চোখ তুলিতেই আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িল। মুখটাও একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

শ্বশুর দেখিলেন, পাগলী মেয়ে, বাপ লইয়া যান না বলিয়া চিঠির নামেই অভিমান; ক'টা দিনই বা সে আসিয়াছে, তাহা তো হিসাব করিয়া দেখিবে না।

বলিলেন, 'এসেছে। আর, তোমায় একবার যেতে লিখেছেন বেয়াই মশাই।'

আসল কথাটি জানাইবেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন; ক'দিন থেকে শয্যাধরা, বেশ ভাবনার কথা। বলিলেন, 'বেয়ান-ঠাকরুণের একটু অসুখ

লিখেছেন। কিন্তু কেমন যেন একটু খাপছাড়া-খাপছাড়া, হঠাৎ শেষের দিকে পুনশ্চ দিয়ে একটু লেখা। আর, এই সেদিন চিঠি এল, কিছু তো লেখেন নি! যাই হোক, অজিত গিয়ে একবার তোমায় রেখে আসুক।'

সফলতার আনন্দে শরীর-মনের সঙ্কোচটা কাটিয়া যাইতেছে, বুদ্ধিও খুলিতেছে। চপলা বলিল, 'খাপছাড়া যে বলছেন বাবা, বোধ হয় মনটা সুস্থির নেই, তাই আগে লেখেননি।'

বাপের অসঙ্গতির জন্য কন্যার দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করিয়া এবং অদ্ভুত জবাবদিহি শুনিয়া শ্বশুর হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'বাপ নিশ্চয়ই গাঁজা-টাঁজা খায়, উল্টো-সোজা জ্ঞানগম্যি নেই।'

যাক, কথাটা চপলা পূর্বে অত খেয়াল করে নাই। বাবার গাঁজাখুরির অপবাদে যদি আপাতত ওটা চাপা পড়ে তো তাহার আপত্তি নাই।

মনে মনে খুশি হইয়া বলিল, 'যান, ঠাট্টা করছেন আপনি।'

মনে পড়িল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, যাহা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। প্রশ্ন করিল, 'মার কি খুব অসুখ নাকি, বাবা? আমাব তো ভয়ে হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে। হঠাৎ যেতে বল কেন রে বাপু!'

মুখটা বিমর্ষ করিবারও চেষ্টা করিল। সবল আনন্দকে কিন্তু কৃত্রিম বিষাদে চাপা দিতে পারিল না। সেটুকু শ্বশুরের লক্ষ্য এড়াইল না, তবে বাৎসল্য নাকি নিজেকেই নিজে প্রবঞ্চিত করে, তাই ভাবিলেন, আহা, বড় ছেলেমানুষ, বাড়ি যাওয়ার আহ্লাদেই ও এখন আত্মবিস্মৃত; ভালোই, যত ভুলিয়া থাকে।

উত্তর দিলেন, 'না, এই সামান্য একটু জ্বর। তবে দেখতে চাইছেন, দেখে এস একবার।' —মুখে সহজ প্রফুল্লতার ভাবটা টানিয়া রাখিবার চেষ্টা।

বধূরও লক্ষ্য এড়াইল না। শ্বশুরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য একটু অনুতাপও বোধ হয় হইল, আহা, বুড়ো মানুষ, তায় গুরুজন। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, আরও একটু প্রবঞ্চনা করা দরকার, উচিত হিসাবেও, আবার ওই গোলমেলে চিঠিটা হস্তগত করিয়া ফেলিবার জন্যও। বলিল, 'কই, চিঠিটা তো দেখলাম না, বাবা; কী লিখেছেন, দেখি-না একবার। আমি যেন কিছু বুঝতে পারছি না বাপু!'

শ্বশুর বলিলেন, 'হ্যাঁ, এই যে।'

এ-পকেট সে-পকেট খুঁজিলেন। বলিলেন, 'কোথায় যে রাখলাম, দোব'খন খুঁজে, ভালোই আছেন, এমন কিছু নয়। যাও : একবার পাঁজিটা নিয়ে এস দিকিন।'

ভাবিলেন, একেবারে 'শয্যাধরা' লেখা রহিয়াছে, চিঠিটা দেখানো ঠিক নয়। আহা, নিতান্ত ছেলেমানুষ, এ-ক্ষেত্রে একটু প্রবঞ্চনা করাই ভালো। করিলেনও।

বাক্সপত্র গুছাইতে গুছাইতে আবার হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হইয়া চপলার সর্বশরীর যেন শিথিল করিয়া দিল, শ্বশুর যে বাবাকে চিঠির উত্তর দিবেন। তাহা হইলেই তো সব ফাঁস হইয়া যাইবে।

আর তাহার পর যে লাঞ্ছনা, যে কেলেঙ্কারি, তাহা ভাবিতেও যে গা শিহরিয়া উঠে।

এমনই অবস্থা যে, মা-দুর্গাকে খোসামোদ করিলেও কোন সুরাহা হইবার নয়। মরিয়া হইয়া ধিক্কার দিল, 'এই ছিল তোমার মনে, মা, শেষকালে? তোমারও তো বাপের বাড়ি আছে, পাগলের মতো ছুটে আসতে হয়।'

যুক্তিটা নিশ্চয় মা-দুর্গার মর্মে লাগিল। প্রথম ঘোরটা কাটিয়া গিয়া চপলার মাথাটা একটু পরিষ্কার হইল। শ্বশুরের কাছে গিয়া বলিল, 'বাবা, বলছিলাম যে—"

'হ্যাঁ মা, বল।'

'এই বলছিলাম, আপনি বাবাকে চিঠিটা লিখে আমায় দিয়ে দেবেন, আমিও তার ওপর দুটো কথা লিখে ডাকে—'

'চিঠি লিখে তো কোন ফল হবে না মা, তোমরা তো কাল সকালেই যাচ্ছ। তাই ভাবছি—'

'হ্যাঁ বাবা, থাক্।' একটি স্বস্তির নিশ্বাস পড়িয়া বুকটা হালকা হইল।

'তাই ভাবছিলাম, একটা না-হয় টেলিগ্রাম— '

সর্বনাশ! চপলা একেবারে কপালে চোখ তুলিয়া বলিল, 'টেলিগ্রাম!'

'হ্যাঁ মা, তাই ভাবছিলাম; কিন্তু হিসেব ক'রে দেখছি, সেও তো তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের আগে পৌঁছুবে না।'

আর একটি স্বস্তির নিশ্বাস। বাবাঃ, ফাঁড়া যেন কাটিয়াও কাটে না!

তাড়াতাড়ি বলিল, 'হ্যাঁ বাবা, আর মিছিমিছি পয়সা খরচও, এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিন।'

বুদ্ধির জোয়ার নামিয়াছে। একটু থামিয়া বলিল, 'আর এও তো ভেবে দেখতে হবে বাবা, মার অমন অসুখ, এর মধ্যে খুট ক'রে বাড়িতে এক টেলিগ্রাম। শেষকালে খুলে পড়বার আগেই কি হতে কি হয়ে পড়বে; আপনিই বলুন না? তার চেয়ে আমার হাতে বরং ভালো ক'রে চিঠি লিখে দেবেন, আমি গিয়েই বাবাকে দিয়ে দোব।'

নোংরা

হাবুল মফঃস্বল কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় এম. এ. পড়িতে আসিতেছে। জোড়াসাঁকোয় তাহার কাকার বাড়ি, কয়েকদিন হইতে সেখানে একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বউয়ে-ঝিয়ে, ছেলে-মেয়ের পরিবারটি একটু বড়, সতর্কতা সত্ত্বেও একটু অপরিচ্ছন্নতা আসিয়াই পড়ে। গৃহিণী বলিতেছেন, 'আমি উদয়াস্ত খিটখিট ক'রে হার মানলাম, এইবার তোমরা জব্দ হবে। সে তেমন শুচিবেয়ে ছেলে নয়, একটু কোথাও ময়লা দেখলে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাবে!'

বধূ নিজের দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুটি আর ছোট দেওর ননদগুলিকে খেলায়-ধুলায়, সাজে-গোজে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করিতেছে; একটু এদিক-ওদিক হইলেই শাসাইতেছে, 'ঐ গাড়ির শব্দ; দেখ তো র‍্যা, বোধ হয় হাবুল ঠাকুরপো এল!' শিশুমহলে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় বেশ সুফলও পাওয়া যাইতেছে।

স্কুলগামী ছেলেমেয়ে পাঁচটি। তাহারা পড়ার ঘরদুয়ার ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া, বইয়ে সাদা কাগজের মলাট দিয়া, একপ্রকার সশঙ্ক আগ্রহের সহিত হাবুলের প্রতীক্ষা করিতেছে; ওদিকে তাহাদের স্কুলে পর্যন্ত হাবুলদাদার অলৌকিক পরিচ্ছন্নতার সংবাদ প্রচার করিয়া সেখানেও একটু বিস্ময়ের গুঞ্জন তুলিয়াছে। বড় মেয়েটি আবার একটু বেশি কল্পনাপ্রবণ, চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া সহপাঠিনীদের বলিতেছে, 'এত্তোটুকু ধুলো কি বালি একটু দেখুক দিকিনি হাবুলদাদা তোমার গায়ে, এই একরত্তি, হুঁ মশাই!' পরিণামটুকু তাহাদের কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিয়া আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে।

ঠিক এতটা না হইলেও ছেলেটি এ বিষয়ে একটু বাতিকগ্রস্ত বটে। আসিল, দিব্য ফিটফাট; ট্রেনে, জাহাজে যে এই বারোটি ঘণ্টা কাটাইয়া আসিল, চেহারায় তাহার চিহ্ন খুবই কম, পরিচ্ছদে নাই বলিলেও চলে, জুতা-জোড়াটি পর্যন্ত কখন এরই মধ্যে কেমন করিয়া ঝাড়িয়া ঝকঝকে করিয়া লইয়াছে।

ব্যাগটা রাখিয়া, কাকীমাকে প্রণাম করিতে ঝুঁকিয়া হঠাৎ একটু পার্শে

সরিয়া গেল ; বলিল, 'একটু সরে এস এদিকে কাকীমা, একটু যেন নোংরা ওখানটা।'

ছেলেমেয়েরা সসম্ভ্রম কৌতূহলে এক স্থানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বড় মেয়েটি আগাইয়া গিয়া চারিটি আঙুল দিয়া জায়গাটা মুছিয়া দেখিল, তকতকে শানের ওপর একটু জলের সঙ্গে সামান্য একটু যেন ময়লা। সরিয়া আসিয়া, চোখ বড় করিয়া সবাইকে দেখাইয়া, সেটুকু সাদা কাগজে মুছিয়া রাখিতে গেল, সহপাঠিনীদের দেখাইবে, হাবুলদার প্রমাণ।

হাবুল প্রশ্ন করিল, 'বউদি কোথায় কাকীমা? সেই দাদার বিয়ের সময় দেখেছিলাম। সামনে আসতে লজ্জা হচ্ছে নাকি তাঁর?'

বউদি সে-ভাবের উৎকট রকম লাজুক নয়। রান্নাঘর থেকে হাত-মুখ মুছিয়া আসিতেই ছিল, মাঝপথে ননদের সপ্রমাণ রিপোর্ট পাইয়া, ফিরিয়া গিয়া একবার আরশিটা দেখিয়া লইতেছিল। একটু দেরি যে হইয়া গেল, তাহার কারণ, সুন্দরী স্ত্রীলোকের আরশির সামনে দাঁড়াইলে একটু দেরি হইয়া যায়ই। শাশুড়ীর ডাকে আসিয়া হাজির হইল।

একটি মিষ্টি হাসি দিয়া দেবরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, 'এস ভাই, ভালো আছ তো?'

'মন্দ নয়।'—বলিয়া হাবুল পায়ের ধূলা লইল, এবং সত্যই ধূলা লাগিয়াছে কিনা, একবার ত্বরিতে দেখিয়া লইয়া হাতটা কপালে ঠেকাইয়া হাসিয়া বলিল, 'ভাগ্যিস কাকীমা ডেকে দিলেন, নইলে মোটে আছি কিনা সে খোঁজই নিতে বড়! অন্যায় বললাম, কাকীমা?'

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, 'ঐ আরম্ভ করলি। উনি তো এসেছিলেনই বাপু।'

বউদি বলিল, 'না ভাই, আমি এক টেরেয় ওদিকে একটু কাজে ছিলাম ; কেউ এলে-গেলে ওদিক থেকে টের পাওয়ার জো নেই।'

'কাজ, রন্ধন তো?'

'পেটুকের জাত তোমরা, শুধু ঐটিকেই চেন বটে, কিন্তু তা ছাড়া আমাদের আর কাজ নেই নাকি?'

'আঁচলের কোণে মসলার ছোপ লাগবে আর কোন্ কাজে?' বধূ লজ্জিত-ভাবে আঁচলের দিকে চাহিয়া মুখ নিচু করিল ; এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও অপযশটুকু লাগিয়াই গেল। আচ্ছা চোখ তো!

ননদ আসিয়া পাশ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গোপনে আঁচলটা তুলিয়া ধরিয়া বধূর দিকে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, 'ইস, আমাদের তো চোখেই পড়ে না!'

হাবুল বলিল, 'তা হোক, তোমার বউ কিন্তু কাকীমা, ছেলেমেয়েগুলিকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছে।'

কাকীমা বলিলেন, 'তা বলতে নেই বাপু, সেদিকে বেশ নজর আছে।'

স্বীয় প্রশংসায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া বধূ বলিল, 'দাঁড়াও, বশ কতক্ষণ টেঁকে দেখো।'

ছোটদের মধ্যে মৃদু একটু চাঞ্চল্য পড়িল, তাহাদের প্রশংসা হইতেছে। ও জিনিসটা তাহাদের বরাতে সচরাচর জোটে না। একজন নিজের পরিষ্কার জামাটির উপর হাত বুলাইয়া নূতন করিয়া একটু ঝাড়িয়া লইল। দেখাদেখি পাশেরটিও তাহাই করিল এবং ক্রমে পদ্ধতিটা সংক্রামক হইয়া উঠিল। একটি ছোট মেয়ের হাতে একটি ধূলিমলিন পেয়ারা লুকানো ছিল। সেটি সে তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল এবং দেহ ও পরিচ্ছদ দুইটিই পরিষ্কার রাখিবার উৎসাহে ফ্রকের মাঝ-বরাবর হাতটা বেশ ভালো করিয়া টানিয়া লইল। ইহাতে যখন সকলে হাসিয়া উঠিল, মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বধূকে জড়াইয়া তাহার হাঁটু-দুইটির মাঝখানে মুখটা গুঁজিয়া দিল।

'ছাড়, আমার কাপড়ও খাবি এই সঙ্গে!'—বলিয়া বধূ মেয়েটিকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য না হওয়ায় দেবরের দিকে চাহিয়া বলিল, 'দেখলে তো, সোজা এই ভূতপেত্নীদের সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে থাকা, ঠাকুরপো? বলছ তো—'

অতি-পরিচ্ছন্নতাটা যে এ-বাড়ির স্বাভাবিক অবস্থা নয়, হাবুল সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এটাও আঁচিয়া লইয়াছিল যে, তাহারই পরিচ্ছন্নতা-বাতিকের জন্য পরিবারটি একটু সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, 'তা, তোমার যে এত পরিষ্কার-বাই, তা আমার জানা ছিল না, বউদি। দাদার ছোট মেয়ে বুঝি ওটি? এস তো আমার কাছে, মা; মা তোমার মেমসাহেব, নেবে না।'

ভাজ ব্যস্তভাবে মানা করা সত্ত্বেও পেয়ারা-রসসিক্ত মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। ছেলেরা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল, এতবড় অঘটন তাহারা জন্মে দেখে নাই।

কাকীমা বলিলেন, 'ওরে, ওর জুতোর ধূলোয় তোর জামাটা গেল হাবু, নামিয়ে দে। ওমা! তোর সে অমন শুচিবাই গেল কোথায়?'

হাবুলের সমস্ত শরীরটা ঘিনঘিন করিতেছিল, মরিয়া হইয়া মেয়েটির পেয়ারা চিবানো মুখে একটা চুম্বন দিয়া বলিল, ''সেসব চিরকাল থাকবে নাকি, কাকীমা? সে ছিল একটা রোগ, যখন ছিল তখন ছিল।'

বড় মেয়েটি একটু নিরাশ হইয়া পড়িল, হায়, তাহার পূজার প্রতিমার ভিতরে শুধুই খড়!

২

হাবুল দিন-পাঁচেক কোনরকমে যথাসম্ভব আত্মগোপন করিল, তাহার পর নবাগমনের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেলে নিজমূর্তি ধারণ করিল।

কলেজ হইতে আসিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া মাঝে মাঝে নাক উঁচু করিয়া শরীরে, কাপড়ে কিংবা ঘরে কোথায় অতিসূক্ষ্ম ময়লা আছে তাহাই উপলব্ধি করিতেছিল। খুড়তুতো বোন শৈল, সেই স্কুলের ছাত্রী বড় মেয়েটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চা আনব, দাদা?'

'তোর নখ দেখি?'

শৈল হাত দুইটি উপুড় করিয়া সামনে ধরিল। ঘটনাক্রমে নখ ছিল না, শৈল আজই ক্লাসে বসিয়া দাঁতে খুঁটিয়া শেষ করিয়াছে। হাবুল বলিল, 'যাও; জেনে রেখো, নখের ময়লা বিষ; পেটে গেলে—'

শৈল বলিল, 'তা জানি। ম'রে যায় লোকে।'

ভগ্নীর স্বাস্থ্য-জ্ঞানটা তাহার চেয়েও এত উৎকট রকম প্রবল দেখিয়া হাবুল হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না। একটু থামিয়া বলিল, 'হুঁ, জার্ম্ কাকে বলে, জান?—রোগের বীজাণু?'

শৈল ভাবিতে লাগিল।

'কিসে একজনের শরীর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে, আর সুবিধে পেলে তাকে মেরেও ফেলে অন্যজনের শরীরে রোগ নিয়ে যেতে পারে?'

শৈল আর একটু ভাবিল, তাহার পর হেঁয়ালির উত্তর দেওয়া গোছের করিয়া বলিয়া উঠিল 'ডাক্তারে।'

হাবুল বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কোন্ বিদুষী তোমাদের হাইজিন পড়ান?

জার্ম একরকম খুব ছোট পোকা, এত ছোট যে, একটা স্থচের ডগায় লক্ষ লক্ষ থাকতে পারে; তারা যত রকম রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়, বুঝেছ তো? এখন, এদের থেকে বাঁচতে হ'লে আমাদের কি করতে হবে?'

'স্থচ কিনব না।'

হাবুলের ধৈর্য চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল, তবুও সংযতকণ্ঠে বলিল, 'পরিষ্কার থাকতে হবে, কেননা ধুলো কাদা, পচা জিনিস—এইসব নানান রকম ময়লাতে এদের জন্ম আর বৃদ্ধি। টিটেনাস কাকে বলে জান?—ধনুষ্টঙ্কার?'

'অর্জুনের—'

'না না, অর্জুনের ধনুষ্টঙ্কার নয়; সে একরকম রোগ।··· যা, চা-টা নিয়ে আয়।'

দেরি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বউদিদি নিজেই চা লইয়া আসিল। হাবুল বলিল, 'একটা সাধারণ রোগের নাম পর্যন্ত জানে না; এরা পরিষ্কার থাকার মানে কি বুঝবে বল তো, বউদি? কাজেই, তুমি সর্বদা খড়্গহস্ত হয়ে থাকলেও কোন ফল হচ্ছে না। আমি ঠিক করেছি, এদের সবাইকে একত্র ক'রে আমি রোজ বিকেলে খানিকটা করে লেকচার দোব। শৈল, সবাইকে ডেকে আনবি।'

বউদি বলিল, 'রোগের নাম মুখস্থ করবার জন্যে?'

'শুধু রোগের নাম কেন? সৌন্দর্যের দিক থেকেও তো পরিষ্কার থাকার একটা মূল্য আছে! ঐ, ঐ দেখনা তোমার জ্যেষ্ঠ রত্নটি—এই একটু আগে কেমন ফুটফুটে দেখাচ্ছিল—ভূত সেজে এল দেখনা! শৈল, যা, ওকে বাইরেই ঝেড়ে-ঝুড়ে নিয়ে আয়; যা, যা; এক্ষুণি এসে ওর মাকে জড়িয়ে ধরবে। হুঁঃ, এদের রোগের কথা বললে কি বুঝতে পারবে? এদের বলতে হবে বিশ্রী দেখায়। ছেলেপুলে মানুষ করা সোজা নাকি যে—আচ্ছা, তুমি প্রসূতি-বিজ্ঞান পড়েছ, বউদি?'

'নামও শুনি নি।—নাও, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার শুনিয়া বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা পড়িয়া গেল, এবং হাবুলকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাপারটা চলিতে লাগিল বলিয়া তাহার দুর্ভোগটা বাড়িল বই কমিল না। তাহাদের মধ্যে

কোন্ রকম ময়লায় কী জার্ম বৃদ্ধি পায়, সেই লইয়া তর্ক হয়; ময়লার আধারটি—পুরনো ন্যাকড়া, ময়লা কাগজ, পচা কি ছাতা-ধরা কোন জিনিস হাবুলের নিকট হাজির হয়। সময় নাই অসময় নাই, প্রায়ই দুই-তিনজনে মিলিয়া একজনকে ধরিয়া হাজির করিতেছে—কাপড়ে কি শরীরে কোথাও একটু ময়লা আছে—হাবুলের কাছে বামালসুদ্ধ নালিশ। হাবুলের পড়ার ত ক্ষতি হইতেছে, তাহা ছাড়া এইসব টানা-হিঁচড়ানিতে তাহার ঘরের পরিচ্ছন্নতাও কিছু বৃদ্ধি পায় না। সে আশা করিতেছে, এদের অজ্ঞতাটা দূর হইলে এবং সৌন্দর্যের জ্ঞানটা একটু ফুটিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে; ওদিকে আক্রোশের ভাবটা বাড়িয়া যাওয়ায় ওরা সব ক্রমাগতই পরস্পরের জামাকাপড় নানা ফন্দিতে নোংরা করিয়া মকদ্দমা সাজানোয় হাত রপ্ত করিতেছে।

একমাত্র শৈল সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে না। সে দাদাকে দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, দেবতার মতোই তাহাকে সুদূরে রাখিয়া সসম্ভ্রম পরিচ্ছন্নতার সহিত পূজা করিতেছে, যত রকম ময়লায় যত রকম রোগ হইতে পারে, অবিচল নিষ্ঠার সহিত তাহাদের নাম মুখস্থ করিতেছে, এবং তাহার দেবতার প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটিগুলিকে কল্পনা এবং ভাষায় মণ্ডিত করিয়া তাহার কয়েকটি মুগ্ধ সহপাঠিনীদের মধ্যে ভাগবত রস বিতরণ করিতেছে।

এদিকে সংবাদ এই; ওদিকে কাকা এবং হাবুলের খুড়তুতো বড় ভাই ভিতরে ভিতরে চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন; অবসরমতো দুইজনের মাঝে-মাঝে এই সমস্যা লইয়া পরামর্শও হইতেছিল। অবশেষে একদিন কাকা বলিলেন, 'হাবুল, তুই দেখতে পাচ্ছি পাড়ার স্যানিটারী ইন্স্পেক্টার দাঁড়িয়ে গেছিস, এ তো কাজের কথা নয়। একটা বছর বাদে তোকে অমন শক্ত এগজামিন দিতে হবে, তুই লেখাপড়া করবি কখন? আমি বলি, তুই তেতলার কোণের ছোট ঘরটা নে। দিব্যি নিরিবিলি ঘর; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসিস, সেখানে কোনরকম বালাই জুটবে না।'

হাবুল বলিল, 'তা বেশ, কিন্তু এদের আমি অনেকটা ঠিক করেও এনেছিলাম, কাকা।'

বারান্দার ও-কোণে বড় নাতিটির আবির্ভাব। বাঁ হাতে একটা সাবান, ডান বগলে একটা ভিজা বিড়ালছানা ছটফট করিতেছে। কাকা সেই দিকে

চাহিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তা দেখছি। যাক, তুই ওপরেই গিয়ে থাক। চাকরটাকে বলে দিচ্ছি—খাট, আলমারি, টেবিল সব দিয়ে আসুক।'

৩

কাকার প্রতি একটু রাগ হইল, কিন্তু উপরে গিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটুকু কাটিয়া গেল। মাঝারি-গোছের ঘরটি, সামনে প্রশস্ত তেতলার ছাদ। সকালের ঝোঁকে হাবুল সমস্ত স্থানটি চাকর ও ভক্ত শৈলর সাহায্যে ঝকঝকে তকতকে করিয়া লইল, এবং কলেজ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিল, যেখানকার যেটি অনাহত শ্রীতে ঠিক সেইখানেই বিরাজ করিতেছে, ঘরের কোণে যত্ন করিয়া সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন আরমের আধার জড়ো করা নাই এবং বিছানার উপরও কোন শিশু হাবুলকে নিজের সৌন্দর্য এবং পরিচ্ছন্নতা দেখাইবার আগ্রহে জুতার ফিতা বাঁধিতেছে না, তখন সে সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

দুইদিন পরে আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়িল। ছেলেমেয়ে-গুলি প্রকৃতই যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। হাবুল যে উপরে আছে এবং যে-কোন মুহূর্তেই নামিয়া আসিতে পারে, এই ধারণাটিতে অনেক বেশি কাজ হইতেছে। মোট কথা, সে নাই বলিয়াই একটি অটল গাম্ভীর্যের কাল্পনিক মূর্তিতে সবার সামনে বিরাজ করিতেছে। আহারের জন্য কিংবা কলেজ হইতে আসা কি কলেজে যাওয়ার সময় যখন সবার প্রত্যক্ষ হয়, তখন সবাই সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিয়া তটস্থ হইয়া থাকে।

দেবতারা দূরে থাকিয়া বৎসরে এক আধ বার আমাদের মধ্যে আনাগোনা করেন—এই বন্দোবস্তই ভালো; আমাদেরই একজন হইয়া থাকিলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা।

বাড়ির বাহিরেও হাবুলের যশ এই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্বদা দেখা যায়না বলিয়া ছেলেমেয়েদের কল্পনায় কিছু আটকাইতেছে না। শৈলকে কোন সখী প্রশ্ন করিলে শৈল অতিমাত্র গম্ভীর হইয়া বলে, 'নিচেতেই তিনি ভারী থাকেন কিনা আজকাল!'

'তুই যাস না ওপরে?'

'রক্ষে করো ভাই, ত্রিসীমানার মধ্যে পা দেওয়ার জো আছে?'

কথাটা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। তেতলার ছাদে, সিঁড়ির ঘরের সঙ্গে লাগোয়া

আর-একটি ঘর আছে। আকারে ঠিক চতুষ্কোণ নয়, খানিকটা গিয়া একটা ফালি বাঁকিয়া গিয়াছে, ঘরটা দাঁড়িয়েছে, উলটানো ইংরেজী L-অক্ষরের মতো। পূর্বে কাঠকুটা থাকিত; সম্প্রতি শৈল এটি দখল করিয়াছে। ছাদের এ-কোণটায় তাহার এই ঘর, মাঝে পনরো-যোল হাত জায়গা, তাহার পরই হাবুলের ঘরটি।

শৈলর সহসা উপরে আসার কারণটা বুঝিয়া উঠা যায় না;—হইতে পারে সে পরিচ্ছন্নতাসূত্রে হাবুলদাদার সহিত একটা সম-আভিজাত্য অনুভব করে বলিয়া একই স্তরে থাকিতে চায়; হইতে পারে তাহার পুতুলের সংসার বাড়িয়া গিয়াছে, এবং নিচে তুইটি ভাইপো-ভাইঝি এবং ছোট বোনটির লোলুপ দৃষ্টি এড়ানো ক্রমেই সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। মোট কথা, সখীদের নিকট যাহাই বলুক, শৈল সমস্ত তুপুরটা আজকাল উপরেই—হাবুলের ত্রিসীমানার মধ্যেই কাটায়। তবে এটা হয় খুব লুকাইয়া, হাবুলকে ব্যাপারটা জানানো হয় নাই। তাহার কারণ বলিতে গেলে শৈলর খেলাঘরের সঙ্গিনী নৃত্যকালীর কথা আনিয়া ফেলিতে হয়।

প্রথমত, শৈলর সহিত নৃত্যকালীর সখিত্বটা সম্ভব হইল কি করিয়া সেই একটা সমস্যা; সেটাকে নিতান্ত একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইলেও হাবুলের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তির পরও সখিত্ব যে কি করিয়া বজায় আছে, সে তো একেবারেই তুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মেয়েটি যৎপরোনাস্তি নোংরা। সমস্ত অবয়বটি ধূলামাটিতে এতই প্রচ্ছন্ন যে, তাহার আসল রঙটি যে কী, বলা একটু কঠিন। আত্মীয়েরা কুণ্ঠিতভাবে বলে, শ্যামবর্ণ; যাহাদের নিন্দায় আনন্দ আছে, তাহারা প্রমাণ করিয়া দেয়—কালো। মাথাটা একটা আগাছার জঙ্গলের মতো, চুল খুব ঘন, কিন্তু যত্নের অভাবে বাড়ে নাই। কোঁকড়ানো-কোঁকড়ানো একরাশ স্তবক পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া পিঠের অর্ধেকটা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। খোঁপা হয় না, তবে কালেভদ্রে ঘাড়ের উপর অর্ধচন্দ্রাকারে তুইটা টানা, সুপুষ্ট বেড়াবেণী দেখা যায়। তুই এক দিন থাকে, তাহার পর কখন গ্রন্থি খুলিয়া গিয়া বিশৃঙ্খলভাবে এলাইতে এলাইতে আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে। দেখিলে মনে হয়, মাথার পিছনে কবে কি হইতেছে, মেয়েটির সে লইয়া মোটেই মাথাব্যথা নাই।

সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে, আর ফলপাকড়ের অত্যন্ত ভক্ত; এবং খেলা ও দুনিয়ার ফলপাকড় হইতে আহৃত ধুলা, কাদা, রসকস প্রভৃতি যত রকমের নোংরা সব হাতে-মুখে, কাপড়ে-চোপড়ে জমা করিয়া বেড়ায়। সৌন্দর্যচর্চার মধ্যে স্নানটা মাঝে মাঝে করে; তাহাতে ময়লাগুলি গায়ে ভালো করিয়া বসিয়া যায়।

স্বভাব-নোংরা মেয়েদের মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ করা ভালো, মা-বোনের যত্ন-আত্তি পায় তাহা হইলে—একটু নজর পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে নৃত্যকালীর সে বালাই নাই; সে অটুট স্বাস্থ্য এবং অসংস্কৃত শরীর ও বেশভূষা লইয়া দূরে দূরেই কাটাইয়া দিতেছে।

গুণের মধ্যে মেয়েটির স্বভাব বড় নরম, অন্তত তাহার চোখ দুইটি এত নরম যে, তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বেশ একটি কর্তৃত্বের ভাব উপভোগ করা যায়। খেলাঘরের জগতে এ একটা মস্তবড় লোভনীয় জিনিস। শৈল বলিল, 'তোমার ছেলে, ভাই, হাবুলদাদার মতো তিনটে পাস দিয়ে চারটে পাসের পড়া করছে বলে যে আমার ন' হাজার টাকা তোমার ছিচরণে ঢালতে হবে, সে আমি পারব না। আমার মেয়ে সুন্দর, তার একটা কদর নেই? আমি বরাভরণ-টরন নিয়ে পাঁচটি হাজারের ওপর উঠছি না; এইতেই তোমায় রাজী হতে হবে।'

অথচ এই কয়দিন আগে, এই নৃত্যকালীকেই শৈলর অপোগণ্ড ছেলেটিকে নগদ এগারো হাজার টাকা দিয়া লইতে হইয়াছে।

অন্য সঙ্গিনী হইলে বাঁকিয়া বসিত, অন্তত ঠেস দিয়া দুটা কথা বলিত তো নিশ্চয়। নৃত্যকালী সঙ্গে সঙ্গে চুলের গুচ্ছ বাঁয়ে হেলাইয়া বলিল, 'হব রাজী।'

অনুমান হয়, এই সব কারণেই, হাজারো নোংরা হইলেও নৃত্যকালী অপরিহার্য। নোড়ানুড়ি লইয়া খেলা চলে, তাহাতে পরিষ্কারও বেশ থাকা যায়; কিন্তু যতই অপরিষ্কার হউক না কেন, কাদা লইয়া খেলায় একটা বিশেষ সুখ এবং সুবিধা আছে, যেমনটি ইচ্ছা ভাঙা-গড়া চলে।

নৃত্যকালীকে কিন্তু রাখা হয় খুব সঙ্গোপনে। ঘরের সে ফালিটুকু ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, নৃত্যকালী চুপিচুপি আসিয়া সেই দিকটায় বসিয়া থাকে। হাবুল যদি সিঁড়ি দিয়া উপরে যায় কিংবা নিচে আসে, ওর অস্তিত্বের খবরই

যায় না। শৈলর কড়া হুকুম আছে ; যেন ভুলিয়াও কখন হাবুলদাদার ঘরের দিকে না যায়, কি জোরে শব্দ না করে।

বলে, 'তা যদি কর জলার পেত্নী, তো হাবুলদাদা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে আলসে ডিঙিয়ে তোমায় নিচে ফেলে দেবে, আর তোমার সঙ্গে খেলার জন্যে আমার দশা যে কি করবে, ভেবেই পাই না।'

হাবুলের অশুচিতার ভয়ে ঘর ছাড়িয়া কম যাওয়া-আসা করার জন্যই হউক, অথবা যেজন্যই হউক প্রায় মাস-খানেক বেশ কাটিল ; তাহার পর নৃত্যকালী একদিন হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেল।

যদি বলা যায় হাবুলই ধরা পড়িল, তাহা হইলেও বড় একটা ভুল হয় না। ব্যাপারটা ঘটিল এই রকম।—

বৈশাখের দুপুরবেলা। হাবুলদের কলেজ গরমের ছুটিতে বন্ধ হইয়াছে। হাবুল ঘরে বসিয়া একটা কবিতার বই পড়িতেছিল, হঠাৎ একটা ঘর-ছাড়ানো ভাবে মনটা কেমন হইয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া দুইটা নারিকেল গাছের মাথা একত্র হইয়া ঘরের আড়ালে যেখানে একটি নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে, সেইখানটা দাঁড়াইল।

স্তব্ধতাটুকু বেশ লাগিল।—ঝিরঝিরে বাতাস দিতেছে, তাহাতে বিশ্রান্ত পল্লীর এখান ওখান হইতে কতকগুলা চাপা সুর মাঝে-মাঝে কানে আসিতেছে। সামনা-সামনি খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ির খোলা জানালা দিয়া দেখা যায়, একটি মেয়ে মেঝেয় বসিয়া উবু হইয়া একান্ত মনে কি লিখিতেছে। চুলগুলা মুখের দুই পাশ ঢাকিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে। ডান দিকে একটা একতলা বাড়ির চিলেকোঠার দেওয়ালে দুইটা পায়রার খোপ আঁটা ; ভিতরের পায়রাগুলা ব্যস্ত, খোপের উপরে দুইটা পায়রা গায়ে গায়ে সাঁটিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে।

হাবুল মাঝে-মাঝে এই দম্পতিটিকে দেখিতেছিল, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে দেখিতেছিল ; লিপি-নিরতাকে লইয়া যে কি ভাঙাগড়া গড়িতেছিল, সেই জানে।

সহসা দেখিল, চিলেকোঠার পাশের ঘরটি হইতে বাহির হইয়া শৈল নিচে নামিয়া গেল।

তাহার বড় কৌতূহল হইল, শৈলী আবার ওখানে করে কি? খেলাঘরের

বাই আছে নাকি? সে যে একটা মস্ত নোংরামির ব্যাপার! কই, এতদিন তো জানিতে দেয় নাই, বা রে শৈলী!

দেখিতে হয়। হাবুল অগ্রসর হইয়া, দুইটা সিঁড়ি বাহিয়া ঘরটিতে প্রবেশ করিল; ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চক্ষুস্থির!

যতদূর নোংরা হইতে হয় একটি মেয়ে মেঝেয় পা ছড়াইয়া এবং বালি-ঝরা নোনা-ধরা দেওয়ালে নিশ্চিন্তভাবে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। পাশে একতাল কাদা; হাতের আঙুলগুলা কাদা দিয়া কি-একটা গড়িতে ব্যস্ত, তেলো দুইটা শুকনা কাদায় সাদা হইয়া গিয়াছে; বাঁ গালে কানের কাছটায় সেই রকম একটা বড় দাগ, বোধ হয় হাত দিয়া ঘাম মুছিয়া থাকিবে। আঁচল ভূমিতে বিছানো, তাহার উপর কতকগুলা রাংচিত্রের পাতা আর ছোট ছোট আগাছার ফল, তাহাদের নীল বেগুনে রসে আঁচলটায় ছোপ ধরিয়া গিয়াছে; এক পাশে তেল-লঙ্কা-মাখানো থেঁতো-করা খানিকটা কাঁচা আম।

হাবুলের ছায়ায় ঘরটা একটু অন্ধকার হইতেই মেয়েটি মুখ তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

হাবুল ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'শৈল কোথায়?'

মেয়েটি উত্তর দিতে পারিল না, শুধু জিব দিয়া শুকনা ঠোঁট দুইটি একটু ভিজাইয়া লইল এবং আঁচলটা একটু টানিয়া লইল। হাবুল প্রশ্ন করিল, 'তোমার নাম কি?'

চুপচাপ। মুখের সেই সাদা দাগটা ঘামে ভিজিয়া একটি তরল কাদার রেখা গালের মাঝামাঝি গড়াইয়া আসিল। মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, একটু একটু করিয়া রাঙিয়া উঠিতে লাগিল।

হাবুলের কৌতুক বোধ হইতেছিল; উত্তরের আশা না থাকিলেও প্রশ্ন করিল, 'তুমি এত নোংরা কেন?'

ইহাতে মেয়েটি একটু গুটিশুটি মারিয়া গেল। বোধ হয় শৈলর সতর্কতার কথা মনে পড়িল, এইবার বুঝি তাহা হইলে আলিসা ডিঙাইয়া ফেলিয়া দেয়!

হাবুল ঠায়-নতদৃষ্টি এই জড়ভরতের মতো মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। কেন, বলা শক্ত; আরও বলা শক্ত এইজন্য যে, অমন দারুণ নোংরামির মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে কোন বিকারের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। একটু পরে হঠাৎ যেন কি মনে হইল, আর দাঁড়াইল না।

দুয়ার পর্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, 'হ্যাঁ, দেখ, আমি যে এসেছিলাম, কিংবা তোমাদের খেলাঘরের কথা জানি—এ কথা শৈলকে বল না। বলবে না তো?'

মেয়েটি বলিল, 'না।'

উত্তর পাইয়া হাবুল আর একটু দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'পুতুল খেলছিলে বুঝি?'

কোন উত্তর হইল না।

'শৈলর সঙ্গে পড় বুঝি?'

উত্তর নাই। এদিকে মনের মধ্যে কিরকম একটা গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রশ্নও যোগাইতেছিল না। যাইবার জন্য ফিরিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তুমি রোজ এস, আসবে তো?'

মেয়েটি সাহস করিয়া ঘাড় পর্যন্ত নাড়িল না, বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াই হাবুল বলিল, 'আমি কিছু বলব না, আসবে তো?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। এমন সময় সিঁড়ির নিচের ধাপে পায়ের শব্দ হইল। হাবুল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

৪

তাহার পরদিন হাবুল জানালাটি অল্প খুলিয়া সিঁড়ির দিকে উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিল এবং শৈল একসময় পা টিপিয়া টিপিয়া নামিয়া গেলে নোংরা ঘরটিতে প্রবেশ করিল। দেখিল, মেয়েটি নাই। আরও দুই দিন নিরাশ হইয়া সে বুঝিল, নিজের অপরিচ্ছন্নতার অপরাধে সে ভয় পাইয়াছে। তখন হাবুলের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল এবং নিজের পরিচ্ছন্নতার অপরাধে মনটি বড়ই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই ছিল; অনেকক্ষণ পরে শৈল আসিলে ডাক দিল। শৈল ক্ষণেকের জন্য চোখের একটু আড়াল হইয়া মুঠার মধ্য হইতে কী গোটা-কতক জিনিস একপাশে ফেলিয়া দিয়া হাতটা শেমিজে মুছিয়া লইল এবং শেমিজটা কাপড়ে ভালো করিয়া ঢাকিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখটি শুকাইয়া গিয়াছে।

হাবুল হাসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'আমার ভয়ে খেলার জিনিসগুলো বুঝি ফেলে দেওয়া হ'ল? খেলা একটু চাই বইকি, তাতে

রাগ করব কেন? শুধু অপরিষ্কার না হ'লেই হ'ল—বেশিরকম অপরিষ্কার। মাটির পুতুল গড়তে জানিস?'

শৈল মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

'জানতে হয়; সে একটা শিল্প যে—চারুশিল্প। তোদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ জানে না?'

শৈল একটু ভাবিল। যেন সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, 'নেত্য বেশ জানে অনেক রকম।'

'তার কাছে শিখে নিলেই পার। নেত্য আবার কে? নৃত্যধন?'

'না, নেত্যকালী, আমার সই—গঙ্গাজল। বড্ড নোংরা যে, মিশতে ঘেন্না করে।'

হাবুল একটু হাসিয়া, কৃত্রিম রোষের সহিত চোখ দুইটা বোনের মুখের উপর ফেলিয়া বলিল, 'এই বুঝি শিক্ষা হচ্ছে তোমার? কাউকে ঘেন্না করতে আছে, তাও আবার নিজের সইকে? বরং তাকে পরিষ্কার হতে শেখাও না—সর্বদা কাছে কাছে রেখে।'

শৈল একটু মাথা নিচু করিয়া রহিল, তাহার পর বাহির হইয়া গেল। হাবুল আবার তাহাকে ফিরাইয়া বলিল, 'তা ব'লে যেন আমার ঘরের দিকে কাউকে এনো না, খবরদার। নোংরা হ'লে আমার কাছে গঙ্গাজলেরও খাতির নেই, ব'লে দিলাম।'

পরের দিন জানালার অল্প ফাঁক দিয়া তাহার প্রায় ঘণ্টাখানেক একভাবে চাহিয়া থাকিবার পর শৈল কাহাকে থামিবার জন্য ইশারা করিল এবং পা টিপিয়া টিপিয়া হাবুলের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দেখিল, হাবুল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার পর আবার তেমনই ভাবে ফিরিয়া গিয়া নৃত্যকালীকে সিঁড়ি হইতে ইশারায়ই ডাকিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল। হাবুলের ঘুম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙিয়া গেল। উঠিয়া, আবার ঘণ্টা-খানেকের একটি দীর্ঘ যুগ জানালার ফাঁকে চাহিয়া থাকিবার পর হাবুল দেখিল, শৈল কি জন্য নিচে নামিয়া গেল। তখন হাবুল শৈলর চেয়েও নিঃশব্দ পদক্ষেপে খেলাঘরটিতে প্রবেশ করিল; এদিকে কান দুইটিকে যথাসম্ভব সিঁড়ির নিম্নতম ধাপের কাছে রাখিল মোতায়েন করিয়া।

নৃত্যকালী মাটির তাল হইতে খানিকটা কাটিয়া লইতেছিল, মুখ তুলিয়া

চাহিল। কেন, তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানেন, আজ তাহার চোখে ভয়ের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না, শুধু একটা অবোধ কৌতূহলের ভাব। শাড়িটা আজ একটু যেন ফরসা, তাহাতে ধূলা-কাদার ছোপ আরও স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া আছে। কাঁধে অসংলগ্ন বেড়াবেণীটা আছে লতাইয়া।

হাবুল বলিল, 'শৈলকে খুঁজতে এসেছিলাম ; কোথায় গেছে বলতে পার ?'

'নিচে গেছে।'

উত্তরটা বোকার মতো হইল। উপরে যখন নাই, তখন নিচে তো গেছেই। কিন্তু তাহাতে আবার প্রশ্ন করার সুযোগ থাকায় হাবুল খুশিই হইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করতে গেছে বলতে পার ?'

'পারি।'

নিজের অদৃষ্টে প্রসন্ন হইয়া হাবুল প্রশ্ন করিল, 'কি করতে ?'

'আরও কাদা মেখে নিয়ে আসতে, আর খ্যাংরাকাঠি।'

হাবুলের মনে হইল, স্বরটি বড় মিষ্টি। 'কাদা', 'খ্যাংরাকাঠি'—এই রকম নোংরা কথাগুলোও এত মিষ্টি লাগিল! বলিল, 'কাদা সেই তোমাদের বাড়ি থেকে তো ? এ বাড়িতে তো নেই।'

'হ্যাঁ।' 'হ্যাঁ।'

হাবুল খেবড়ি খাইয়া সামনেটিতে বসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, স্থানটুকু বেশ পরিষ্কার ছিল না। বলিল, 'তুমি বেশ পুতুল গড়তে পার, না?'

নৃত্যকালী মাথাটা একটু নিচু করিয়া ঠোঁটের এক কোণে লজ্জিতভাবে একটু হাসিল।

হাবুল বলিল, 'আমায় একটি গ'ড়ে দিতে হবে।'

অবশ্য শুধু বলিবার সুখটুর জন্যেই বলিল, কেননা ভগ্নীকে মৃৎশিল্পে উৎসাহিত করিলেও, পুতুলের যা সব নমুনা সামনে পড়িয়াছিল, সেগুলিকে চারুশিল্পের উৎকর্ষ বলিয়া মনে করে, এতটা দুর্দশা তাহার তখনও হয় নাই।

মেয়েটি মুখের উপর বাঁ হাত চাপিয়া আর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভালো-ভাবেই হাসিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া লইল, দেখা গেল, ডান গালের নিচে আঙুলের ডগার কাদায় তিনটি দাগ লাগিয়া গিয়াছে। হাবুল বলিল, 'ও কি হ'ল ? ইয়েতে যে দাগ লেগে গেল!'

নৃত্যকালী বুঝিতে না পারিয়া মুখের দিকে চাহিতেই বলিল, 'ইয়েতে—

মানে—ইয়ে—তোমার গালে আর কি।…না, হয় নি, আর একটু মোছ, আর একটু—ঐ পাশটায় এখনও রয়েছে, সমস্তটা টেনে মুছে দাও দিকিন, আঃ, রয়েছে যে এখনও একটু—'

মোটেই আর কিছু ছিল না এবং অবর্তমান কাদা মুছিতে সুকুমার গালটির যে অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে হাবুল ভিন্ন আর যে-কেহই দয়া অনুভব করিত। হাবুল বলিল, 'আমি না-হয় দোব ঠিক ক'রে ?'

কোঁচার খুঁট তুলিয়াছিল, বোধ হয় দিতও ; কিন্তু নিচে যেন শৈলর স্বর শোনা গেল। হাবুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, 'সেদিন যে এসেছিলাম, বলনি তো শৈলকে ?'

নৃত্যকালী মাথা নাড়িল—না, বলে নাই।

দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া হাবুল বলিল, 'আর হ্যাঁ, আর আজ ওকে যে খুঁজতে এসেছিলাম, সে কথাও ব'লে কাজ নেই, ভাববে—একটু খেলছি তাতেও হাবুলদাদার এসে বাগড়া দেওয়া—'

৫

মাঝের চার পাঁচ দিনের এদিককার ইতিহাস আর দিলাম না; আশা করি, আন্দাজ করিয়া লইতে কাহারও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

অপর দিকে খবর এই যে, হাবুল আবার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যেন আরও সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে। বউদিদিকে বলিল, 'তোমরা গুরুজন, বলা ঠিক হয় না; কিন্তু তোমরা যদি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক, ছেলেমেয়েরা একটা আদর্শ পায়। এই ধর তুমি যদি সর্বদা একটা স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে থাক—'

বউদিদি বলিল, 'রক্ষে কর, ভাই। বরং তুমিই একটি আদর্শ বিয়ে ক'রে নিয়ে এসে আলমারিতে সাজিয়ে রাখ না কেন ?'

নিজের কথাটা ঠাট্টায় উড়াইয়া দিলেও দেবরের খুঁতখুঁতানির চোটে বউদিদিকে আবার কচিগুলার দিকে কড়া নজর দিতে হইল। তাহাদের সন্ত্রাসটা ছিলই, আবার একচোট উগ্রতরভাবে জাগিয়া উঠিল। শৈল নৃত্যকালীকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিল, 'তোকে ব'লে ব'লে হার মানছি পোড়ারমুখী, কিন্তু যদি একদিন ঘুণাক্ষরেও হাবুলদাদার নজরে প'ড়ে যাস তো তোর যে কি দুর্গ্যতি ক'রে ছাড়বে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমি তো

তোকে এনে ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে থাকি।··· মুয়ে আগুন, আবার ঠোঁট চেপে হাসি। কোত্থেকে যে হাসি আসে পোড়ারমুখে—তা তো বুঝি না—'

সেদিন নৃত্যকালী আগে হইতে আসিয়া বসিয়া আছে, ঘরে ঢুকিয়াই চাপা গলায় প্রশ্ন করে, 'হাবুলদাদার ঘরের ওদিকে যাসনি তো?'

নৃত্যকালী বলে, 'নাঃ।'

শৈল বলে, 'খবরদার! আর দরকারই বা কি আমাদের ওদিকে যাবার, ভাই? তুমি বাপু, খুব পরিষ্কার আছ তো আছ; আমরা দুটিতে না হয় নোংরাই; থাক এক কোণে তোমার ঘেন্না নিয়ে। কি বল ভাই গঙ্গাজল?'

এইভাবে নিশ্চিতকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য যেমন একদিকে শাসায়, অপর দিকে তেমনই আবার নৃত্যকালীর আত্মসম্মান জাগ্রত করিবারও চেষ্টা করে।

নৃত্যকালী বলে, 'হুঁ'।

মেয়েটি আজকাল বেশ প্রতারণা শিখিয়াছে। কালই প্রায় ঘণ্টাখানেক হাবুলের ঘরে গিয়া গল্পসল্প করিয়াছিল। শৈল বাহিরে কোথায় গিয়াছিল বলিয়া হাবুল ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

এর পরে আরও দুইদিন কাটিল। হাবুল অত্যন্ত কবিতা পড়িতেছে এবং বাকিটা সময় নিচে আসিয়া চারিদিকে অপরিচ্ছন্নতা আবিষ্কার করিয়া জর্জরিত হইয়া উঠিতেছে। বলিতেছে, 'তোমরা সব শেষ পর্যন্ত আমায় বাড়িছাড়া না ক'রে ছাড়বেনা দেখছি, আমার অদৃষ্টে লেখাই আছে হস্টেল—'

দুপুরবেলা। আজ শৈলদের স্কুলে প্রাইজ-বিতরণ। সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইতেছে, দুয়ারের সামনেই নৃত্যকালীর দেখা।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, 'যাবি না ইস্কুলে প্রাইজ দেখতে?'

নৃত্যকালী নাসিকাটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'ভাল লাগে না।'

শৈল বলিল, 'মুয়ে আগুন। কী ভালো লাগে তবে শুনি?'

নৃত্যকালী তাহাকে কাটাইয়া গেলে, হঠাৎ ঘুরিয়া বলিল, 'ওমা! তুই যে আজ এসেন্স মেখেছিস লা! পেত্নীর ভাবন দেখে বাঁচি না!'

'কই? ধ্যাৎ!'—বলিয়া নৃত্যকালী ভিতরে চলিয়া গেল।

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া হাবুলের কাকীমা শুইয়া ছিলেন, ভাড়াটেদের

নূতন বউটি পাকা চুল তুলিতেছিল, পুত্রবধূ উপুড় হইয়া শুইয়া একটা নাটক পড়িয়া শুনাইতেছিল। নৃত্যকালীকে দেখিয়া বলিল, 'নেত্য, একটু জল গড়িয়ে দিয়ে যা তো, দিদি, আর পারিনা উঠতে।'

নৃত্য জল দিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। ভাড়াটেদের বউটি বলিল, 'মেয়েটি নোংরা তাই, নইলে—'

কাকীমা বলিলেন, 'হ্যাঁ, বেশ ছিরি আছে। আর নোংরাই কি থাকবে চিরদিনটা গা? বয়েস হয়ে আসছে। যা শুচিবেয়ে আমাদের হাবুলটা, নইলে ইচ্ছে ছিল—'

পুত্রবধূ কিছু বলিল না; ঠোঁটের কোণে একটি অতি-সূক্ষ্ম হাসি চাপিয়া অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া ছিল; বইয়ে চোখ ফিরাইয়া বলিল, 'হুঁ, শোন—'

হাবুল নিরাশ হইয়া খেলাঘর হইতে বাহির হইতেছিল; দেখিল, সিঁড়ির দরজায় নৃত্যকালী দাঁড়াইয়া; প্রশ্ন কবিল, 'খেলবে না?'

নৃত্যকালী প্রশ্ন করিল, 'সই আছে?'

হাবুলও যেন শৈলর স্কুলে যাওয়ার কথাটা মোটেই জানে না, এইভাবে উত্তর করিল, 'আছে বোধ হয় নিচে, আসবে'খন; তুমি ততক্ষণ চলনা ও ঘরে। বাপরে, কী গরম এ ঘরটায়!'

ঘরে গিয়া হাবুল টেবিলের সামনে চেয়ারটিতে বসিল; নৃত্যকালী একটু দূরে, পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বুঝি ইস্কুলে যেতে ভালো লাগেনা নৃত্য?'

নৃত্য হাসিল মাত্র।

'কী ভালো লাগে?'

কথাটা বড় ব্যাপক, বোধ হয় মিলাইয়া দেখিয়া উত্তর হাতড়াইতেছিল; হাবুল প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'আমার কাছে আসতে?'

নৃত্য একবার চোখ তুলিয়া লজ্জিতভাবে ঘাড় নাড়িল, 'হ্যাঁ'।

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন? বলতে পার?'

'সইয়ের দাদা ব'লে।'

হাবুল বলিল, 'আমারও তোমার কাছে থাকতে ভালো লাগে, নৃত্য।'

একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল, 'কেন, তা জিজ্ঞেস করলে না?'

নৃত্যকালী চোখ তুলিয়া চাহিতে বলিল, 'বোনের সই ব'লে।'

কথাটার মধ্যে কোথায় কী ছিল, নৃত্য খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে মুখটা ঢাকিতে গিয়া আঁচলটা নিচে পড়িয়া গেল। তখন হাবুল, যে হাবুল একদিন প্রণাম করিতে গিয়া সামান্য একটু ময়লার জন্য কাকীমাকে সরাইয়া লইয়াছিল, সেই শুচিবিলাসী হাবুল, পরম আগ্রহ-সহকারে ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলটি উঠাইয়া লইল এবং তাহাতে শুচিতার নিতান্ত অভাব থাকিলেও প্রায় বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'বাঃ, চমৎকার পাড়টি তো!'

মেয়েটি আজ বেশি হাসিতেছে; আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, 'ভালো কোথায়? কালো নাকি ভালো হয়?'

একরঙা, কোনরকম-নক্সা-বিহীন কালো পাড়। একে কালোই, ময়লা কাপড়ে আবার সত্যই তেমন ভালো দেখাইতেছিল না। হাবুল একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'ভালো মানে—ভাল, অর্থাৎ—তোমার গায়ে বেশ ভালো দেখাচ্ছে।'

সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় অঞ্চলটা মুঠায় ভরিয়া লইয়া নিজের নাকে চাপিয়া ধরিল, বোধ করি অধরেও একটু চাপিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, 'এসেন্স লাগিয়েছ বুঝি, নৃত্য? আমার বড্ড ভালো লাগে, বুঝেছ?'

নৃত্যকালী মুখ নিচু করিয়া একটু হাসিল, এবং একটু বোধ হয় বেশি করিয়া বুঝিয়াই বলিল, 'এবার থেকে ফরসা কাপড়ও প'রে আসব, আজ দিদি—'

হাবুল হঠাৎ এতটা সচকিত হইয়া গেল যে, তাহার হাত হইতে আঁচলটা আবার মাটিতে পড়িয়া গেল। চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, 'না না, অমন কাজ ক'রো না। সবাই জানে, আমি নোংরা দু-চক্ষে দেখতে পারি না, নিশ্চিন্দি আছি, পরিষ্কার হ'তে গেলেই সর্বনাশ! —ভাববে, মেয়েটা হঠাৎ কেন—তুমি বরং কাপড়টা কেচে এসেন্সের গন্ধটাও ধুয়ে ফেলে দিও।'

ছেলেমানুষ, অবুঝ—তাহাকে এমনই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বোধ হয় সেইজন্যই টেবিলের উপর হইতে নৃত্যর হাতটা—আলতা আর পুঁইফলের নীল-ছোপ-ধরা হাতটা—তুলিয়া লইয়া নিজের গালে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'এই আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছ? ফেলবে ধুয়ে? আর, কখনও পরিষ্কারও হতে যাবে না? হ'লে, ভয়ঙ্কর রাগ করব কিন্তু আমি—!'

ছোট্ট ঘরটির সামনে গলির ধারেই একফালি রক, প্রায় বুক পর্যন্ত উঁচু। সাং লিন্‌ রকের কিনারায় বোঁচকাটা ঠেকাইয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিল। বোঁচকাতে সিল্ক, সূতী আর পপলিনের কাপড়, প্রায় মণ দেড়েক ভারী; বুকের সামনে একটা গেরো দিয়া পিঠের সঙ্গে বাঁধা। আস্তে আস্তে গেরোটা খুলিয়া পিঠের একটু ঠেলা দিতেই বোঁচকাটা আলাদা হইয়া পড়িল। সাং লিন্‌ পিঠটাতে একটা চাড়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, ঘাড়টা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বেশ বড় গোছের একটি আড়ামোড়া ভাঙিল, ক্লান্ত শিরদাঁড়া আর ঘাড়-পিঠের গ্রন্থিগুলো মট-মট করিয়া সাড়া দিয়া উঠিল।

রকে ঠেস দিয়া একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মনটা একেবারে অবসাদগ্রস্ত, শরীরও আর বয় না: সকাল আটটার সময় বাহির হইয়াছিল, পিঠে এই দেড়মণী বোঝা, ফিরিয়াছে এখন প্রায় ছ'টা, কোমরটাতে যেন সাড় নাই আর। এ করিয়া আর চলে না। তাও বিক্রয়ও যদি হইত কিছু কিছু।... হাতটা আপনিই যেন পকেটের মধ্যে ঢুকিতেছিল, বোধ হয় বিক্রয়ের হিসাব লইবার জন্য। সাং লিন্‌ নিরুৎসাহভাবে সেটাকে টানিয়া লইল। শুধু লাভের হিসাবই নয়, টাকাকড়ির ওপরও যেন কেমন একটা বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেছে, এত পা টিপিয়া-টিপিয়া যে-টাকা আসে, পাঁচবার ভাবিয়া, সাতবার দাঁড়াইয়া, সে-টাকার উপর আর শ্রদ্ধা থাকে না। আর টাকা আসিয়াই বা কি হইবে? সাং লিন্‌ রকের উপর তালা-লাগানো নিচু ঘরটার দিকে একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, মুখটা একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—শুধু টাকা কেন—ঘর থাকিয়াই বা হইবে কি? চুলোয় যাক্‌ সব।

মনের অবস্থাটা অনেকদিন থেকেই ভালো নয়, তবে আজ যে আরও বাড়াবাড়ি তাহার একটু কারণ ঘটিয়াছে। গলিতে ঢুকিতেই হতভাগা টুং চিনের বাঁদুরেপানা মুখখানা নজরে পড়িয়া গেল, শ্রীমতী সু-লানের সামনে, হাত দুয়েকের মধ্যে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া ড্রাগনের মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে সমানে বকিয়া যাইতেছে। সাং লিন্‌ বুঝিতে

পারিতেছে না রাগটা কাহার উপর বেশি, মাগীটার উপর, কি, ঐ প্যাঁচাটার ওপর; তবে মনে হইতেছে, সমস্ত গায়ে যেন রাঙা লঙ্কার ঝাল ছড়াইয়া পড়িয়াছে।...ভগবান বুদ্ধ তাহাকে এই হিংসা থেকে মুক্তি দিন।

২

ব্যাপারটা তাহা হইলে আরও একটু গোড়া থেকে জানা দরকার। সাং লিন্ কলিকাতার লোক নয়, অর্থাৎ এদের মতো জাতিভ্রষ্ট হিন্দুস্থানী চীনা নয়। তাহার বাড়ি সিকিয়াং নদীর উপর খাস ক্যাণ্টনে। নিজের নৌকাঘরে একটা হোটেলের মতো খুলিয়া বেশ নিরুপদ্রবে দিন গুজরান করিতেছিল, এমন সময় বুড়ো চাং চানের মাথায় কি দুর্বুদ্ধি ঢুকিল,—সেও একেবারেই পাশে তাহার নৌকাঘরেও একটা হোটেল খুলিয়া বসিল—সে, তাহার মেয়ে আর তাহার জামাই কোংহ্‌লা,—ভগবান বুদ্ধ কেন যে এইরকম হিংসাবৃত্তি দেন মানুষের মনে।...রাত দুটোয় চাং চানের নৌকা হঠাৎ ফাঁসিয়া গেলে, সাং লিন্‌ই ওদের তিনজনকে অত করিয়া বাঁচাইল, কিন্তু অপবাদটা গিয়া তাহারই উপর পড়িল। ক্যাণ্টনের মায়া কাটাইতে হইল... তাহার পর সাংহাইয়ে দন্ত-চিকিৎসক, প্রথম কেস্‌ই এক বুড়ো,—বুড়োদের সঙ্গে সাং লিনের যেন কোন্ পূর্বজন্মের কী একটা শত্রুতা আছে, যেখানেই যাক্ ঠিক পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে। একটি তো দাঁত, বেচারি সাং লিন্‌কে সাংহাই-ছাড়া করিবার জন্যই যেন এতদিন বুড়োর মাড়ি কামড়াইয়া বসিয়াছিল ...কী রক্ত!—সেই একটা চিমড়ে বুড়োর শরীরে এত রক্ত থাকিতে পারে সাং লিনের কল্পনাতেও আসে না, জানে না আজ পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছে কি না। দাঁত উপড়াইবার অভ্যাস ছাড়াইয়া দিয়াছে সাং লিনের।

পাশের ঘর হইতে রক্ত বন্ধ করার ওষুধ আনিবার নাম করিয়া সাং লিন্ প্রথম জাহাজেই সাংহাই হইতে রেঙ্গুনে আসিয়া পড়ে। বেশ ঘটা করিয়া নাপিতের দোকানটি গুছাইয়া বসিয়াছে, এমন সময় আবার এক বুড়ো, যেন ওত পাতিয়া বসিয়াছিল। এবার কাঁচির ভুলে কানের অর্ধেকটা সাবাড় করিয়া ফেলে সাং লিন্ বেচারি। আর একটা অবিচার—ভগবান বুদ্ধ কেন এদিকটায় তাঁর ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টি দেন না—পৃথিবীর যত লোক বুড়োদেরই পক্ষ লইবে, একবার এটা ভাবিয়া দেখিল না; আধখানা কান কী এমন

মহামূল্য জিনিস যে সাং লিনের তাহার উপর লোভ জন্মিবে।…সেখানে কোন রকমে তাহার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইয়া সাং লিন্ এই কলিকাতায় আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এই ঠিক চার মাসের কথা।

ভগবান বুদ্ধের দেশ, এর কথাই আলাদা; এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার ধারা গেল বদলাইয়া। এখানেও অবশ্য বৃদ্ধ, কিন্তু ফা লুন লানের মতো বৃদ্ধে যদি সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া যায়, সাং লিনের অনুযোগ করিবার কিছু নাই। কি যে চমৎকার লোক! অসহায় যুবককে নিজের গৃহে স্থান তো দিলই, তাহার উপর কী সে সহৃদয় ব্যবহার! কোন একটা কাজ করিতে দিবে না, শুধু খাও-দাও আর দেশের গল্প করো। কিন্তু সাং লিনের জীবনের অভিজ্ঞতা—বৃদ্ধ লোক ভালোই হোক বা মন্দই হোক, পরিণামে একই দাঁড়ায়। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, ফা লুন লান, সাং লিনের সুখের পথে মস্তবড় এক অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সাক্ষাৎভাবে কিছু করিয়া নয়, নিতান্ত শুধু বাঁচিয়া থাকিয়া। ফা লুন লানের স্ত্রী শ্রীমতী সু-লান যুবতী, তাহার উপর অপূর্ব সুন্দরী, যেমন মুখ নাক কপাল ভুরু, তেমনই চোখ,—হাসিলে মনে হয় সে-দুটি মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র রেখায় পরিণত হইয়াছে; পায়ের পাতা তো নাই বলিলেই চলে।

কাজেই ফা লুন লানের সঙ্গে গল্প করার চেয়ে শ্রীমতী সু-লানের সঙ্গে গল্প করিতে লাগে বেশি ভালো, অথচ বৃদ্ধ ফা লুন এই সহজ কথাটা বোঝে বড় কম। যখন শ্রীমতী সু'র সঙ্গে গল্প করার সুযোগ হয় না, তাহার কথা চিন্তা করা, বিশেষ করিয়া বৃদ্ধ ভগবান বুদ্ধের কৃপায় নির্বাণলাভ করিলে শ্রীমতীই যে তাহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী হইবে, এই কথাটা লইয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করাতেও পাওয়া যায় অনেকখানি আনন্দ। বৃদ্ধ দুই দিক দিয়াই অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এক গল্প করিবার জন্য ক্রমাগতই নিজের কাছে টানিয়া লইয়া, আর দ্বিতীয়ত নির্বাণলাভের কোনরকম চেষ্টা, উৎসুক্য বা সম্ভাবনা না দেখাইয়া।

তবে দেশটা নাকি নিতান্ত ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি, বেশি দিন শত্রুতা চলিল না ফা লুনের। একদিন নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই তাহাকে পথ পরিষ্কার করিয়া দাঁড়াইতে হইল; যে নির্বাণকে সে কখনও চায় নাই,

সন্ধ্যার অন্ধকার যেমন অস্তমান সূর্যকে চায়, সেইভাবে সেই নির্বাণ তাহাকে চাহিয়া বসিল। ঠিক দুই মাস আগের কথা, ভগবান বুদ্ধের ধ্যানস্তিমিত নয়নের মতো একটি প্রভাতে বৃদ্ধ ফা লুন ইহজগত হইতে বিদায় লইল।

মানুষের কিন্তু নিজের পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করা ভিন্ন উপায় নাই। বৃদ্ধ ফা লুন পথটা পরিষ্কার করিয়া দাঁড়াইল বটে, তবে সাং লিনের জন্য নয়, কোথা থেকে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল ঐ হতভাগা টুং চিন—প্যাঁচামুখো, শুয়োর-মুখো—আরও যত রকমের যত কিছু খারাপ আছে তাই একসঙ্গে।

ভগবান বুদ্ধ যাহাকে সুন্দর করেন তাহার পছন্দকে কেন অমন করিয়া কুৎসিত করিয়া দেন কে বলিবে? সাং লিন্‌কে ছাড়িয়া শ্রীমতী সু'র নজর গিঁয়া পড়িল কিনা ঐ হতভাগা পুরুতটার উপর—রোগা, বাঁকা বেড়ালমুখো, আর যে কী নয় সাং লিন্ ভাবিয়া পায় না।

সাং লিন্ বৃদ্ধের মৃত্যুর পরও অনেক দিন ঐখানে থাকিয়াই শ্রীমতী সু-লানের মন নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কেননা মহাবীর টা ফো বলিয়া গিয়াছেন, শত্রুর কাছে কাছে থাকিয়াই তাহার ছিদ্রের সন্ধান লইতে থাকিবে এবং তাহার সব ছিদ্র জানিয়া লইয়া তাহার ধ্বংস সাধনের উপায় দেখিবে। কিছুদিন থাকিবার পর বুঝিল হতভাগা টুং চিনেরও মহাবীর টা ফো'র উপদেশটা ভালোরকম জানা আছে—মনে হইল সাং লিনের চেয়েও ভালোরকম, কেননা যতই দিন যাইতে লাগিল, কোন অজ্ঞাত উপায়ে সে উল্টা সাং লিনের-ই সব ছিদ্র জানিয়া লইয়া শ্রীমতী সু-লানের মনটা তাহার প্রতি ক্রমশ বিরূপ করিয়া তুলিতে লাগিল।

তখন সাং লিনের মহামতি শাং টু'র বাণী মনে পড়িয়া গেল—শত্রুর শিবির ত্যাগ করিয়া নিভৃতে তাহার ধ্বংসের উপায় চিন্তা করিতে থাকো। তাঁহারই উপদেশমতো আজ সাতদিন হইল এই নূতন ঘরটি লইয়া স্বাধীনভাবে এই ব্যবসায়টি অবলম্বন করিয়াছে।

কিন্তু বেশ সুবিধা হইতেছে না। ব্যবসায়টি হোটেল করা, কিংবা দন্ত-চিকিৎসা, কিংবা চুল-ছাঁটা দাড়ি-কামানোর মতো সহজ এবং নিরিবিলি নয়; একগাদা কাপড়ের গাঁটরি পিঠে বাঁধিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আর শত্রুকে ধরাশায়ী করিবার উপায় চিন্তা করার মতো মনের অবস্থা থাকে না। বাসায় ফিরিয়া তবু সাং লিন্ চেষ্টা করে, কিন্তু আজ যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। একে

আজ মেহনতটাও হইয়াছে বেশি, তায় গলিতে ঢুকিতেই নজর পড়িয়া গেল শ্রীমতী সু'-র দোকানের খোলা বারান্দাটার উপর একটা বেতের টেবিলের দুইদিকে দুইজনে বসিয়া—শ্রীমতী সু আর শুয়োর-মুখো পুরুত টুং চিনটা; টেবিলটা প্লেটে প্লেটে ভরতি—নিশ্চয় সব রকম খাদ্যসম্ভারে বোঝাই—কোলা-ব্যাঙ, টক আর ঝালে জারানো সিঙ্গাপুরী আরসোলা, পেনাঙের শুঁটকি মাছ; সাং লিন্‌ও তো এতদিন ঐ বাড়িতেই ছিল, জানে শ্রীমতী সু-লান'রা কিরকম শৌখিন খাইয়ে। এইরকম চব্য-চোষ্যের সামনে বসিয়া যেরকম অন্তরঙ্গ হাস্যালাপ জমিয়া উঠিয়াছে দেখিল—তাহাতে সাং লিনের আর সন্দেহ নাই যে, ব্যাপার ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। মারের সন্তান হতভাগা পুরুতটা শ্রীমতী সু'কে বুঝি-বা দু-একদিনের মধ্যেই বিবাহ করিয়া তাহার অতুল সৌন্দর্যের সঙ্গে অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হইয়া বসিবে।

৩

গলির মুখে ফুচাওকে দেখা গেল, এইদিকেই আসিতেছে। ফুচাও লোকটি ভালো, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটেরই একটি গলিতে দন্ত-চিকিৎসকের কাজ করে, বৃদ্ধ ফা লুন লানের গৃহে প্রায়ই আসিত, সেইখানেই সাং লিনের সহিত আলাপ-পরিচয় হয়। কাপড়ের গাঁটরিটা পিছনে একটু ঠেলিয়া মুখে একটি বেশ সহজ ভাব আনিয়া সাং লিন্ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ফুচাও আসিয়া সাড়ম্বর অভিবাদন করিয়া প্রশ্ন করিল, 'ব্যবসায়ীদের শিরোমণি, সমস্ত গুণের অধিকারী, সৌন্দর্যে অতুলনীয়, সাং লিন্, সর্ববিধ কুশলে আছেন তো?'

সাং লিন্ প্রত্যভিবাদন করিয়া উত্তর করিল, 'এই কুৎসিত হতভাগাটা ব্যবসার নামে দোরে দোরে ভিক্ষা করে কোনরকমে আছে বেঁচে; মহাপ্রাণ ফুচাও আগেরই মতন পৃথিবীর গৌরব বর্ধন করে চলেছেন তো? পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী, সর্বগুণের অধিকারিণী—শ্রীমতী চাও তাঁহার দেব-শিশুগুলিকে নিয়ে নিরাময় আছেন তো?'

ফুচাও বিনয় সহকারে বলিল, 'সে বাঁদরীটা তার ছানাগুলোকে নিয়ে কোনরকমে আছে বেঁচে; নরাধম ফুচাও এখনও পৃথিবীর ভার লাঘব করে যেতে পারেনি। আপাতত তার পরম সৌভাগ্য যে, সে অল্প আয়াসেই

মহামতি সাং লিনের দেখা পেয়ে গেল। একটু বিপন্ন, তার ওপর একটা গোপনীয় কাজের ভার পড়েছে, যা এতই গোপনীয় যে, সারা পৃথিবীতে এক অসীম বিশ্বাসযোগ্য সাং লিন্ ছাড়া আর কাউকেই বলা যায় না। অনন্ত করুণার অধিকারী সাং লিন্ কি সেটা তাঁকে জানাবার আদেশ দেবেন?'

'নির্ভরের নিতান্তই অযোগ্য, ঘোর মিথ্যাচারী সাং লিন্‌কে বলতে যদি মহামহিম ফু চাওয়ের আপত্তি না থাকে তো তার দূষিত কর্ণে তিনি অমৃত বর্ষণ করতে পারেন।'

'সর্ববিজ্ঞানের অধিকারী সাং লিনের নিশ্চয় জানা আছে যে, এই কলকাতাতেই নিতান্ত একটা নগণ্য গলির একপ্রান্তে হতভাগ্য ফু চাওয়ের একটা অতি নগণ্য দন্ত-চিকিৎসার দোকান আছে। এই সঙ্গে এটাও সর্বজ্ঞ সাং লিনের নিশ্চয় অবিদিত নয় যে নির্বাণপ্রাপ্ত মহাত্মা ফা লুন লানের পত্নী, সাধ্বী-শিরোমণি শ্রীমতী সু-লান আজ থেকে ছয় দিন পরে যে-দিনটি, সেটিকে ভাগ্যবানদের শীর্ষস্থানীয় টুং চিনের সঙ্গে বিবাহ ক'রে পবিত্র করবেন। তার আগে কিন্তু তিনি এক কাজ করতে চান এবং নিতান্ত অযোগ্য এই ফু চাওয়ের ওপর সেই কাজের ভার পড়েছে; এই পবিত্র দিনটিকে সোনার হাসি দিয়ে মণ্ডিত করবার জন্যে তিনি সামনের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলতে চান। এই পরম সৌভাগ্য থেকে কিন্তু হতভাগ্য ফুচাওকে বঞ্চিত হ'তে হ'ল, কেননা সে আজ এই একটু আগে খবর পেলে, তার একমাত্র কন্যা আকিয়াবে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। খবর নিয়ে জানলে আকিয়াব-রেঙ্গুনের জাহাজ আজ মাঝরাতেই কলকাতা ছাড়বে। এই বিপদে তাকে দন্ত-চিকিৎসকদের অগ্রগণ্য সাং লিনের দ্বারস্থ হ'তে হয়েছে। এইমাত্র সে জাহাজে সবার জায়গা ঠিক ক'রে এল।'

সাং লিন্ একটু নীরব রহিল, রেঙ্গুনের বুড়ার কথা মনে পড়িল, সেই সঙ্গে কিন্তু মহামতি সাং টু'র কথাও গেল মনে পড়িয়া—সৌভাগ্য আসেন দেবীর মূর্তিতে তাঁকে মার-এর মতো প্রত্যাখ্যান করিও না।

সাং লিন্ প্রশ্ন করিল, 'কিন্তু শ্রীমতী সু কি আমাকে বিশ্বাস করবেন?'

ফু চাও উত্তর করিল, 'শ্রীমতী সু-লানই খবরটা শুনে নিষ্কর্মা অপদার্থ চফুাওকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠিয়েছেন। ব্যাপারটা অতিশয় গোপনীয়, কেননা সামনে যেখানে সোনার দাঁত দুটি বসাতে চান, সেখানকার আসল দাঁত-দুটি অকৃতজ্ঞ

পুরনো ভৃত্যের মতো কাজে জবাব দেবে বলেছে। এই রহস্যটি ব্যক্ত হ'লে মহামতি টুং চিন মনে করতে পারেন যে, শ্রীমতী সু-লান বার্ধক্যের দ্বারে উপনীতা, তাই এমন কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে চান যে নিজের প্রাণের মতো এই রহস্যটিকে ধরে থাকবে। টুং চিন কেবল পুরোহিত নয়, তিনি একজন মহাকবিও। কাব্যের দ্বারাই তিনি শ্রীমতীর চিত্ত জয় করেছেন। তার মধ্যে তাঁর দাঁতের ওপর কবিতাই বেশি ;—আরও লিখছেন। এখন এই রহস্যটা প্রচার হয়ে গেলে শ্রীমতীকে বিগলিত-দন্তা বলে বোধ হয় ঘৃণা করতেই আরম্ভ করবেন—শ্রীমতীর এই ভয়।'

ফু চাও একটু চুপ করিয়া আবার নিজেই বলিল,'বুদ্ধিতে স্বয়ং কনফুসিয়াসের সমতুল সাং লিন্ জিগ্যেস করতে পারেন, তিনি যে বিশ্বাস রাখবেনই, এই ধারণাটা শ্রীমতী সু-লানের কোথা থেকে এল। কিন্তু এই এইখানে শ্রীমতীর দূরদৃষ্টি আর উদারতা দেখলে ত্রিকালদর্শী মহাত্মাদেরও বিস্ময়ের সীমা থাকে না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধীমান সাং লিন্ ক্রূরমতি যার দ্বারা চালিত হয়ে স্বদেশ থেকে এখানে এসেই অর্থকষ্ট ও নানারকম অসুবিধায় পড়ে গেছেন। শ্রীমতী সু তাঁকে এই কাজটুকুর জন্যে তিনশত মুদ্রা দেবেন, এই সর্তে যে তিনি ভগবান বুদ্ধকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করবেন যে এই গোপন রহস্যটি প্রকাশ করবেন না এবং তার চেয়েও যা বেশি দরকারী, পরের জাহাজেই কলকাতা ছেড়ে নিজের দেশ ক্যান্টনে চলে যাবেন।'

এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাবে সাং লিন্ হঠাৎ কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, তবে তাহার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছে সুদৃশ্য খাপের মধ্যে তরবারির মতোই লোভের ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে ধ্বংস।

কিন্তু লোভই আবার সৌভাগ্যকে পথ কাটিয়াও আনে। সাং লিন্ মাঝামাঝি একটা রাস্তা বাহির করিল ; বলিল, 'এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ভার বহন করবার ক্ষমতা হতভাগ্য সাং লিনের দুর্বল স্কন্ধে আছে কিনা, একবার বুঝে দেখা দরকার, এইজন্যে সে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা ফু চাওয়ের নিকট মাত্র দুটি ঘণ্টার সময় ভিক্ষা করছে। আজ পূর্ণিমার তৃতীয় দিন, চন্দ্র পূর্বের দরজা খুলে আকাশের কারখানায় প্রবেশ করবার আগেই সাং লিন্ গিয়ে দন্ত-চিকিৎসকদের গৌরবস্থল ফু চাওকে তার মতামত জানিয়ে আসবে।'

৪

ফু চাও চলিয়া গেলে সাং লিন্ রকে উঠিয়া কুঠুরিটি খুলিল, তাহার পর গাঁটরিটা এক কোণে রাখিয়া দিয়া, খাটে গা এলাইয়া দিয়া দৃষ্টি কড়িকাঠ-লগ্ন করিল।

রীতিমতো চিন্তার বিষয়,—শ্রীমতী সু-লান্ তাহাকে হঠাৎ এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশ্বাস করিয়া ডাকিল কেন? অবশ্য সে যখন তাহার বাড়ি ছাড়িয়া আসে তখন খোলাখুলি ঝগড়া করিয়া আসে নাই, তবে শ্রীমতী সু, টুং চিনের প্ররোচনায় ভিতরে ভিতরে সাং লিনের প্রতি যে বিরূপ হইয়াছিল, এটা জানা কথাই। আর এটাতেও শ্রীমতী সু'র কোন সন্দেহ ছিল না যে, টুং চিন আসিয়া তাহার জায়গা দখল করায় সাং লিন্ ওদের দুজনের উপরই ভিতরে ভিতরে চটিয়া ছিল। এ অবস্থায় সেই সাং লিন্‌কে এমন একটা বিশ্বাসের কাজে ডাক দেয় কেন?

এর সঙ্গে আরও একটা কথা আছে, শ্রীমতী সু'র দাঁতের রহস্যটা সাং লিন্ ভিন্ন অন্তত আর একজন তো জানিবেই—সেই দন্ত-চিকিৎসক ফু চাও, তাহার মুখ বন্ধ করিবার কি উপায়? সে তো কলিকাতাতেই থাকিবে।

তবে কি সবই সাজানো?—আর এর মধ্যে ঐ কুকুর-মুখো পিতার সন্তান টুং চিনও আছে? এই সন্দেহই হয় সাং লিনের মনে।

ওরা দুজনেই জানে সাং লিন্ গভীরভাবে নিরাশ হইয়াছে এবং এই বিবাহ হইলে ওদের দুজনেই উগ্র শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, তাই নিশ্চয় কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ওকে একেবারে দেশ থেকে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। যতই ভাবিতে লাগিল, সাং লিনের বিস্ময় ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল, মনে হইল কুটিলতার দেবতা স্বয়ং মার যদি এদের আসন ছাড়িয়া দেন তো কিছু ভুল হইবে না।

চিন্তার মধ্যে সাং লিনের হঠাৎ মহাবীর টা ফো'র বাণী মনে পড়িয়া গেল—শত্রু যখন তোমায় বিশ্বাস করিয়া মিত্রভাবে আহ্বান করে, জানিবে তোমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে।

কথাটা মনে পড়িয়া যাইতেই সাং লিনের সমস্ত শরীরে প্রথম আফিম-সেবনের পুলক সঞ্চারিত হইয়া গেল; সে উঠিয়া বসিল।…মহাবীর টা ফো'র

এই মহাবাণী কি সত্যই তাহার জীবনে সফল হইবে?…কোন্ পথে কিরূপে এই নূতন সৌভাগ্য আসিতে পারে তাহার জীবনে?

সাং লিন্ চিন্তা করিতে লাগিল। মাথায় এমন চমৎকার মতলব সব আধ-ধরা হইয়া আসিতেছে যে, আনন্দের অধীরতায় সাং লিনের মনে হইতেছে সে দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সেগুলোকে ভালো করিয়া বাহির করিয়া ফেলে। কপালটা ভালো করিয়া টিপিয়া ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিল সাং লিন্—ধারণাগুলো পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে—ক্রমেই আরও পরিষ্কার, ক্রমেই আরও… শেষে সৌভাগ্যের রূপটি, আর তাকে ডাকিয়া আনিবার পথ দুইটিই সাং লিনের মনশ্চক্ষুর সামনে বর্ণে-রেখায় জ্বলজ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

এই সময় বাহিরে ফু চাওয়ের বিনয়পূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে আসিল: 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দন্ত-চিকিৎসক, সমস্ত গুণের মাল্য পরিহিত সাং লিনের মত কি ঠিক হয়েছে? দু' ঘণ্টার জায়গায় আড়াই ঘণ্টা হয়ে যাওয়ায় ফু চাওয়ের কান দুটি তাঁর বাক্যামৃত পান করার জন্য অধীর হয়ে ওঠায় তাদের বয়ে নিয়ে আসতে হ'ল।'

সাং লিন্ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল; চন্দ্র তাঁহার কারখানায় অনেকখানিই আগাইয়া আসিয়াছেন। বলিল, 'অভাজন সাং লিন্ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা রূপসী শ্রীমতী সু-লানের হাসিকে স্বর্ণমণ্ডিত করবার আনন্দে এতই বিভোর হয়ে গেছে যে, তার আর সময়ের জ্ঞান নেই। স্বর্গদূতের সঙ্গে সমান আসন পাওয়ার অধিকারী ফু চাও যেন এই খবরটি তাঁর কাছে অবিলম্বে পৌঁছে দেন। এই মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজটি কবে এবং কোথায় সম্পন্ন করতে হবে?'

'পূর্ণচন্দ্রের পঞ্চম রাত্রে ঠিক আট ঘটিকায় আমারই দোকানে। চাবি আমি শ্রীমতীর কাছে রেখে যাব; সন্ধ্যার পরই তিনি মহাপ্রাণ সাং লিনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

৫

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সাং লিন্, টুং চিনের বাসায় গিয়া প্রাতঃকালীন অভিবাদন জ্ঞাপন করিল। টুং চিন প্রভাত সূর্যের মরীচিমালার দিকে তাকাইয়া শ্রীমতী সু'র দাঁতের ওপর আর একটি কবিতা রচনা করিবার উদ্যোগ

করিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে একেবারে বাড়ি বহিয়া আসিতে দেখিয়া অধিক শঙ্কিত হইল, কি, বিস্মিত হইল বোঝা গেল না; তবে সে-ভাবটা তাড়াতাড়ি গোপন করিয়া নিতান্ত কৃতকৃতার্থের ভাব দেখাইয়া বসিবার আসন দিয়া বলিল, 'আজ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সূর্যের মতো দীপ্ত ও প্রভাবশালী সাং লিন্ কী মনে করে আমার এই দীন কুটিরে পদার্পণ করেছেন জানতে পারি কি?'

সাং লিন্ যথোচিত বিনয় সহকারে উত্তর করিল, 'ভিখারীর মতন কুৎসিত সাং লিন্ একটি প্রার্থনা নিয়ে মহাস্থবির-তুল্য টুং চিনের পবিত্র আলয়ে উপস্থিত হয়েছে; অনুমতি হ'লে নিবেদন করে।'

'অনুগ্রহ করে ব'লে আমার পাপদগ্ধ কান দুটিকে পবিত্র ও শীতল করুন।'

"হতভাগ্য সাং লিন্ সংসারের ভার একা বইতে অসমর্থ হওয়ায় নিতান্ত ছুছুন্দরীর মতো কুৎসিত কদাকার একটি যুবতীর পাণিপীড়ন করিতে ইচ্ছুক হয়েছে। পৌরোহিত্যে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ টুং চিন এবার শোনা যাচ্ছে সংসার-আশ্রম গ্রহণ করবেন—পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সুন্দরী রমণী-কুলগৌরব শ্রীমতী সু-লানের পাণিগ্রহণ ক'রে; তার আগে তিনি কি অযোগ্য সাং লিনের এই বিবাহটা মন্ত্রপূত করে দিতে পারবেন? এর জন্যে সাং লিন তাঁকে তাঁর ইচ্ছামতোই অর্থ দিতে প্রস্তুত আছে—কেননা মহাস্থবির টু সিং ফো বলে গেছেন, বর-বধূ যতই ঘৃণিত হোক, উপযুক্ত পুরোহিতের হাতে পড়লে তাদের সব দোষই ক্ষালন হয়ে যায়।'

টুং চিন এতবড় সুখবর সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাশা করে নাই, পিঠে করিয়া কাপড়-বেচা, অর্ধাহারী এই হতভাগাটা যদি একটা বিবাহ করিয়া ফেলে তো আর গোলযোগ থাকে না, নইলে যেখানেই থাকুক তাহার কুৎসিত লুব্ধদৃষ্টি শ্রীমতী সু-লানকে খুঁজিয়া ফিরিবেই। গভীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল, 'জগতে রূপে গুণে অতুলনীয় সাং লিনের বিবাহে পৌরোহিত্য করবার সুযোগ যে অযোগ্য টুং চিনের কখনও হ'তে পারে, এটা কল্পনাই করা যায় না। এই পৌরোহিত্যের সম্মানই যথেষ্ট, এর মধ্যে টাকার কোন প্রশ্নই আনতে দেওয়া যায় না। এখন জগতের শুভতম এই বিবাহটি কবে অনুষ্ঠিত হবে জানতে পারা যাবে কি?'

'পূর্ণিমা থেকে পঞ্চম রাত্রে এই দীনতম বিবাহটি সম্পন্ন হবে এই রকম ঠিক হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে দরকারী কথা এই বিবাহের গোপনীয়তা। স্থানটিও

আমার কুটির নয়; সেখানে জায়গার অভাবের জন্য আমি উদারহৃদয় ফু চাওয়ের চিকিৎসাগারটি চেয়ে নিয়েছি, মহামতি টুং চিন সেইখানেই সাড়ে আটটায় উপস্থিত হবেন। তাঁর সঙ্গে আরও লোক থাকতে পারে। কিন্তু তারা কেউ বা তিনি নিজেও বিবাহের সময় পাত্রীকে দেখতে পাবেন না। আমরা দুজনেই একটি ঘরে থাকব আর পাশের ঘর থেকে মহামতি টুং চিন মন্ত্র পড়াবেন ও অন্য সব নির্দেশ দিয়ে যাবেন।'

একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার, টুং চিনের সমস্ত পুরোহিত-জীবনে এ অভিজ্ঞতা হয় নাই, একটু যে খটকাও না লাগিল এমন নয়, উট-মুখোর সন্তান রাত্রে কী উদ্দেশ্যে কোন্ আঘাটায় লইয়া যাইবে?...তবে সঙ্গে ইচ্ছামতো লোক লইয়া যাইবার কথা বলিতেছে এদিকে।...বিবাহ হইয়া যাওয়ার আনন্দটাই জয়ী হইল; টুং চিন বলিল, 'কাব্যে বলা হয়েছে, যে-বিবাহের মধ্যে যত বেশি রহস্য থাকে সে-বিবাহ তত বেশি মধুর; এই মধুরতম বিবাহ অলক্ষ্যে চালিত করবার সৌভাগ্য পেলেও পুরোহিতদের মধ্যে নগণ্য টুং চিন নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবে। ঐ পবিত্র রাত্রিটিতে সাং লিন্ যেন যথাসময়ে টুং চিনকে ডেকে নিয়ে যান।'

৬

টুং চিনের সঙ্গে কথাবার্তায় মনে হইল যে, সাং লিন্‌কে দেশছাড়া করিবার চক্রান্ত তাহার মধ্যে নাই,—শ্রীমতী সু-লানের দন্ত-ঘটিত ব্যাপারটাও জানে না, তাহার মানে শ্রীমতী সু এ-দুর্বলতার কথাটুকু নূতন স্বামীর নিকট গোপন রাখিতেই চায়, বাঁধানো হইয়া গেলে বলিবে, তাহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া কাঁচা দাঁতই শখ করিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে।

যদি এই রকমই হয় তো ভালোই হয়, সাং লিন্ যে মতলবটি আঁটিয়াছে তাহার সঙ্গে মেলে আরও চমৎকার।...কখনও সন্দেহ, কখনও আশা, কখনও অবসাদ, কখনও উৎসাহ—এই করিয়া দুইটা দিন কাটিয়া গেল, পূর্ণিমা থেকে পঞ্চম রাত্রিটি আসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পরই শ্রীমতী সু-লানের একজন বিশ্বস্তা দাসী আসিয়া ফু চাওয়ের দোকানের চাবিটা দিয়া গেল এবং জানাইয়া গেল, ঠিক আট ঘটিকার সময় কর্ত্রী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইবেন, সব যেন ঠিক থাকে।

ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমিতে তাঁহার অনুগ্রহ যে পদে-পদেই তাহার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া গেল। ফু চাওয়ের বাসায় তিনটি ঘর, তাহার মধ্যে দুইটি একেবারেই পাশাপাশি এবং তাহারই একটিতে চিকিৎসাগার; ঠিক এইরকমটি না হইলে সাং লিনের একটু দুশ্চিন্তার কারণ হইত।

সাং লিন্ আগে গিয়া সব দেখিয়া-শুনিয়া ঠিক করিয়া রাখিল। চিকিৎসাগার বেশ ভালো, চেয়ারটিও আধুনিক, রোগী যাহাতে চিকিৎসকের আয়ত্তে থাকে তাহার সবরকম ব্যবস্থা আছে। সাং লিন্ নিজের বুদ্ধমূর্তিটি আনিয়া সামনেই একটি ছোট টেবিলে রাখিল। সব ঠিকঠাক হইয়া গেলে শ্রীমতী সু-লানের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

ঠিক আটটার সময় শ্রীমতী সু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাং লিনের মাথার যেন বজ্রপাত হইল, শ্রীমতী একা নয়, সঙ্গে তাঁর সেই বিশ্বস্তা দাসী।

আনন্দেই হোক অথবা অতিরিক্ত চিন্তার জন্য হোক—এ সম্ভাবনার কথাটা সাং লিনের একেবারেই মনে উদয় হয় নাই আগে। সত্যই তো, রাত্রিকালে একজন ভদ্রমহিলা নিতান্ত একা কি করিয়া যাইতে পারে কোথাও, বিশেষ করিয়া এমন একটা কাজে?...কিন্তু তাহা হইলে সাং লিনের সমস্ত প্ল্যানও একেবারে যায় কাঁচিয়া,—ঘরে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিলে তো চলিবে না তাহার।

সাং লিনের মহামতি সাং টু'র বাণী মনে পড়িয়া গেল, বিপদকালে যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারাইয়া বসে, দুর্ভাগ্যের দেবতা মার তাহাকে নিজের সহচর করিয়া লয়। সাং আগাইয়া গিয়া শ্রীমতী সু-লানকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া বাছা বাছা কথায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল, অবশেষে তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিল, 'বিশ্বাসের নিতান্তই অযোগ্য, পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট নরাধম এই সাং লিন্‌কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা রমণী শ্রীমতী সু-লান কি সূচের অগ্রের মতো নিতান্ত অল্পও বিশ্বাস করেন?'

শ্রীমতী সু-লান যথোচিত বিনয় সহযোগে উত্তর করিলেন, 'জগতের কুৎসিততম এবং নির্গুণতম নারী সু-লান যে দেবতার চেয়েও নির্ভরযোগ্য সাং লিন্‌কে কতটা বিশ্বাস করে, তা আজকের এই ঘটনাই প্রমাণ করছে। এ প্রশ্নটা করবার উদ্দেশ্যটা তাকে বিশ্বাস করে বলা যেতে পারে কি?'

'আজ প্রায় এই সময় আমার বাসায় এক বন্ধুর আসবার কথা আছে। তাকে বারণ করে দেবার সুযোগ হয়নি আমার; আমার প্রতিবেশীরা জানে আমি বাসায় না-থাকলে হয় শ্রীমতী সু-লানের প্রাসাদে থাকি, না হয় থাকি-মহাপ্রাণ ফু চাওয়ের এই দোকানে…'

শ্রীমতী সু-লান শঙ্কিত দৃষ্টিতে বলিলেন, 'তাহলে…তিনি এসে পড়তে পারেন এখানে।'

সাং লিন্ মনে মনে পুলকিত হইয়া বিষণ্ণ গম্ভীরতার সঙ্গে বলিল, 'সবচেয়ে ভাবনার কথা, আমার বন্ধু আবার পরম ভাগ্যবান টুং চিনেরও পরিচিত। তাই একটা কথা মনে হচ্ছিল আমার, যদি এই অযোগ্যকে বিশ্বাসই করেন, আপনার দাসীকে আমার বাসায় পাঠিয়ে দিতে পারা যায়; আমি চাবি দিচ্ছি, সে বসে থাকবে, তারপর আমার বন্ধু এলে তাকে নিয়ে আপনার বাসায় উঠবে, বলবে, সেইখানেই যাবার কথা আছে আমার।'

দাঁতের কবিতা লিখিয়া লিখিয়া পেঁচা-মুখো পুরুতটা সত্যই দফা শেষ করিয়া দিয়াছে মাগীটার, ধরা পড়ার ভয়েই সে সারা একেবারে। সাং লিনের চেয়েও তাড়াহুড়া করিয়া দাসীটাকে পাঠাইয়া দিল তাহার বাসায়, যেন কেহ আসিলে সু-লানের বাসায় লইয়া গিয়া আটকাইয়া রাখে।

ঘড়িতে আটটা পনেরো হইয়াছে, ঠিক সাড়ে আটটায় টুং চিন আসিবে, পর্দাটা টানিয়া দিয়া রাস্তার দিকে মাঝে-মাঝে দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে সাং লিন্ খুব পাকা দন্ত-চিকিৎসকের চেয়েও বেশি পাকামি করিয়া সরঞ্জামে লাগিয়া গেল, খুব ঘটা করিয়া যন্ত্রপাতিগুলো ধুইতে লাগিল। নিজের হাত ও কনুই পর্যন্ত সাবান দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ধুইল, তাহার পর ইস্ত্রি-করা পরিষ্কার অ্যাপ্রন্‌টি নিজের বুক-পেটের উপর ফেলিয়া গ্রন্থি-দেওয়া শেষ করিয়াছে, এমন সময় গলির মুখে টুং চিনকে দেখা গেল।

আনন্দে এবং উত্তেজনায় সাং লিনের বুকের ভিতরটা ধকধক করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি দুয়ারটা ভালো করিয়া ভেজাইয়া দিয়া বলিল, একি সর্বনাশ, এ যে স্বয়ং মহামতি টুং চিন-ই এদিকে আসছেন দেখি। শ্রীমতী সু কি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন এই দন্তোৎপাটন উৎসবে উপস্থিত থাকতে?'

শ্রীমতীর সোনার-থালার-মতো হলদে মুখখানা একটা দস্তার থালার

মতো ফ্যাকাশে হইয়া গেল; বলিলেন, 'কই, না তো। তাঁর কাছ থেকে লুকোবার জন্যেই তো এত আয়োজন, মহাভিষক সাং লুনের তো সেটা জানা আছে।'

'তবে বোধ হয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি টুং চিন, মধুমক্ষী যেমন ফুলের সন্ধান পায় সেইরকম ভাবে, প্রেমিকের কোন নিগূঢ় ক্ষমতাতেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফুল সু-লানের এখানে উপস্থিতির কথা টের পেয়েছেন; হয়তো দাঁত সম্বন্ধে নূতন কবিতা শোনাতেই আসছেন...'

ভয়ে সু-লানের দাঁত-কপাটি লাগার মতো অবস্থা হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বন্ধ দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া টুং চিন ডাক দিল, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দন্ত-চিকিৎসকের ঈর্ষা-স্থান সাং লিন্ কি উপস্থিত আছেন?'

সাং লিন্ ভিতর হইতেই বলিল, 'মহামান্য টুং চিনের কণ্ঠসঙ্গীত ব'লে মনে হচ্ছে যেন; পাশের ঘরে বসে এই দীন কুটীরকে পবিত্র করুন,—এখুনি সেবায় উপস্থিত হচ্ছি।'

পাশের ঘরে চাপা গলায় মিনিট দুয়েক কী কথাবার্তা হইল, তাহার পর সাং লিন্ শ্রীমতী সু-লানের কাছে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে ভগবান বুদ্ধের একেবারে সামনা-সামনি করিয়া অপারেশন চেয়ারটায় বসাইল। তাহার পর ফু চাওয়ের দাঁত উপড়াইবার সবচেয়ে ভীষণ সাঁড়াশিটা তুলিয়া লইয়া শ্রীমতী সু-লানের একটা কাঁচা দাঁত বেশ ভালো করিয়া বাগাইয়া ধরিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিল, 'শ্রীমতীর কল্যাণের জন্য পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ টুং চিন কিছু মন্ত্র পড়াবেন বলছেন—ভগবান বুদ্ধের সামনে চেয়ে মন্ত্রগুলি আপনাকে পাঠ করতে হবে। আপত্তি আছে কি?...আপত্তি থাকলে এইরকম কষ্ট হতে পারে...'

কাঁচা দাঁতে একটু নিষ্ঠুর চাড়া দিল।

শ্রীমতী সু শিহরিয়া উঠিয়া চাপা গলায় বলিলেন, 'না...কিছু আপত্তি নেই...'

সাং লিন্ গলা তুলিয়া অপর ঘরে টুং চিনকে বলিল, 'এবার তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত তাঁর সবচেয়ে পবিত্র মন্ত্রগুলি পড়ান।'

একমুখ নিষ্ঠুর সাঁড়াশি সমেত যতটা স্পষ্ট করিয়া পড়া সম্ভব পড়িতে লাগিলেন শ্রীমতী সু-লান, তাহার পর এক জায়গায় আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন, 'এ তো দেখছি বিবাহের মন্ত্র, মহামতি সাং লিন্!'

সাং লিন্ আর-একটা চাড়া দিল সাঁড়াশির ; বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীমতীর আপত্তি আছে কি ?'

'না···মোটেই না।'

আর একটু অগ্রসর হইয়া—

'কিন্তু কার সঙ্গে ?—এ যে দেখছি আপনিও মন্ত্র বলছেন, ভিষক্-রাজ সাং লিন্।'

সাং লিন্ আর-একটা মর্মান্তিক চাড়া দিয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীমতীর আপত্তি আছে কি ?'

'উঃ।···না, একটুও না।'

আর-একটা চাড়া—

'স্ব-ইচ্ছাতেই পড়ছেন ?'

'উঃ। (গেলুম।)···হ্যাঁ, সম্পূর্ণ স্ব-ইচ্ছাতেই।'

'ভগবান বুদ্ধ সাক্ষী ?'

'মলুম। বাঁচান্···হ্যাঁ···নিশ্চয় সাক্ষী তিনি···'

বিবাহ শেষ হইলে বরবধূ বাহির হইয়া পুরোহিতকে আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিল।

* * * *

মহাস্থবির টুং চিন গার্হস্থ্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া এবং রমণীর দাঁতের উপর কবিতা লেখা ছাড়িয়া বুদ্ধগয়া যাত্রা করিয়াছেন, ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ তাঁহাকে যথাসময়ে নির্বাণলাভে সহায়তা করুন।

—

রেলে

দোলের ছুটিতে বাড়ি আসিতেছি।

ইণ্টার ক্লাসে আমার কায়েমী সঙ্গী একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। আর কিছু কিছু উঠিতেছে, দু'এক স্টেশন পরে নামিয়া যাইতেছে—এই রকম। ভদ্রলোক মোগলসরাইয়ে উঠিয়াছেন, দৌড় চন্দননগর পর্যন্ত। এদিকে সঙ্গী হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির হইয়াছেন বলিয়া একটা-কিছু ঘটিবেই সেই আশঙ্কায় মাঝে মাঝে নিঝুম মারিয়া যাইতেছেন। বলিলেন—'সবাই বললে—কাশী বাবার ত্রিশূলের ওপর, এখানে যাত্রার দিন দেখতে হয় না। বিশেষ কাজে এলাম চলে, কিন্তু···'

বাবাকে খোলাখুলি ভাবে চটাইবার ভয়ে 'কিন্তু'র পরের বক্তব্যটুকু আর প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না।

বক্সারে তাঁহার এক আত্মীয় থাকেন, আসিয়া দেখা করিবার কথা। গাড়ি ছাড়িয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'দেখলেন তো?—এলোনা, একটা কিছু নিশ্চয়······'

আমি বলিলাম—'তিনি যখন বেরস্পতিবার দেখে আর বেরোনই নি তখন তো কিছু দুর্ঘটনার ভয় নেই তাঁর দিক দিয়ে।'

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ ভাবে স্থির-দৃষ্টিতে আমার পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'ঠাট্টা করচেন?'

দানাপুর পর্যন্ত আর কোন কথা কহিলেন না। দানাপুর হইতে গাড়ি ছাড়িলে আমিই প্রশ্ন করিলাম—'এইবার পাটনাই তো?'

পাটনা আমার খুব চেনা, ছাত্রজীবনের একটা মোটা অংশ পাটনায়ই কাটাইয়াছি; তবুও দুইজনের মধ্যেকার মৌনতাটা বড় অস্বস্তিকর ঠেকিতেছিল বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ভদ্রলোক তুষ্ণীম্ভাব থেকে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—'তাই তো, পাটনাই তো এবার আসছে। যাক্ নিশ্চিন্দি!—অপরেশ বাবাজীরও তো যাবার কথা···'

সঙ্গে সঙ্গেই নিরুৎসাহ হইয়া থামিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—'না, তার যে বেস্পতিবার পৌঁছুবারই কথা, তা'হলে তো সে কালই রওয়ানা হ'য়ে গেছে…তুর্যোগে একটি লোক পাশে থাকলে উপকার হোতো; তা, সবাই তো আমার মত তালকানা নয় যে বার-ক্ষণ না দেখে হুট করে বেরিয়ে পড়বে?'

প্রশ্ন করিলাম—'অপরেশ বাবাজীটি কে?'

'ভাইঝি জামাই। এখানকার কলেজের প্রফেসার। হীরের টুকরো, আগে নামেই শুনেছিলাম মশাই, ভাইঝির বিয়ে দিয়ে চোখে দেখলাম!'

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—'এমন!'

বৃহস্পতিবারের বারবেলার শঙ্কাটা লুপ্ত হইয়া ভদ্রলোকের চোখ মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিলেন—'লাখে একটি পান কি না সন্দেহ। ত্ব'টো জিনিসে এম-এ, ত্ব'টোতেই গোল্ড মেডেল; কিন্তু দেখে কেউ বলুক দিকিন ছেলেটার পেটে বিদ্যে আছে একটু! টুঁ শব্দটি নেই মুখে—সাত ডাকে উত্তর দিতে জানে না। বিয়ের পর ত্ব'বার গিয়েছিল—একবার জোড়ে, একবার আর কিসে যে মনে পড়ছে না…হ্যাঁ, ঠিক, শৈলীর মেয়ের অন্নপ্রাশনে, তা একটি দিন কেউ টের পেলে যে বাড়িতে একটা জামাই এসেছে? কি ধীর শান্ত ভাব! কি বিনয়ী! কথা বলছে তো আদ্দেক তার মুখের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। এক-বাড়ি শালী-শালাজ—ডবল এম-এ বলে তারা তো আর খাতির করবে না? ঠাট্টা তামাসায় ব্যতিব্যস্ত করবার ফিকির করেছে—উহুঁ, সে ভিড়বেই না তো তুমি ঠাট্টা করবে কার সঙ্গে?…আর আজকালকার ছেলেও সব দেখছি তো?—ত্ব'টো ইংরিজি অক্ষর পেটে গেছে কি না-গেছে—মুখে যেন তুবড়ী ফুটছে মশাই।'

চোখ তুইটা বড় বড় করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এতটা প্রশংসা শুনিয়া কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া আমি কহিলাম—'যার হবার ঐ রকমই হয়—।'

'সিগারেট কি বিড়ি?…রামঃ—পান পর্যন্ত ত্রিসীমানার মধ্যে আসবার যো নেই।…অমন দেখেননি মশাই, ঐযে বললাম, লাখের মধ্যে একটি পাওয়া তুষ্কর। দাদা যেমন দিলেন সুচুর বিয়ে অনেক দেখেশুনে অনেক খোঁজাখুঁজি

ক'রে তেমনি জামাই পেয়ে আর ক্ষোভ রইল না মশাই। দুঃখ র'য়ে গেল সে কাল চ'লে গিয়েছে, না হ'লে দেখিয়ে দিতে পারতাম—আর, একবার দেখলে, একটু পরিচয় হ'লে ভুলে যেতে পারতেন ভেবেছেন?—রামোচন্দ্র বলুন।'

এমন সময় গাড়ি গরদানীবাগে প্রবেশ করিল। 'সর্বনাশ, পাটনা এসে গেল যে!'—বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বিছানাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া লইয়া হঠাৎ আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম। ভদ্রলোক খানিকটা ঢাকা থাকিয়া মুখটা বাহির করিয়া বলিলেন,—'বুঝলেন না ব্যাপারটা? অসুখ হয়েছে, নিঝুম হ'য়ে পড়ে আছি। না হ'লে যা পাটনেয়ে ভিড়!...গাড়িতে ঠেলে উঠলে একটুও বসবার জায়গা পাওয়া যাবে নাকি? অবশ্য ঘুম আজকে হবে না; বেরস্পতির বারবেলায় বেরনো—কলিশনের মস্তবড় একটু ধুকপুকুনি র'য়েছে যে এদিকে। কিন্তু ঘুম না হ'লেও বসে বসে তো সমস্ত রাতটা কাটান যায় না মশাই?...এই এসে গেল স্টেশন...আমি তা'হলে ঢুকলাম মশাই, গুড্‌নাইট...যা অসুখ মনে আসে—আমি মাঝে মাঝে গ্যাঙাতে থাকব। সমস্ত রাত ঠায় ব'সে প্রহর গোণাব চেয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে একটু গ্যাঙানো ভাল মশাই। গুড্ নাইট।'

কানের কাছে যদি একটা লোক সমস্ত রাত গ্যাঙাইতে থাকে তো সব প্রথম তো আমার ঘুমের দফা নিকেশ। বলিলাম—'না গ্যাঙাবার দরকার নেই; ধরুন যদি ঘুমই আসে তখন আবার ঐ গ্যাঙানি বন্ধ হবার ভয়ে ঘুমোতেই পারবেন না। সে এক উল্টো ফ্যাসাদ। তার চেয়ে ঘুপটি মেরে পড়ে থাকুন, আমি সামলে নোব'খন।

গাড়ি প্লাটফরমে ঢুকিয়াছে। 'তবে তাই ঠিক; গুড্ নাইট।'—বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মুখটা ঢাকিয়া ফেলিলেন।

পাটনেয়ে ভিড়ই বটে! গাড়ি থামিতেই প্রায় দশ-বারো জন বাঙালী যুবক সুটকেস্, ব্যাগ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি লইয়া আমাদের গাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সকলেই যুবক, দু'একজনের বয়স একটু বেশি, বেশভূষা কথাবার্তায় সবাইকেই বেশ শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। গাড়িটা যেমন খালি ছিল ঠিক সেই পরিমাণ ভর্তি হইয়া গেল। আমি একটা বেঞ্চ বিছানা পাতিয়া

দখল করিয়াছিলাম, বিছানাটা গুটাইয়া লইতে হইল। ভিড়ের শেষ অংশ ভদ্রলোকের বেঞ্চে গিয়া হানা দিল।

'মশাই, ও মশাই……।'

বলিলাম,—'উনি অসুস্থ, ওঁকে দয়া ক'রে আর তুলবেন না।'

'কি অসুখ মশাই ?'

বলিতে যাইতেছিলাম জ্বর, কিন্তু দেখিলাম দলের মধ্যে একজন ডাক্তার, পকেটে স্টেথোস্কোপ রহিয়াছে, সামলাইয়া লইয়া বলিলাম—'বিদেশে জ্বরে পড়েছিলেন, সবে কয়েকদিন পথ্যি পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন…রেস্ট দরকার…'

'ও !…আপনার কেউ হন ?'

'না, এক সঙ্গে আস্‌ছি অনেক দূর থেকে ; তা ভিন্ন পথে সবাই সবার বন্ধু, বিশেষ ক'রে যখন স্বজাতি…'

'তাতো বটেই, তাতো বটেই। তা'হলে ও বেঞ্চটা ছেড়েই দিই সবাই। আমরা এই দিকেই কোন রকম ক'রে কুলিয়ে নোব'খন। বলে, যদি হয় সুজন —তেঁতুল পাতায় ন'জন।'

সকলে বক্তার পানে চাহিল। একে প্রবাদটা নিতান্ত মেয়েলি, তাহাতে বলিবার মধ্যেও বেশ একটা টান ছিল। একজন হাসিয়া প্রশ্ন করিল, 'কার কাছে পাওয়া এ স্যাম্পেল-টুকু মশাই ? হার্ হাইনেস্ ?'

যুবকের মুখে একটা বার্ডসাই, কায়দা মাফিক সেটা দুই আঙুলে সরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—'নো, হার্ ইম্পিরিয়েল ম্যাজেস্টী, মহামহিমান্বিতা শালাজ ঠাকরুন। আমি আপনাদের proverb (প্রবাদ)-টা শোনালাম কোনো রকমে, কিন্তু সরি (sorry), ডেলিভারির (delivery) মাধুর্যটা কিছুই ফোটাতে পারলাম না, আর এ কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠে সে বীণানিন্দিত স্বর আসবেই বা কোন্ দুঃখে ?—কী সে সুর, কী ভঙ্গী, কী গমক—আপনারা একটা 'প্রোভার্ব'মাত্র শুনলেন, আমার কানে ওটা তানলয়সমন্বিত একটা অপ্সরা কণ্ঠের সঙ্গীতের মতন বেজেছিল—যদি হ—য় সু—জো—ন তো তেঁতুল পাতায় ন—জোন…'

খুব চমৎকার ভাবে মেয়েলি কণ্ঠের নকল করিয়া, হাত আর গলা খেলাইয়া —যুবক মুখচোরের ভঙ্গী সহকারে এমনভাবে প্রবাদটা আওড়াইল যে সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সকলে এক একটা জায়গা লইয়া বসিল। যুবক আমার বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া হাত জোড় করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল—'বেয়াদপি মাফ ক'রবেন; হোলির ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি সব—অনেকে আবার বাড়ির চেয়েও উৎকৃষ্ট জায়গায়,—সকলে দু'টো প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, প্রথমত গাড়িতে ঘুমুব না, দ্বিতীয়ত প্রাণে যা অনুভব করছি তা খোলা প্রাণে বলব, কারুরই খাতির ক'রব না, অবশ্য এক মহিলা ছাড়া। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশত গাড়িতে কোনো মহিলা নেই। আপনি নয়ই (মাফ করবেন); আশা করি যিনি শুয়ে রয়েছেন তিনিও কোন মহিলা নন। এ-অবস্থায় আমরা যদি আমাদের যা-অনুভব-করা-তাই বলার প্রতিজ্ঞা পালন ক'রতে চেষ্টা করি তো আশা করি অপরাধ নেবেন না। শুধু আজকের রাতটুকুর জন্য আমরা এই লিবার্টিটুকু নোব...'

ওদিক হইতে একজন বলিল—'তোমার রসনা তো চিরকালই ঐ রকম চাঁদ, শুধু আজ কেন?'

যুবক আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—'বিশ্বাস করবেন না মশাই। ও যেমন এই উৎকট অপবাদ দিচ্ছে, আমি তেমনি এক সেট সাক্ষী দিতে পারি যাদের জবানবন্দি ঠিক উল্টো। যাক, মোটের ওপর শুধু আজ রাতটুকুর জন্য এই লিবার্টিটুকু নিচ্ছি। আমরা হোলিকা দেবীর বাসর জাগছি, প্রগল্‌ভতা মাফ করতে হবে। এ-অনুগ্রহের জন্য আমরাও আপনার খুব বড় একটা উপকার করতে রাজি আছি—'

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—'কি উপকার শুনি? যদিও উপকার না করলেও চলবে; আপনারা আমোদ-আহ্লাদ ক'রতে ক'রতে যান সে তো ভালই।'

যুবক বেশ সপ্রতিভভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—'উপকার এই,—আপনিও যদি ঐ রকম মুড়িসুড়ি দিয়ে শোন তো আমরা সবাই বলব—উনি অসুস্থ, সেই দিল্লী থেকে ওই রকম মুড়িসুড়ি দিয়ে আসছেন। এমন কি যদি আপত্তি না থাকে তো পর্দানশীন মহিলাও বলে চালাতে পারি'—বলিয়া যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর সকলেও যোগ দিল। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু যুবকের কথাবার্তায় সত্যই এমন একটা নির্দোষ প্রাণ-খোলা ভাব ছিল যে রাগ করিতে পারিলাম না।...

দেখিলাম বকার অভ্যাসটা যুবকের খুব রপ্ত। বার্ডসাইয়ে গোটাকতক টান দিয়া আবার শুরু করিল, 'না বিলীভ্ মি, পর্দানশীনের ব্যাপারটা কল্পনা মাত্র নয় ; কাজেও একবার পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। পাটনাতে এই চাকরির জন্যে ইণ্টারভিউ ক'রতে আসছি। সকালে নেমেই এক ঘণ্টা পরে ইণ্টারভিউ, সুতরাং রাত্রে ঘুমটা বিশেষ দরকার। হাওড়ায় গাড়িতে উঠেই এক মতলব করা গেল। গাড়িটায় তখন আমি ছাড়া মাত্র আর একটি প্যাসেঞ্জার উঠেছেন, আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়, হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেস্যার। সব খুলে ভদ্রলোককে বললাম। বললেন—'তা তো বুঝলাম, কিন্তু উপায় কি? অসুখের নামকরে শুয়ে থাকবেন?'…বললাম—'অসুখে আবার একটু ছটফটানি, কাৎরানি না থাকলে সব সময়ে ফল হয় না। অসুখের চেয়ে লোকে স্ত্রীলোককে বরং বেশি ভয় করে ;—ভয় করেই বলুন বা খাতির করেই বলুন—একই কথা, কেন না খাতিরটা ভয়েরই রূপান্তর।'…তখন আমার নতুন গোঁফদাড়ি বেরিয়েছে—নানা রকমের ঘন ঘন পরীক্ষা চ'লছে ; মাস দুই নিয়ে তখন সেই অল্পকেই যথাসাধ্য আয়ত্ত করে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখছি ; ভদ্রলোক আমার মুখের পানে চেয়ে শিউরে উঠে বললেন—'স্ত্রীলোক! আপনি!'…বললাম—'আগা পান্তলা মুড়ি দিয়ে শোব, আপনার এই এণ্ডির চাদরটা দিন,' ব'লে তিনি অনুমতি দেওয়ার আগেই চাদরটা তুলে নিলাম। ভদ্রলোক বললেন—'তা না হয় হোলো, কিন্তু একা একা স্ত্রীলোক যাচ্ছেন—এটা কি রকম হবে?…' এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা ; চোখ মুখ কপালে তুলে বললাম—'সে কি মশাই! একা একা কি? আপনার ওয়াইফ্—স্বামী সঙ্গে রয়েছেন, তাঁরই চাদর গায়ে!…বলুন ধর্ম সাক্ষী করে যে আপনার চাদর নয়!…'

গাড়ির সবাই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সেটা থামিলে প্রশ্ন করিলাম—'পৌঁছুলেন তো নিশ্চিন্দি হয়ে?'

যুবক ধোঁয়াটা অন্যদিকে ছাড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে না ; আমিই তো দুনিয়ার শেষ বুদ্ধিমান নয়, তা ভিন্ন তখন বাঙলা দেশটাও ছাড়িয়ে আসেনি গাড়িটা। বর্ধমান পর্যন্ত ভদ্রলোক ঠেকিয়ে রাখলেন কোনো রকমে। আসানসোলে একটি ডিগডিগে গোছের ছোকরা উঠল। প্রফেসরের কথা শুনে একটু নিরাশ হয়ে বললে—'মহিলা? তা'হলে থাকুন

শুয়ে।···সরলো না কিন্তু; আমি এণ্ডির চাদরটার মধ্যে দিয়ে দেখছি সেই জায়গায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্‌ করছে। একটু পরে আমার নতুন-কেনা ব্রোগ্‌ জুতোজোড়াটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে—'এ-জোড়াটা কি ওঁরই ?'

আবার গাড়িতে হাসির একটা হররা উঠিল। সেটা থামিলে কয়েকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল—'তারপর ? তারপর ?'

যুবক বলিল—'তারপরেও আবার বলতে হবে ?···প'ড়ে থাকলেই বোধ হয় চলে যেত কোনো রকমে—প্রফেসার সামলাবার চেষ্টাও করছিলেন, লোকটাও সে-চেহারা নিয়ে সাহস ক'রে সন্দিগ্ধ মহিলার গায়ে হাত দিতে পারতো না ; কিন্তু শরীরের জোরের ওপর ভরসা ক'রেই তো বাঙালী বেঁচে নেই ;—খাঁটি বাঙলার এমন চিপটেন কাটা শুরু করলে যে শেষ পর্যন্ত সোয়ামীর চাদরের মধ্যে মেজাজ ঠিক রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'যে উঠল ; মেজাজের সঙ্গে হিসেবও গেল বিগড়ে—বিধাতা যে মহিলাব ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখবার ব্যবস্থা করেননি, সেটা ভুলে গিয়ে গায়ের চাদর টান মেরে ফেলে······'

বাকি গল্পটা হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে আর বলাই হইল না।

কিউল জংশনে যখন গাড়ি পৌঁছিল তখন রাত সাড়ে বারোটা। হাসি-হুল্লোড়ে দলটা বেশ একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুবক নূতন নূতন গল্প করিয়া উৎসাহটা চাড়া দিয়া আসিতেছে, তবুও যেন একটু ঝিমানি ধরিয়াছে দলটায়। যুবকের ভাণ্ডারও যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। মোগলসরাইয়ের ভদ্রলোক খাঁটি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিউল হইতে গাড়ি ছাড়িলে যুবক হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, হাতে একটা সাপ্তাহিক টাইম্‌স্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া পাকাইতে পাকাইতে বলিল—'জেন্‌টেল্‌মেন্‌, আই ভোট্‌ ছাট্‌ উই সেলিব্রেট দি হোলি ইভ্‌ ইন্‌ এ মোর্‌ বিফিটিং ম্যানার (আমার প্রস্তাব—হোলির পূর্বের রজনীটা আরও উপযুক্তভাবে ব্যয়িত করা হোক)।'

দলটা আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন হইল—'শোনাই যাক্‌ ব্যাপারটা কি ?'

যুবক সেইরকম ভাবে কাগজটা পাকাইতে পাকাইতে লেক্‌চার দেওয়ার ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া বলিল—'হোলির অপর নাম বসন্তোৎসব ; বসন্তকে

চিনতে হ'লে, বুঝতে হ'লে, উপভোগ ক'রতে হলে, সৌন্দর্যকে চেনা চাই, সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণাই বাতিল হ'য়ে যায়—যদি নারীকে না দেখতে জানি, কেন না বিশ্বের সব সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে নারীর মধ্যে। কাল আপনারা সকলেই বসন্তোৎসবে যোগদান করতে যাচ্ছেন, বিফোর ইউ ডু, আই উড্ পুট্ ইওর সেন্স্ অব্ বিউটি টু টেস্ট্ (যোগদান করবার আগে আপনাদের সৌন্দর্যজ্ঞানের পরীক্ষা করতে চাই।)'

সকলে সকৌতুক ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিল। যুবক বার্ডসাইটা দাঁতে চাপিয়া কাগজটা খুলিয়া একটা ছবির পাতা বাহির করিল এবং সেটা ঘুরাইয়া সবাইকে দেখাইয়া বলিল—'জেন্‌টেল্‌মেন্, লেট্ মি প্রেজেন্ট্ টু ইউ মিস্ লিলিয়ান স্মিথ্ এণ্ড মিস্ ডোরা কেনেডি—বিউটি কুইন্ এণ্ড রানার-আপ্ ইন্ দিস্ ইয়ার্‌স্ বিউটি কম্পিটিশ্যন (আমি এ বৎসরের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নির্বাচিতা সৌন্দর্যরাজ্ঞী মিস্ লিলিয়ান স্মিথ্ এবং তাঁহার পরবর্তিনী মিস্ ডোরা কেনেডীকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি)। আপনাদের চক্ষে কে শ্রেষ্ঠা প্রতিপন্ন হয় দেখা যাক; আমাদের মাপকাটি আর ওদের মাপকাটির তফাতটা টের পাওয়া যাবে। প্রত্যেকের একটি করে ভোট নিন্, আসুন; আশা করি কাল যখন সবচেয়ে বেশি যাকে ভালবাসেন তার গায়ে রঙ দেবেন তখন রঙটা বেশি মিষ্টি হ'য়ে ফুটবে। আসুন।'

কাগজটা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুবক সকলের ভোট সংগ্রহ করিতে লাগিল। হাস্যে-রহস্যে, কৌতুক-কৌতূহলে মতামতের কাটাকাটিতে ব্যাপারটা অল্পের মধ্যে জমিয়া উঠিল। এর পূর্বে মোকামায় একজন পশ্চিমা ভদ্রলোক উঠিয়া বাঙ্ক আশ্রয় করিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহাকেও মত দিতে হইল, এমন কি একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান বৃদ্ধ কিউলে উঠিয়া এককোণে বসিয়াছিলেন, যুবকদের আবদার পেড়াপীড়িতে পড়িয়া তিনিও একটি অভিমত না দিয়া অব্যাহতি পাইলেন না। যুবক বলিল—'জনাব মেহেরবান, আপনাকে দেখে আমার মহাকবি ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়ছে, সৌন্দর্যের যাচাইএ আপনার ভোট তো আমাদের না হলেই নয়।'

যুবক ছবি দুইটির পাশে নাম লিখিতেছিল। সবার শেষ হইলে একটির পাশে নিজের নাম বসাইয়া গুনিয়া বলিল—'জেন্‌টেল্‌মেন্, আই বেগ লীভ্ টু ডিক্লেয়ার দি রেজাল্ট অব্ দি ভোটিং (আমি ভোটের পরিণাম জানাতে

চাই)। দেয়ার হ্যাজ্ বীন্ এ টাই—ইচ্ গেটিং সেভেন্ ভোট্‌স্ (উভয়েই সাত ভোট করে পাওয়ায় একই স্তরভুক্ত হয়েছেন)। এখন উপায়?'

সকলেই একটু মৌন হইয়া রহিল, যেন সত্যই একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শেষে ওদিক থেকে একজন যুবক বলিল—'দুজনকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হোক্ না কেন?'

একজন সমর্থনও করিল—'হ্যাঁ, দুজনকেই সন্তুষ্ট করা ভাল, ও-জাতের কাউকে চটান সমীচীন মনে করি না।'

যুবক ঘুরিয়া বলিল—'মাফ করবেন, ও-জাতকে চেনেন না বলেই ওকথা বলতে সাহস করছেন। ওঁদের একজনকে সন্তুষ্ট ক'রে তাঁরই আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকাই নিরাপদ। ওঁদের দুই বা ততোধিক জনকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাক্, এই মহাসঙ্কটে আমি একটু আলোর সন্ধান পেয়েছি…' চারিদিক থেকে ব্যস্ত প্রশ্ন হইল, 'কি আলো?' একজন বলিল—'হোয়াট্ ডেভিল্‌রি আর ইউ আপ্‌টু নেক্‌স্ট?' (এর পরেও কি শয়তানি মতলব এঁটে রেখেছেন?)

যুবক বলিল—'গাড়ির মধ্যে এখনও একজনের ভোট বাকি আছে।'

সকলে প্রথমটা বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর যুবকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাদর-ঢাকা মোগলসরাইয়ের ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—'না, না, ও ভদ্রলোক অসুস্থ, ঘুমুচ্ছেন।' আমিও আপত্তিতে যোগ দিলাম। যুবক দাঁড়াইয়াই ছিল, চুরুটে একটা বড় টান দিয়া বাঁ হাতে সরাইয়া লইয়া বলিল—'এক্‌স্‌কিউজ্ মি, জেন্‌টেল্‌মেন্—আমি বলতে বাধ্য—দুঃখেরই সহিত বলতে বাধ্য, উনি পাটনা থেকে এখান পর্যন্ত এক মুহূর্তও নিদ্রা যাননি। কলেজ-হোষ্টেলে, গাড়িতে নিদ্রিতা মহিলারূপে এবং নববিবাহে আড়ি-পাতার অত্যাচারে আমায় বহুবার নাক-ডাকিয়ে ঘুমুতে হ'য়েছে, সুতরাং আমি ও' জিনিসটির স্বরূপ চিনি—কোথায় খাঁটি, কোথায় মেকি বুঝতে পারি। এখন আপনাদের অনুমতি প্রয়োজন, অথবা প্রয়োজনের গুরুত্ব হিসেবে নিষ্প্রয়োজনও বলতে পারি, সুতরাং ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমার কর্তব্যে তৎপর হই।'

যুবক উঠিয়া ভদ্রলোকের পিঠে একটু ঠেলা দিয়া ডাকিল—'মশাই।'

চাদরের নিচে আড়ামোড়া ভাঙার ঈষৎ চঞ্চলতা হইল একটু।

যুবক পিঠেই হাতটা রাখিয়া বলিল—'মশাই, যখন জেগেই আছেন, জাগতে বলছি না ; কিন্তু দয়া করে মুখটা খুলে আমাদের একটা গভীর সমস্যা…'

আর অগ্রসর হইতে হইল না। ভদ্রলোক মুখ খুলিয়াছেন। সে-চাহনি জন্মে কখনও ভুলিব না, যুবকেরও সেইরকম স্তম্ভিত চিত্রার্পিত ভাব। হাত হইতে কাগজটা পড়িয়া গিয়াছে—সৌন্দর্যসম্রাজ্ঞী ভূলুণ্ঠিতা।

'কে!…ইয়ে—ওব নাম কি—আমাদেব অপরেশ বাবাজী?…কালকের গাড়িতে তা'হলে…আমি ভাবলাম যেমন লিখেছিলে, বুঝি কালই চলে গেছ। তা'হলে দেখছি…'

'আজ্ঞে—মানে—কাকাবাবু যে!—না কাল, আর…শরীরটা কেমন আছে আপনার?…মানে…'

* * * *

এব পরে অপরেশ বাবাজীর যতটুকু দেখিলাম তাহার সঙ্গে তাহার খুড়শ্বশুরের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া গেল,—সত্যই, কি ধীর! কি বিনয়ী!—বন্ধুদেব হাজার প্ররোচনায়ও কথা বলে না, বলেই তো তার অর্ধেক কণ্ঠেই থাকিয়া যায়—হীবার টুক্‌রা—সত্যই লাখে একটা মেলে না এমন ছেলে…।